মাওলানা মাওদুদীর সাথে
আমার সাহচর্যের ইতিবৃত্ত
ও
অন্যান্য প্রসঙ্গ

মূল : মাওলানা মোহাম্মদ মনযুর নোমানী (রহঃ)

অনুবাদ : মাওলানা নুরুল কবির আনছারী

"জামায়াতে ইসলামীর" সাথে
সম্পৃক্ত বন্ধুদের খেদমতে
তাদের এক বন্ধুর পক্ষ থেকে

আর-রশীদ কল্যাণ ট্রাষ্ট
চকবাজার, ঢাকা

প্রকাশকের কথা

দুনিয়ার সকল মহাদেশে ইসলামী পুনর্জাগরণের গণজোয়ারের ঢেউ বইছে। এই গণজোয়ারের ঢেউয়ে ভেসে যাচ্ছে অনৈসলামিক কার্যকলাপ, তাগুতী সকল কর্মতৎপরতা, নিষ্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছে সকল অপব্যাখ্যা ও বিকৃত ব্যাখ্যার মরিচীকা; আর জনসাধারণের সমর্থন হারাচ্ছে সকল বাতিল মতবাদ। সেদিন বেশী দূরে নয়, যে দিন সারা বিশ্বে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করবে– ইন্‌শাআল্লাহ্।

সাম্প্রতিককালে বিশ্বে যে সকল মহামনীষী ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের অগ্রনায়কের ভূমিকায় প্রথম কাতারে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ভারতের স্বনামধন্য ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব আল্লামা মনজুর নোমানী সাহেব (রাঃ) অন্যতম। তিনি ইসলামী আদর্শের একজন সর্বজনস্বীকৃত ব্যাখ্যাকার ও মুসলিম সমাজের সর্বজনমান্য রাজনীতিবিদ। ইসলামী দর্শনের, অর্থব্যবস্থার ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সুচিন্তিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদান করে তিনি আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করেছেন। তিনি কুরআন–হাদীছের সঠিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে যেমন সিদ্ধহস্ত, তেমনি যে কোন অপব্যাখ্যা ও বিকৃত ব্যাখ্যার যথাযথ তত্ত্ব-তথ্যপূর্ণ প্রতি-উত্তর রচনায়ও অভিজ্ঞ। বক্ষ্যমান পুস্তক "মাওলানা মাওদুদী কে সাথ মেরী রেফাকত্ কি সারগুজাশ্‌ত আওর আব্ মেরা মওকফ্" তাঁর উর্দূ ভাষায় রচিত এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী রচনা। মরহুম মাওলানা মাওদুদী সাহেব স্বীয় রচিত পুস্তকে বিবিধ ধর্মীয় পরিভাষার যে বিভ্রান্তিমুলক অপব্যাখ্যা দিয়েছেন, অত্র পুস্তক প্রণেতা সেগুলোর সুচিন্তিত ও সঠিক তথ্যপূর্ণ ব্যাখ্যা পেশ করেছেন এবং মরহুম মাওদুদী সাহেবের বিভিন্ন চারিত্রিক-ব্যক্তিগত দিক সম্পর্কেও অত্র পুস্তকে সুমার্জিত আলোচনা করেছেন।

ইসলামী পুনর্জাগরণের যে কোন তৎপরতায় সাধ্যমত অংশগ্রহণে অঙ্গীকারাবদ্ধ ও দ্বীনি প্রকাশনায় সর্বক্ষণ নিবেদিত আর-রশীদ কল্যাণ ট্রাষ্টের প্রকাশনা বিভাগ উক্ত পুস্তকটি "মাওলানা মাওদুদীর সাথে আমার সাহচর্যের ইতিবৃত্ত ও অন্যান্য প্রসঙ্গ" নামে পাঠকের সামনে পেশ করছে। ইসলামী পুনর্জাগরণের এ যুগ সন্ধিক্ষণে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নে অত্র পুস্তক যদি সামান্যতম ভূমিকাও রাখতে সক্ষম হয়, তাহলে তাতে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে বলে আশা করি। অত্র পুস্তক প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের আমল আল্লাহ্ পাক কবুল করুন এবং এই কর্মপ্রচেষ্টাকে পরকালে আমাদের নাজাতের পাথেয় করুন, এই কামনা করি। আমীন।।

অনুবাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মাওলানা মোহাম্মাদ মনজুর নোমানী সাহেব উপমহাদেশের একজন প্রখ্যাত আলেমে-দ্বীন, ইসলামী চিন্তাবিদ, বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও প্রবীণ বুযর্গ। ইসলামের একজন নিবেদিতপ্রাণ খাদেম হিসেবে ব্যক্তি জীবনে তিনি অত্যন্ত নিরহংকারী, নিঃস্বার্থপর ও বিনয়ী স্বভাবের অধিকারী। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি মাওলানা মাওদুদী সাহেবের একান্ত ভক্ত ও সহযোগী এবং জামায়াতে ইসলামীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস, শিক্ষা ও আদর্শের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মাওলানা মাওদুদী সাহেবের দ্বারা যখন মারাত্মক ভুল-ভ্রান্তি প্রকাশ হতে শুরু করে এবং জামায়াতে ইসলামী সে সবের প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় লিপ্ত হয়ে পড়ে, তখন তিনি উভয়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। অতঃপর তিনি মাওলানা মাওদুদী সাহেবের সাথে তাঁর সম্পর্ক স্থাপন, জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠার পটভূমি এবং নিজের সম্পর্ক ছিন্ন করা ও বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতির বর্ণনা সম্বলিত "মাওলানা মাওদুদী কে সাথ মেরী রেফাকত কি সরগুজশত্ আওর আব মেরা মাওকফ" শীর্ষক গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতা, সততা ও আমানতদারীর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বর্ণনা দেয়ার সাথে সাথে মাওলানা মাওদুদী সাহেবের চারটি মারাত্মক ও বিভ্রান্তিকর ভুলের বর্ণনা দেন। যেহেতু গ্রন্থটি বাংলাভাষী জনগণেরও অধ্যয়নে আসা প্রয়োজন সেই কারণে আলজামিয়া আলইসলামিয়া পটিয়া কর্তৃপক্ষ মাসিক আত-তাওহীদের মাধ্যমে এর ধারাবাহিক অনুবাদ প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেন। ১৯৮৫ সালের এপ্রিল সংখ্যা থেকে ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারী সংখ্যা পর্যন্ত আত-তাওহীদের ১৭টি সংখ্যায় গ্রন্থটির মূল অংশের অনুবাদ "মাওলানা মাওদুদীর সাথে আমার সাহচর্যের ইতিবৃত্ত এবং বর্তমানে আমার ভূমিকা" শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

এই অনুবাদগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে বহু অনুরোধ আসে। অবশেষে ১৯৯২ সালে চট্টগ্রামের আলহেলাল প্রকাশনীর একান্ত আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে আলজামিয়া আলইসলামিয়া পটিয়ার সাবেক মহাপরিচালক, আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুছ সাহেবের (রাঃ) সাথে পরামর্শপূর্বক এগুলো প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আততাওহীদে প্রকাশিত অনুবাদগুলোর মধ্যে কিছু মুদ্রণ-বিভ্রাট ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকার কারণে মূল বইটি সম্পূর্ণ নতুনভাবে অনুবাদ করা হয় এবং "মাওলানা মাওদুদীর সাথে আমার সাহচর্যের ইতিবৃত্ত ও অন্যান্য প্রসঙ্গ" শিরোনাম দেয়া হয়। তারপরও বইটিতে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভুল-ভ্রান্তি থাকতে পারে। আশা করি, পাঠক সমাজের কাছ থেকে ক্ষমা ও সুপরামর্শ লাভে ধন্য হবো।

উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন থেকে আলহেলাল প্রকাশনীর কার্যক্রম বন্ধ থাকায় বাজারে বইটি দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায়। নানা সুধিজনের আগ্রহ ও বাজারের চাহিদা পূরণের মহৎ লক্ষ্যে ঢাকার আর-রশীদ কল্যাণ ট্রাষ্ট বইটি পুনঃপ্রকাশের আগ্রহ ব্যক্ত করে। আর-রশীদের উদ্যোগেই বর্তমানে বইটি প্রকাশ হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা এ মহৎ প্রয়াসকে কবুল করুন। আমীন।।

(মাওলানা) নুরুল কবির আনছারী

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম।

(ক) পাঠক সমাজের প্রতি

এ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করার পর আপনারা নিশ্চয় অবগত হবেন যে, এটা বিশেষভাবে জামায়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত সম্মানিত ব্যক্তিগণের জন্যেই লিখিত। তাই, গ্রন্থের বিষয়াবলীর উপস্থাপনায় মুলতঃ তাঁদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। আমি আশা করি, (ইন্‌শাআল্লাহ) এর থেকে তাঁরা সে আলোই প্রাপ্ত হবেন, যা তাঁদের একান্ত প্রয়োজন।

সুতরাং-

আমার মনের একান্ত বাসনা যে, তাঁদের বেশী সংখ্যক ভাইদের নিকট যাতে গ্রন্থটি পৌছে, সে ব্যাপারে যা কিছু আপনারা করতে পারেন, আল্লাহর দ্বীন ও রাসূলুল্লাহর (সঃ) উম্মতের খেদমত মনে করে তাতে কার্পণ্য ও সংকোচ করবেন না।

উক্ত দলের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যাদের নিকট সম্ভব গ্রন্থটি পৌছাবেন, এ কাজকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাতের ছওয়াবের নিয়্যতেই করবেন।

-নোমানী

(খ) দৃষ্টি আকর্ষণ

"যারা জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানা মাওদুদী সাহেবের সাথে আমার সম্পর্ক স্থাপনের ইতিহাস জানেন, তাঁরা হয়তো অবগত আছেন যে, জামায়াতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর দীর্ঘদিন যাবৎ আমার অবস্থা এ রকম ছিল যে, মাওলানা মাওদুদী সাহেবের উপর যে সব অভিযোগ উত্থাপিত হতো, যেহেতু আমি সেগুলোকে ভুল বুঝাবুঝির ফল বলে মনে করতাম, তাই মাওলানার পক্ষ থেকে আমি নিজেই তার জবাব দিতাম।

জামায়াতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রায় আট/দশ বছর পর ১৯৫১ সালের ঘটনা। তখন জনাকয়েক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির পক্ষ থেকে মাওলানা মাওদুদীর উপর অভিযোগ করে কিছু লেখা প্রকাশিত হলে, আমি তাঁর পক্ষ থেকে "আল-ফুরকান"-এর (জিলক্বদ-৭০হিঃ) মাধ্যমে সেগুলোর জবাব দিয়েছিলাম।

উল্লেখ্য যে, আমি কিন্তু এখানে তাঁর যে কয়েকটি মারাত্মক ও বিভ্রান্তিকর ভুল সম্পর্কে আলোচনা করেছি, অনেক চিন্তা-ভাবনা করার পরও সেগুলোর কোন সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারিনি।

আমি আল্লাহর সামনেই আরজ করবো যে, আমি কোরআন-সুন্নাহর আলোকেই সে সব ভুলকে ধর্মের মধ্যে ভ্রান্তি, হঠধর্মিতা ও ফিৎনা বলেই বুঝেছি।

এ জন্যেই আমি আমার মতামতকে স্পষ্ট করে আপনাদের সামনে তুলে ধরাকে আমার দায়িত্ব বলে মনে করেছি।

জামায়াতে ইসলামীর ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অবগতির উপর ভিত্তি করে বলা যায়, একথা প্রায় নিশ্চিত যে, জামায়াতের কলমধারী ব্যক্তিগণের পক্ষ থেকে আমার বক্তব্যের অবশ্যই জওয়াব দেয়া হবে। কিন্তু, আমি অগ্রীম নিবেদন করবো, আমি যা কিছু লিখেছি তা বিতর্ক ও জওয়াব পাওয়ার জন্য লিখিনি; বরং নিজের জীবন-সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে মনে করে, সত্যের সাক্ষ্য, দায়মুক্তি ও সংশোধনের সম্ভাব্য প্রচেষ্টার দায়িত্ব পালনের নিয়্যতেই লিখেছি। তার পরবর্তী কাজ আল্লাহর হাতেই সোপর্দ করলাম।"

মাওলানা মাওদুদীর সাথে আমার সাহচর্যের ইতিবৃত্ত ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

বিষয়	পৃষ্ঠা
✪ ভূমিকা	১
মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী	১
✪ আমার সাহচর্যের ইতিবৃত্ত	
প্রাথমিক কথা	৮
"খেলাফত আন্দোলন" ও তার প্রভাব	১১
দেওবন্দের ছাত্রজীবন ও "জমিয়াতুল ওলামার" সাথে সম্পর্ক স্থাপন	১৪
তদানিন্তন "জমিয়াতুল ওলামা"	১৪
স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেসের সাথে যৌথ কার্যক্রম	১৫
স্বাধীনতা সম্পর্কে "জমিয়াতের" বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি	১৫
"শুদ্ধি সংগঠনের" আন্দোলনের যুগ	১৬
১৯৩০ সাল থেকে পুনরায় স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু	১৬
তৎকালীন সময়ে আমার অবস্থা ও দায়িত্বসমূহ	১৬
মাওলানা মাওদুদীর "তরজুমানুল কোরআন" পত্রিকা প্রকাশ	১৮
বেরেলী থেকে "আল-ফুরকান" প্রকাশিত	১৯
"তরজুমানুল কোরআন" একটি খাঁটি ধর্ম ও শিক্ষা বিষয়ক পত্রিকা	১৯
"তরজুমানুল কোরআনে" রাজনৈতিক আলোচনার সূচনা	১৯
১৯৩৬ সালের নির্বাচনের পর দেশীয় রাজনীতির উপর মাওলানা মাওদুদীর লেখাসমূহ	২০
মাওলানা মাওদুদী সাহেবের সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক	২০
মাওলানা মাওদুদী সাহেবের সাথে আমার প্রথম মোলাকাত	২১
হায়দারাবাদ থেকে মাওলানা মাওদুদীর পাঞ্জাব গমন	২২
"দারুল ইসলাম" আন্দোলনের প্রথম অধিবেশন : আমার নৈরাশ্য ও অক্ষমতা প্রকাশ	২৪
"দারুল ইসলাম" থেকে মাওলানা মাওদুদীর লাহোর গমন ও "লাহোর ইসলামিয়া কলেজের" চাকুরী গ্রহণ	২৬
"দারুল ইসলাম" আন্দোলনের পরিসমাপ্তি	২৬
তখনকার দিনে আমার অবস্থা	২৬
সৈয়দ আহমদ শহীদের জীবনী প্রকাশিত : মাওলানা আলী মিয়ার সাথে মোলাকাত ও পরামর্শ	২৭
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ	২৮
আমার লাহোর সফর এবং জামায়াতের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে মাওলানা মাওদুদী সাহেবের সাথে আলোচনা	২৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
"জামায়াতে ইসলামীর" প্রতিষ্ঠা : আমার অংশগ্রহণ ও দায়িত্ব	৩৩
জামায়াতে ইসলামীর গঠন ও প্রতিষ্ঠা এবং আমার কর্মতৎপরতা	৩৪
জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠার পর আমার লখনৌ ও আজমগড় প্রভৃতি স্থানে সফর	৩৬
মাওলানা আমীন আহসান সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ	৩৭
প্রতিষ্ঠা অধিবেশনের ছয়মাস পর দ্বিতীয় অধিবেশন	৩৮
লাহোর থেকে কেন্দ্র স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত	৩৯
"দারুল ইসলামে" জামায়াতের কেন্দ্র	৪০
"দারুল ইসলাম" পৌছেই আমার এক বিরাট সমস্যা	৪১
"দারুল ইসলাম" হতে স্বদেশভূমি চম্বলে	৪৬
নতুন পরিস্থিতিতে কঠিন দুঃখ ও ব্যথা	৪৮
"নিজের সম্পর্কে একটি ঘোষণা"	৫৪
জামায়াতে ইসলামীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরে	৫৫
'৫৭ সালের পাকিস্তান সফরের পর চিন্তাধারার পরিবর্তন	৫৮
আমার ভূলের আসল বুনিয়াদ	৬০
✪ মাওলানা মাওদুদীর চারটি মারাত্মক ভুল	
প্রথম মারাত্মক ভুল :	৬২
প্রসঙ্গ "কোরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা"	
(১) "রাসূল" শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে চকড়ালভীদের বক্তব্য	৬৫
(২) "সালাত"(নামায)-এর অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে বক্তব্য	৬৬
(৩) "যাকাত" সম্পর্কে মুনকেরীনে-হাদীছের দাবী	৬৭
এ রকম মারাত্মক ভুলের কারণ	৭২
একটি জরুরী ঘোষণা	৭৬
দ্বিতীয় মারাত্মক ভুল :	৭৭
ধর্মীয় কাজে **"হিকমতে আমলীর"** দর্শন	৭৭
"নারী ও আইন পরিষদ"	
মাওলানা সৈয়দ আবুল-আলা মাওদুদী	৮৬
কেবল সাময়িক ভুল নয়; বরং ফিৎনার দ্বার উন্মোচন	৯৩
তৃতীয় মারাত্মক ভুল :	৯৬
'গিলাফে-কাবার' ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী	৯৬
নবীগণের পদ্ধতিতে কাজ সম্পাদনের দাবী : ভিন্ন রকম পদ্ধতির অনুসরণ	৯৬
চতুর্থ মারাত্মক ভুল :	১০১
একটি মারাত্মক ও বিভ্রান্তিকর দাবী	১০১
"মাওলানা মাওদুদী ও জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত প্রত্যাখানকারী মুসলমানদের 'পজিশন্' বা মর্যাদা তা-ই যা ইহুদী জাতির ছিল"	১০১
এভাবেই উপদল বা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়	১০৮
✪ পরিশিষ্ট	১১১-১২০

ভূমিকা

মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী (রঃ)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মুসলিম জাতির ধর্ম, শিক্ষা, চিন্তাধারা ও সংস্কারমূলক কাজের সুদীর্ঘ ইতিহাসে ধর্মীয় ও শিক্ষাগত আত্মপর্যালোচনা এবং নির্ভীক, পক্ষপাতহীন, গঠনমূলক ও সুষ্ঠু সমালোচনার উদাহরণ মোটেই কম নয়; বরং এতে সামান্যতমও অতিরঞ্জিত হবে না যে যদি বলা হয়, এ ব্যাপারে কোন জাতি বা সম্প্রদায় মিল্লাতে-ইসলামিয়ার মোকাবেলা করতে পারে না। এমন কি, এ কাজটি সব দিক দিয়ে সে জাতিরই মাহাত্ম্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল, যাদেরকে شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ বা "মানবজাতির উপর সাক্ষ্য-দাতার" মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে, আর যাদেরকে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ

বা "হে ঈমানদারগণ, মানবজাতির উপর সাক্ষ্যদাতা হিসেবে তোমরা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাকারী হও"-এই আদেশের মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে।

মুসলিম জাতির ওলামায়ে কেরামকে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে না কারো কোন যুহদ-তাকওয়া, আধ্যাত্মিকতা, আল্লাহর নৈকট্যলাভ ও জনপ্রিয়তা বাধা দিতে পেরেছে, আর না কারো সেই সব মহান ধর্মীয় অবদান ও জাতীয় উপকার তথা অনুগ্রহ ও বরকত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পেরেছে, যা তাদের ব্যক্তিত্বের কারণে ইসলাম ও মুসলিম জাতি লাভ করেছিল। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত "জরহ ও তা'দীল" ও "আসমাউর রিজাল" এবং "তবকাতুল মোহাদ্দেছীন ও তরাজিমুস সাহাবা" শীর্ষক গ্রন্থসমূহে দেখা যেতে পারে। বরং সুপরিচিত নিয়ম زَلَّةُ الْعَالِمِ زَلَّةُ الْعَالَمِ বা "আলেমের বিচ্যুতি জগতের বিচ্যুতি"-কে সামনে রেখেই সমালোচক ও সংস্কারকগণ তাদের সমালোচনা-পর্যালোচনা করতে এবং তাঁদের ভুল-ক্রটিসমূহ ধরে দিতে (তাঁদের খেদমত ও অবদানের পূর্ণস্বীকৃতি এবং তাঁদের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক) নিজেদের দায়িত্ব আরো বেশী বলে উপলব্ধি করেন, যাদের অনুসরণ ও অনুকরণযোগ্য মর্যাদা অর্জিত হয়েছিল অথবা যাদের কথা-বার্তা ও কাজকর্মকে "হুজ্জত ও সনদ" (বা

দলীল-প্রমাণ) মনে করা হতো। এমন কি, অন্যান্যদের তুলনায় (ইসলামী সমাজে যাদের উক্ত মর্যাদা অর্জিত হয়নি) তাঁদের ক্ষেত্রে একাজকে অধিকতর জরুরী মনে করা হতো।

আমার জ্ঞান ও সীমিত গবেষণা মতে, ইসলামের প্রথম যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সমালোচনা-পর্যালোচনার এই ধারা কখনো বিচ্ছিন্ন হয়নি। আর মুসলিম জাতির জন্য ইসলামের "সিরাতে মুস্তাকীমের" উপর অটল থাকা আর পবিত্র কোরআনের বিকৃতি ও উম্মতের সর্বাত্মক গোমরাহী থেকে নিরাপদ থাকার খোদায়ী সিদ্ধান্ত যদি হয়ে থাকে, (এবং এটা সর্বশেষ উম্মত হিসেবে মুসলিম জাতির জন্য জরুরীও) তাহলে এধারা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এমনকি এধারা অব্যাহত থাকাই প্রয়োজন। কেননা, এতেই মুসলমানের জাতিসত্ত্বার হেফাজত ও মানবতার কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত যে এ ধারা জারী থাকবে, এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা দিয়েছেন। হাদীছের কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সঃ) বলেন,

"আল্লাহ তায়ালা ফয়সালা করেছেন যে, রসূলুল্লাহর (সঃ) মাধ্যমে মানব জাতির নিকট যে জ্ঞান (কোরআন ও হাদীছরূপে) এসেছে, প্রত্যেক যুগের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগণই উক্ত আমানতের হেফাজত করবেন। তাঁরা চরমপন্থীদের বিকৃতি, বাতিল-পন্থীদের অবাস্তব দাবী এবং অজ্ঞতামূলক ব্যাখ্যাসমূহের প্রতিরোধ সেগুলোর ভুল ও ভিত্তিহীনতা প্রমাণিত করবে।" – (মিশকাত)

উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী জাতিসমূহ নিজেদের ওলামায়ে কেরাম ও দ্বীনের ধ্বজাধারীগণের উক্ত নৈতিক মনোবল ও দায়িত্ব অনুধাবনের স্বল্পতা, ধর্মীয় কাজে অবহেলা, পক্ষপাতিত্ব, ধর্মীয় স্বার্থের উপর জাগতিক স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া এবং শরীয়তের বিধি-বিধানসমূহকে বস্তুবাদী, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দৃষ্টিকোণে বিচার-বিশ্লেষণ করার অভ্যাসের ফলে সর্বাত্মক গোমরাহী ও বিচ্যুতির শিকার হয়। শেষ পর্যন্ত তাদের সেই সর্বশেষ ও দুর্বল সংযোগটিও ছিন্ন হয়ে যায়, যা তাদেরকে আল্লাহ এবং তাঁর কিতাব ও শরীয়তের সাথে সংযুক্ত করে রেখেছিল।

প্রত্যেকটি দাওয়াত ও আন্দোলনে দু'টি বিষয় বুনিয়াদী গুরুত্ব লাভ করে। (১) দাওয়াত বা আন্দোলনের মূল আদর্শ ও চিন্তাধারা, যা তাকে অন্যান্য আন্দোলন ও দাওয়াত থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্য দান করে এবং তার প্রাণ-প্রবাহ হিসেবে কাজ করে। (২) দাওয়াতের প্রথম আহবায়ক বা আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতার ব্যক্তিত্ব ও জীবনধারা।

মাওলানা সৈয়দ আবুল-আলা মাওদুদী সাহেব -এর সেই মূল আদর্শ ও চিন্তাধারা, মূলতঃ যার উপর জামায়াতে ইসলামীর ভিত্তি ও যার উপর এর গোটা ইমারত

গড়ে উঠেছে এবং দৃশ্যতঃ যা (যতদিন পর্যন্ত কোন অস্বাভাবিক ঘটনা না ঘটে) কায়েম থাকবে, যতদূর পর্যন্ত তার সম্পর্ক রয়েছে, তা হলো তাঁর সেই চিন্তাধারা ও বিশেষ গবেষণা যা তিনি কোরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা "ইবাদত, রব, ইলাহ্ ও দ্বীন"–এর ব্যাখ্যায় পেশ করেছেন এবং যাকে "খোদায়ী শাসন ও আল্লাহর দ্বীনের সার্বভৌমত্ব" হিসেবে সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যায়। আর এটাই হলো তাঁর দৃষ্টিতে গোটা দ্বীনের মূলসত্ত্বা ও তাঁর আন্দোলনের মূল-ভিত্তি।

মাওলানা মাওদুদী সাহেবের উক্ত মূল আদর্শ ও চিন্তাধারা এবং তাঁর বিশেষ গবেষণা অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী ফলাফলের ধারক-বাহক এবং সেই বিশেষ ধরনের ছিল যে, সম-সাময়িক ওলামায়ে কেরামগণ, যারা কোরআন-হাদীছ সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত এবং মুসলিম উম্মাহর বিশ্বাস ও আদর্শিক ধারার সাথে পরিচিত, তাদের উচিত ছিল, পূর্ণ গুরুত্ব সহকারে তার বিচার-বিশ্লেষণ করা। বিশেষ করে এ কারণেও যে মাওলানা মাওদুদী সাহেব একথা পরিস্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন–

"কিন্তু কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় এসবগুলোর যে মৌল অর্থ প্রচলিত ছিল, পরবর্তী শতকে (বরং শতাব্দীসমূহে) ধীরে ধীরে তা পরিবর্তিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এক একটি শব্দ তার সম্পুর্ণ ব্যাপকতা হারিয়ে একান্ত সীমিত বরং অস্পষ্ট অর্থের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে পড়ে।" -(কোঃ চাঃ মৌঃ পরিভাষা-৯)

এবং আরও বলেছেন যে– "এটা সত্য যে, কেবল এ চারটি পরিভাষার তাৎপর্যে আবরণ পড়ে যাওয়ার কারণে কোরআনের তিন-চতুর্থাংশের চেয়েও বেশী শিক্ষা বরং তার সত্যিকার স্প্রিটই দৃষ্টি থেকে প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়।" – (কোঃ চাঃ মৌঃ পরিভাষা-৯)

কিন্তু, প্রথমত অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা–পর্যালোচনায় ব্যস্ত হয়ে যাবার কারণে, দ্বিতীয়তঃ ঐ শ্রেণীর লোকদের সাথে তেমন যোগাযোগ না থাকার কারণে, যাদের চিন্তাধারা ও কাজ-কর্ম উক্ত মূল আদর্শ এবং বিশেষ গবেষণার দ্বারাই লালিত-পালিত ও সৃষ্ট, ওলামায়ে কেরামগণ হয়তো তার পূর্ণ গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেননি। এমন কি, ঐ সব মারাত্মক ফলাফল যা উক্ত ব্যাখ্যা ও গবেষণার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন, আল্লাহর প্রতি ঝুঁকে পড়া, ইবাদত-বন্দেগী এবং একজন মুসলমানের চিন্তা ও কর্মের উপর প্রভাব ফেলে, তার পরিমাণ ঠিক করতে পারেননি। ফলে তারা এ সবকে নিজেদের সমালোচনা ও পর্যালোচনার কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করেননি।

সারকথা, সেই বিশেষ অবস্থা ও কারণের ফলে উক্ত মূল আদর্শ ও চিন্তাধারা এবং "আধুনিক যুগে ধর্মের উক্ত আধুনিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ" যখন পেশ করা হয়, তখন

যথাযথ গুরুত্ব সহকারে তার পর্যালোচনা করা হয়নি এবং এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রতি অনেক দেরীতে দৃষ্টি দেয়া হয়।

এ পর্যায়ে একটি কাজ কিছুদিন পূর্বে আমার কলম দ্বারাই সম্পন্ন হয় এবং প্রায় উক্ত নামেই প্রকাশিত হয়। আর দ্বিতীয় কাজটি (কিছু নতুন সংযোজন ও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাসহ) বন্ধুবর মোহতরম মাওলানা মোহাম্মদ মনজুর নোমানী সাহেবের কলম দ্বারা সম্পন্ন হতে চলেছে, যা পাঠক সমাজের সামনেই রয়েছে। এটি হচ্ছে কোরআন মজীদ এবং মুসলিম মনীষীদের কোরআন-বিষয়ক জ্ঞান ও কর্মধারার আলোকে রচিত উক্ত মূল আদর্শ ও চিন্তাধারার একটি তাত্ত্বিক ও সমালোচনামূলক রচনা।

এ পর্যায়ে আশ্চর্যের বিষয় শুধু এতটুকুই যে, উক্ত আদর্শ ও চিন্তাধারার (যার ভিত্তিই ছিল মুসলিম উম্মাহর একটি বিরাট শ্রেণী ও বহু শতাব্দীর ধারাবাহিক কোরআন বুঝা ও দ্বীন বুঝার অস্বীকৃতির উপর) সমালোচনাকে অত্যন্ত বিষাদ, বিস্ময় এবং কিছু বিরক্তি সহকারে স্বাগতঃ জানানো হয়, যা এ ধরনের একটি দল থেকে মোটেই আশা করা যায়নি। অথচ উক্ত দলের মৌলিক নীতিমালা ঘোষণা করছে যে, "আল্লাহর রসূল (সঃ) ছাড়া কাউকে সত্যের মাপকাঠি সাব্যস্ত করা যাবে না, কাউকে সমালোচনার উর্ধে মনে করা যাবেনা এবং কারো মানসিক গোলামীতে লিপ্ত হওয়া যাবেনা।"

এর জবাবে, তা-ই বলা যেতে পারে, যা উক্ত কিতাবেরই আরবী সংস্করণে আমি লিখেছিলাম। আর তাহলো–

"সমালোচনা-পর্যালোচনার কাজে যানবাহন চলাচলের কঠোর ট্রাফিক আইন প্রয়োগ করা যায় না। সমালোচনা-পর্যালোচনার কাজ একমুখী নয়; দ্বিমুখীও। আর এর অধিকার রয়েছে সকল সচেতন ব্যক্তি ও বিশেষজ্ঞের।"

দ্বিতীয় যে বিষয়টি একটি আন্দোলন ও নতুন দাওয়াতে বুনিয়াদী গুরুত্ব লাভ করে, তা হলো, তার আহবায়ক ও প্রতিষ্ঠাতার ব্যক্তিত্ব ও জীবনধারা। অন্ততঃপক্ষে ইসলামী দাওয়াত ও তার পুনর্জাগরণের আন্দোলন ও কর্মতৎপরতায় আহবায়ক ও প্রতিষ্ঠাতার জীবন-চরিতকে তার দাওয়াত ও চিন্তাধারা থেকে এই বলে বিচ্ছিন্ন করা যায় না যে, "কি বলছে দেখো; কে বলছে দেখোনা"। কেননা, দাওয়াত ও দাওয়াত দানকারীর মধ্যে এমন একটি সুক্ষ্ম সম্পর্ক থাকে, যার প্রতি পবিত্র কোরআন ও আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং তাদের দাওয়াত ও তাবলীগের পর্যায়ে গুরুত্ব দিয়েছে। এমন কি, কোরআন মজীদ দাওয়াতের সাথে সাথে বিভিন্ন স্থানে দাওয়াত দানকারীর কাজ-কর্ম ও চরিত্রকেও মানুষের সামনে পেশ করেছে।

এ পর্যায়ে কিছু বলা, লেখা এবং নিজের মতামত ও অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করার যোগ্যতা ও অধিকার শুধু লেখক নয়, বরং জামায়াতে ইসলামীর অধিকাংশ (সম্ভবতঃ সমস্ত) সদস্যের তুলনায় এ গ্রন্থের লেখক মাওলানা মোহাম্মদ মনজুর নোমানী সাহেবেরই রয়েছে। কেননা, আমাদের জানা মতে, বর্তমানে তাঁর মতো জামায়াতে ইসলামীর সবচেয়ে প্রবীণ ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য উপমহাদেশে দ্বিতীয় আর কেউ নেই। তিনি জামায়াতে ইসলামীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, প্রথম রুকন ও আহবায়ক ছিলেন। এক সময় তিনি মাওলানা মাওদুদী সাহেবের একান্ত সহচর এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ও পরামর্শদাতা ছিলেন। অনেক দিন পর্যন্ত (যতদিন তিনি জামায়াতের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেননি) তিনি জামায়াতের দাওয়াতী কাজের সক্রিয় নকীব ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর ওস্তাদবৃন্দ, পীর-মশায়েখ, আকাবের এবং একই চিন্তাধারার অনুসারী বন্ধু-বান্ধবদের অসন্তুষ্টি ও বিরক্তির প্রতি মোটেও ভ্রুক্ষেপ করেননি। যাঁরা তাঁর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য, যোগ্যতা, ও গুণাবলী, তাঁর সাবধানতা এবং (শাহাদাত) সাক্ষ্যের দায়িত্ব সচেতনতা সম্পর্কে অবহিত আছেন, তাঁরা সাংগঠনিক মত-পার্থক্যের দোহাই দিয়ে তাঁকে উপেক্ষা করতে পারেন না। আর না এ বলেও তাঁর গুরুত্ব ও মর্যাদাকে খাটো করতে পারেন যে, তাঁর জ্ঞান পরোক্ষ কিংবা ভাসা ভাসা; তাঁর প্রত্যক্ষ ও গভীর জ্ঞান নেই।

এখানে স্বভাবতঃই একটি প্রশ্ন উঠে এবং এর উপর পূর্ণ গুরুত্ব, উদারতা ও কিছুটা সাহসিকতার সাথে চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন রয়েছে। প্রশ্নটি হলো, জামায়াতে ইসলামীর প্রায় সকল প্রতিষ্ঠাতা রুকন (মূল শক্তি) একের পর এক কেন জামায়াতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন? যাদের অধিকাংশ শুরু থেকেই জামায়াতে ইসলামীর সাথে জড়িত ছিলেন এবং যারা জামায়াতের সংবিধান প্রণেতা, দেশে জামায়াতে ইসলামীর প্রচার-প্রসারকারী ও জামায়াতের জন্য জীবন উৎসর্গকারীগণের মধ্যে অগ্রগামী ছিলেন। যারা নিজ নিজ গ্রুপের সাথে (যা তাদের একান্ত প্রিয়) সম্পর্ক ছিন্ন করে জামায়াতে ইসলামীর পতাকা তলে সমবেত হয়েছিলেন এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার পরওয়া করেননি। এমনকি, জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মাওদুদী সাহেব বিভিন্ন সময়ে শুধু তাঁদের উপর তাঁর নির্ভর ও বিশ্বাস করার কথাই প্রকাশ করতেন তা নয়, বরং তাঁদেরকে বিরুদ্ধবাদী ও অভিযোগকারীদের সামনে সনদ (প্রমাণ) হিসেবেও পেশ করতেন। (গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে)।

আমি এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ও অভিজ্ঞ যে, যে কোন সংগঠন ও সংস্থায় এ ধরনের কাজ হওয়াটা স্বাভাবিক। মানুষ সংগঠনের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়ে আবার তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। এমন কি, তার বিরোধীও হয়ে যায়। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী যে পরীক্ষার সম্মুখীন হয় যার কারণে তাঁর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণ (মূলশক্তি) বিশেষতঃ যারা কোরআন-হাদীছ সম্পর্কে সরাসরি অবহিত), যে হারে ও ধারাবাহিকতার সাথে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করেছেন, তার নজীর কোন সংগঠন বা দলের ইতিহাসে পাওয়া বড়ই কঠিন; বরং হয়তো মোটেই পাওয়া যাবে না। এর বিপরীতে আমরা দেখতে পাই যে, নিকট অতীতের দাওয়াত ও রেনেঁসার সর্ববৃহৎ আন্দোলন এবং জেহাদ ও জান

কোরবানীর বৃহত্তম সংগঠন, হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রাঃ)-এর "জামায়াতে মুজাহেদীনে"(বা মুজাহিদ বাহিনী) যারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন এবং যারা তাঁর হাতে হাত রেখে শপথ নিয়েছিলেন, তাঁরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর সাথে ছিলেন। যারা কখনো কোন পর্যায়ে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেননি। তাঁদের বহু সংখ্যক ব্যক্তি শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভে ধন্য হন। আর যারা শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ করতে পারেননি এবং বালাকোটের ময়দান থেকে গাজী হয়ে ফিরে আসেন তাঁরা মুজাহিদদের দ্বিতীয় কেন্দ্রে স্থানান্তরিত হন অথবা স্বদেশভূমি ভারতে ফিরে আসেন। অতঃপর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত তাঁরা এই দাওয়াত ও আন্দোলনকে চরম পর্যায়ে পৌছানোর কাজে ব্যস্ত থাকেন এবং সৈয়দ সাহেবের প্রেম ও ভক্তিতে তাঁরা পাগল-পারা ও যুদ্ধের ময়দানের জন্য সদা তৎপর ও প্রস্তুত থাকেন।

দু'টি আন্দোলনের মধ্যে এই যে পার্থক্য, তা সে সব লোককে চিন্তা-ভাবনা করার আহবান জানায়, যারা দাওয়াত ও দাঁওয়াত দানকারীর মধ্যকার সূক্ষ্ম ও স্পর্শ কাতর সম্পর্কের ব্যাপারে অবহিত, যারা মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের সাথে পরিচিত এবং যারা ইসলামের পুনর্জাগরণের কর্মী ও নেতাদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।

এই গ্রন্থে উপরোক্ত বিষয় দু'টি নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। এতে মাওলানা মাওদুদী সাহেব -এর উল্লেখযোগ্য অবদানসমূহ এবং তাঁর বৈশিষ্ট্য, যোগ্যতা ও গুণাবলীর উদারতার সাথে তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং লেখক তাঁর কাছ থেকে যা কিছু গ্রহণ করেছেন, তাও নৈতিক মনোবলের সাথে স্বীকার করেছেন। সাথে সাথে সেগুলোর এক বিশেষ ক্ষেত্রে উপকারিতার কথাও স্বীকার করেছেন এবং তাঁর সমালোচনাযোগ্য দিকগুলোকে অত্যন্ত সততা ও দায়িত্ববোধের সাথে তুলে ধরেছেন। আশা করি, সুস্থ মস্তিষ্ক ও খোলা মন নিয়ে গ্রন্থটি পাঠ করা হবে এবং এর দ্বারা লাভবান হওয়ার চেষ্টা চালানো হবে। সোপর্দ করা, পথ ও পন্থা নির্বাচনের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর এবং এ বিষয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা ও যাচাই-বাছাই করার প্রয়োজন রয়েছে। আশা করি, গ্রন্থটির অধ্যয়ন এ ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করবে।

আবুল হাসান আলী নদভী
মহাপরিচালক,
দারুলউলূম নদওয়াতুল-ওলামা
লখনৌ, উত্তর প্রদেশ, ভারত।

মাওলানা মাওদুদীর সাথে
আমার সাহচর্যের ইতিবৃত্ত ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

প্রাথমিক কথা

পাঠক সমাজের হাতে এখন যে গ্রন্থটি রয়েছে, মূলতঃ এটি একটি প্রবন্ধ। আজ থেকে ৮/৯ মাস আগে বিগত শাবান মাসে এটি লেখা হয়েছিল মাসিক আল-ফুরকানের জন্যে এবং শাওয়াল/জিলকদ- ১৩৯৯ হিজরী, (সেপ্টেম্বর/অক্টোবর-১৯৭৯ইং) যৌথ সংখ্যায় প্রকাশের কথা ছিল। রমজান-৯৯ হিঃ সংখ্যায় এর ঘোষণাও দেয়া হয়েছিল। শাওয়াল মাসেই এর কেতাবত (কম্পোজ) প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছিল। মুদ্রণের জন্য পান্ডুলিপি প্রেসে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তেই ৩০শে শাওয়াল '৯৯ হিঃ, হঠাৎ সংবাদ পাই যে, আমেরিকা-প্রবাসী নিজের ছেলের নিকট চিকিৎসাধীন থাকাবস্থায় মাওলানা সৈয়দ আবুল-আলা মাওদুদী সাহেব ইন্তেকাল করেছেন।

এ সংবাদ পাওয়ার পর, তখন প্রবন্ধটি প্রকাশ করা সময়োচিত মনে হয়নি। ফলে, আল-ফুরকান : শাওয়াল ও জিলকদ যৌথ সংখ্যার পরিবর্তে শাওয়াল সংখ্যা হিসেবেই' প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং জিলকদ মাসের মধ্যভাগেই তা প্রকাশিত হয়। উক্ত সংখ্যায় আমি তাঁর ওফাত স্মরণে একটি সুবিস্তৃত নিবন্ধ লিখেছিলাম। তাতে আমি তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান, তাঁর বৈশিষ্ট্য, যোগ্যতা ও গুণাবলী এবং তাঁর সাথে আমার সম্পর্ক স্থাপন ও সম্পর্কচ্ছেদের বিভিন্ন পর্যায়ের আলোচনা করার পর লিখি যে, তাঁর ওফাতের পর এখন আমাদের নিকট তাঁর পাওনা হচ্ছে, মহান প্রতিপালকের কাছে তাঁর ও আমাদের গুনাহর মার্জনা ও রহমতের জন্য প্রার্থনা ও দোয়া করা।

অতঃপর আল-ফুরকানের জিলকদ সংখ্যাও অনুরূপভাবেই জিলহজ্ব মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। এর পরে, জিলহজ্ব ও মোহররম (নভেম্বর/ ডিসেম্বর) যৌথ সংখ্যায় উক্ত প্রবন্ধের একাংশ প্রকাশিত হয় (এর ভূমিকায় সে সব কারণ উল্লেখ করা হয়েছিল, যেগুলো প্রবন্ধটি লেখায় আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।) আর বাকী অংশ তার পরবর্তী দু'সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বর্তমানে, গোটা প্রবন্ধটিই বন্ধুবর মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভীর ভূমিকা সমেত গ্রন্থাকারে প্রকশিত হচ্ছে। মহান আল্লাহ নিজ বান্দাহগণের জন্য একে উপকারী করুক- এটাই কাম্য।

অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় হলো, মাওলানা মাওদুদী সাহেব -এর জীবদ্দশায় লেখাটি প্রকাশ হতে এবং তাঁর অধ্যয়নে আসতে পারেনি। অথচ, এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ তাঁকেই সম্বোধন করে লিখিত এবং তাঁর সমীপেই কিছু আবেদন-নিবেদন পেশ করা হয়েছিল। আশা ছিল, নিজের পুরনো সম্পর্কের ভিত্তিতে তিনি আমার আবেদন-নিবেদনগুলো সদিচ্ছামূলক মনে করে এর উপর চিন্তা-ভাবনা করে দেখবেন। কিন্তু, আল্লাহর অভিপ্রায় যা ছিল তা-ই হয়ে গেছে। বর্তমানে, যেহেতু মাওলানা মাওদুদী সাহেব এ জগতে নেই, তাই তাঁর পরিবর্তে উক্ত আবেদন-নিবেদনগুলো বিশেষ ভাবে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ ও পরিচালকগণ এবং সর্বশ্রেণীর জ্ঞানী-গুণী ও বুদ্ধিজীবীগণকেই সম্বোধন করে লেখা হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

এ গ্রন্থের শেষভাগে, "পরিশিষ্ট" শিরোনামের আলোচনায় তাদেরই সমীপে কিছু আবেদন পেশ করা হয়েছে। আশা করি, তাঁরা বিষয়টির প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করবেন। তবে, অন্তরজগতের মালিক তো আল্লাহ।

সম্মানিত পাঠক সমাজ লক্ষ্য করবেন যে, আমার এ লেখাটি দুই অংশে বিভক্ত ঃ প্রথমাংশে মাওলানা মাওদুদী সাহেবের সাথে আমার গভীর সম্পর্ক ও সাহচর্যের ইতিবৃত্তের বিবরণ দেয়া হয়েছে এবং দ্বিতীয়াংশে তাঁর এমন কিছু চিন্তাধারা ও মতবাদের পর্যালোচনা করা হয়েছে, যেগুলো তাঁর দ্বারা মারাত্মক ভুল হিসেবে সংঘটিত হয়েছে এবং মুসলিম উম্মাহ, বিশেষ করে তাঁর অনুসারীদের জন্য যেগুলো ভ্রান্তি ও বিচ্যুতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এমনকি, সেগুলো স্বয়ং এমন বিভ্রান্তিকর বিষয় যা উপেক্ষা করা অবৈধ। তম্মধ্য হতে কয়েকটি ভুল সম্পর্কে আজ থেকে অনেক আগেই "আলফুরকানে" আলোচনা করা হয়েছিল।

সাম্প্রতিক দিনগুলোতে আমি একথা অনুভব করে যে দৃশ্যতঃ এটা আমার জীবনের শেষ পর্যায় এবং মাওলানা মাওদুদী সাহেবের বয়স আমার চেয়েও দু' বছরের বেশী, ধর্মীয় কল্যাণ কামনা, আল্লাহর কাছে দায়মুক্ত হওয়া এবং "ইতমামে হুজ্জত"-এর লক্ষ্যে এ সব ভুল সম্পর্কে নিজের অভিমত এই প্রবন্ধাকারেই লিখেছিলাম, যা এখন এ

গ্রন্থে আপনারা পাঠ করবেন। আমার ধারণা, মাওলানা মাওদুদী সাহেবের উক্ত মারাত্মক ভুলগুলো সম্পর্কে যা কিছু যে ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, তা অনুধাবন করার জন্য না কোন গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে, আর না ব্যাপক অধ্যয়ন ও পড়া-শোনার। যার সুস্থ মস্তিষ্ক, বিবেক-বুদ্ধি ও জ্ঞান রয়েছে এবং যাকে আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করেছেন, তিনি নিশ্চয় এগুলো পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবেন ।

আজ থেকে ২২ বছর আগে, ১৩৭৭ হিঃ সালের (১৯৫৮ইং) মাসিক আল-ফুরকানে, মাওলানা মাওদুদী সাহেবের সাথে আমার সম্পর্ক স্থাপন ও সাহচর্যের এ ইতিবৃত্ত একবার প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু, তখন আমি অসুস্থ ছিলাম বিধায়, রোগশয্যায় শায়িত থেকেই অনুলিপি করিয়েছিলাম। ফলে, ভালোভাবে যাছাই-বাচাই করে দেখা সম্ভব হয়নি। এছাড়া তখন কোন কোন বিষয়ের প্রতি শুধু ইংগিতই করা হয়েছিল, স্পষ্ট করে বলা থেকে সচেতনভাবেই বিরত থাকা হয়েছিল। বর্তমানে যে "ইতিবৃত্ত" গ্রন্থাকারে আপনাদের সম্মুখে রয়েছে, তা অত্যন্ত গুরুত্ব ও সতর্কতার সাথেই আমার নিজের দ্বারা লেখা হয়েছে। এতে সে সব বিষয়ও সংযোজন করা হয়েছে, যা আগে বাদ পড়েছিল। অনুরূপভাবে, যে সব বিষয় আগে স্পষ্ট করে বলা হয়নি, বর্তমানে জরুরী মনে করে, বলতে গেলে নিজের দায়িত্ব মনে করে, সে সবকেও স্পষ্ট করে লেখা হয়েছে। সাথে সাথে মাওলানা মাওদুদী সাহেবের সাথে আমার সাহচর্য ও সম্পর্কের সেই পটভূমিও বিবৃত করা হয়েছে, যা "খেলাফত আন্দোলন" ও আমার ছাত্র জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত; বরং এর মাধ্যমেই গ্রন্থটি শুরু হয়েছে । এতে করে প্রাসংগিকভাবে আমার আত্মজীবনীর পূর্ণ একটি অধ্যায় লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে , যা পাঠকগণের নিকট শিক্ষণীয় এবং আকর্ষণীয়ও হবে, ইনশাআল্লাহ ।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, এখন মূলগ্রন্থের প্রতিই আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যার প্রথম শিরোনাম হচ্ছে- "খেলাফত আন্দোলন"।

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل–

তাং-৭ই রবিউচ্ছানী-১৪০০হিঃ **মোহাম্মদ মনজুর নোমানী**

মোতাবেক : ২৫শে ফেব্রুয়ারী-১৯৮০ইং লখনৌ, ভারত।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

"খেলাফত আন্দোলন" ও তার প্রভাব

১৯১৪ সালে শুরু হয়ে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত ইউরোপে যে বিশ্বযুদ্ব সংঘটিত হয়েছিল, তা শেষ হওয়া অবধি দেশের পরিস্থিতি এমন ছিল যে, যার প্রেক্ষাপটে দেশের কোন মানুষ এ ধরনের কোন কল্পনা করতে পারছিল না যে, ভারতে এমনও একদিন আসবে, যেদিন এদেশে ইংরেজদের রাজত্ব থাকবে না অথবা তাদের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন শুরু হতে পারবে। কিন্তু এ যুদ্ধের ফলে দেশে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায়, যা ভারতবর্ষে "খেলাফত আন্দোলন" শুরু হওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মাত্র কয়েক মাস সময়ের মধ্যে এ আন্দোলন ভারতবর্ষে বিশেষতঃ ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এমন এক বৈপ্লবিক জাগরণের সৃষ্টি করে, ইতিপূর্বে যার কল্পনাও আদৌ সম্ভব ছিল না। "খেলাফত আন্দোলন" ও ভারতের "স্বাধীনতা আন্দোলন" যৌথ নেতৃত্বাধীনে একই সাথে পাশাপাশি পরিচালিত হচ্ছিল। মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও শওকত আলী সাহেবদ্বয় যেমন একদিকে, "স্বাধীনতা আন্দোলনের" নেতৃত্ব প্রদান করে যাচ্ছিলেন, অনুরূপভাবে, অপরদিকে "খেলাফত আন্দোলনের" নেতৃত্বও প্রদান করে যাচ্ছিলেন বৈকি। অধিকন্তু, উভয় আন্দোলন অভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। ইংরেজ সরকার ও তার সহযোগী সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে অসহযোগিতা, ইংরেজদের তৈরী শিল্পজাত দ্রব্যসমূহ বর্জন করাই ছিল এই কর্মসূচীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। ফলে হিন্দু-মুসলমান যৌথভাবে বরং ঐক্যবদ্ধ হয়েই আন্দোলন করে যাচ্ছিল। কিন্তু মুসলমানদের আবেগপূর্ণ মেজাজ, অসীম উৎসাহ- উদ্দীপনা, সর্বোপরি "খেলাফত" বিষয়ের ধর্মীয় দিক থাকার কারণে আন্দোলনের উপর ইসলামী রূপই প্রাধান্য বিস্তার করে বসে। এমনকি, হিন্দু-মুসলমানদের যৌথ শ্লোগান ছিল "আল্লাহু আকবর"। শুধু তাই নয়, বরং ভারতের অনেক হিন্দু নেতা ভারতের স্বাধীনতার বিষয়ে যেমন বক্তৃতা করতেন, একইভাবে খেলাফতের বিষয়েও (যা শুধু একক মুসলমানদের ব্যাপার ছিল) একেবারে মুসলমানদের বিশেষ নিয়ম-পদ্ধতিতে বক্তৃতা করে বেড়াতেন। বলতে গেলে সম্পূর্ণরূপে মাওলানাদের কায়দায় বক্তৃতা করতেন। যেমন মুরাদাবাদ জেলার অন্তর্গত আমার নিজ গ্রাম চম্বলের পার্শ্ববর্তী ছোট্ট শহর সেরসী-এর মাস্টার চন্দ লালের কথাই ধরা যাক। তিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ছিলেন। (তিনি আন্দোলনের নিমিত্তে স্কুলের চাকরীতে ইস্তফা দিয়েছিলেন।) তাঁর বক্তৃতাসমূহে "আখ্‌রিজুল ইয়াহুদা ওয়ান নাসারা মিন্ জযিরাতিল আরব"-রসূল (সঃ) এর এ বাণীটি বিশুদ্ধ উচ্চারণে বারবার তাঁর মুখে শুনাটা আমার এখনও স্মরণ আছে।-১

মোট কথা তৎকালীন সময়ে ভারতে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যৌথভাবে যে

আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছিল, তার উপর ইসলামী প্রভাব ও রূপ এমনভাবে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল যে, যারা সে দৃশ্য অবলোকন করেনি, তারা তা কল্পনাও করতে পারবেনা।

[এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটি কথা উল্লেখ করা অত্যন্ত সমীচীন বিবেচিত হচ্ছে। তা হল, "খেলাফত আন্দোলনের" ন্যায় একটি মহান ও নজীরবিহীন আন্দোলনের কোন ইতিহাস ইতিপূর্বে রচিত হয়নি। যা আমাদের জন্য বিরাট শুন্যতা ও অতীব দুঃখের বিষয় ছিল। কিন্তু আন্দোলনের ছয় দশক অতিবাহিত হওয়ার পর হালে দেশ ও জাতির একনিষ্ঠ সেবক, প্রখ্যাত সাহিত্যিক এডভোকেট কাজী মোহাম্মদ আদিল আব্বাসী অত্যন্ত পরিশ্রম করে এ বিষয়ের উপর একটি ইতিহাস রচনা করেছেন। তাঁকে আল্লাহ তাআলা উত্তম পুরস্কার দান করুন। সত্যি বলতে কি, তিনিও "খেলাফত আন্দোলনের" একজন নিরলস কর্মী ছিলেন। এ কারণে তিনি কারাগারেও নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। দৃশ্যতঃ যদি আল্লাহ পাক তাঁর দ্বারা এ কাজটি না নিতেন, হয়ত কাজটি পরিত্যক্তই থেকে যেত। সন্দেহাতীতরূপে বলা যায় যে, আপন বিষয়ের উপর পুস্তকটি অতি মূল্যবান সংযোজন। তবে স্বস্থানে এ বাস্তব সত্যই থেকে যাবে যে, এ পুস্তক অধ্যয়নেও "খেলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতে যে পরিবেশ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তার যথাযথ অনুমান ও মূল্যায়ন কেউ করতে পারবে না।]

যে দুই-তিন বছর "খেলাফত আন্দোলনের" চরম উন্নতি ও পূর্ণ জোয়ার ছিল, (সম্ভবতঃ ১৯২১-২৩ সাল) সে সময় আমি একজন তালেবে-এলম হিসেবে আজমগড় জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ এলাকা মিউতেই অবস্থান করছিলাম। আমার বিশেষ উস্তাদ ও মুরব্বী হযরত মাওলানা করীম বখ্স চম্বলী (রঃ) (যিনি সম্পর্কে আমার আত্মীয়ও ছিলেন এবং "মিউ" শহরের সুপ্রসিদ্ধ মাদরাসা দারুল উলুমের প্রধান শিক্ষক ও শায়খুল হাদীস ছিলেন) এর হাতে আমার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, ভারতের সর্বত্রই তখন "খেলাফত আন্দোলনের" জয়-জয়কার ছিল। কিন্তু "মিউ" শহরে যে পরিস্থিতি ও পরিবেশ বিরাজমান ছিল, সম্ভবতঃ ভারতের অন্য

১. এ হাদীছটি রসূল (সঃ)-এর এক ওসীয়তেরই অংশ বিশেষ। এর মর্মার্থ হল যে, "ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে আরব ভূমি থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হোক। আরবের সীমানায় তাদেরকে থাকার ও বসবাস করার অনুমতি দেওয়া যাবে না"। পক্ষান্তরে যেসব মূলনীতির উপর খেলাফত আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, রসূল (সঃ)-এর ওসীয়তের এ বিশেষ অংশটিও তন্মধ্যে একটি ছিল। ফলে বক্তৃতাসমূহে এ হাদীছটি এত বেশী পাঠ করা হত যে, সাধারণ মানুষ এমনকি অনেক হিন্দু ভাইরাও এ হাদীছটি অতি সহজে আবৃত্তি করতেন।

কোন ছোট-বড় শহরে সে রকম ছিল না। ধারণা করা হত যে, সেখানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়েই গিয়েছে। আন্দোলনের কর্মসূচীর মধ্যে যেহেতু সরকারী অফিস আদালতসমূহের সাথে অসহযোগিতাও অন্তর্ভূক্ত ছিল, তাই খেলাফত কমিটি সেখানে নিজস্ব আদালতও প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিল।

আমার স্মৃতিপটে এখনও ভাস্বর হয়ে আছে যে, মিউ শহরের প্রবীণ বুযর্গ শাহী জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা মোহাম্মদ বশীরুল্লাহ সাহেব, ফাজেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, মাওলানা মোহাম্মদ জমীর সাহেব, মাওলানা আবদুল্লাহ শায়েক সাহেব মরহুম (তিনি আহলে হাদীছের অত্যন্ত মেধাবী ও বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন আলেম ছিলেন) উক্ত আদালতের বিচারপতিরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের বিভিন্ন ধরনের মামলা-মোকদ্দমা এ আদালতেই দায়ের করা হত। আবার এ আদালত হতেই সর্বপ্রকার মামলা-মোকদ্দমার রায় ঘোষণা করা হত। বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষই এ সব রায় বিনা বাক্য ব্যয়ে মাথা পেতে মেনে নিত। কোন কোন সময় কিছু সংখ্যক উশৃঙ্খল মুসলমান তাড়ি পান করে বসত। "খেলাফত আন্দোলনের" স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, যারা পুলিশের দায়িত্ব পালনে নিযুক্ত ছিল, তাদেরকে আদালতে হাজির করত এবং আদালত তাদেরকে বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দিতেন। সাথে সাথে তা কার্যকরী করা হত। এহেন কঠোর শাস্তির বিরুদ্ধে কখনো কেউ বিদ্রোহ ও ধৃষ্ঠতা প্রদর্শন করেনি। অবশ্য মিউ শহরে সরকারী থানা ও অফিস-আদালত সবই ছিল, কিন্তু তখনকার সময়ে এ সব সরকারী প্রতিষ্ঠানের কোন কাজই ছিল না বললে অত্যুক্তি হবে না। এর ফলে সাধারণ মানুষের চরিত্র ও আচার-আচরণের উপর বিরাট প্রভাব পড়েছিল। ফলে ঝগড়া-বিবাদ ও অপরাধ প্রবণতা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অন্ততঃ মিউ শহরের দৃশ্য এমন ছিল যে, সেটি একটি নিরাপদ দেশ, বরং ইসলামী রাষ্ট্রের রূপ ধারণ করেছিল।

আগেই যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ পরিবেশ দু'-তিন বছর অবধি বিরাজমান ছিল। অতঃপর ১৯২৩ সালে মবস্তিা কামাল পাশা কর্তৃক "খেলাফতের" বিলুপ্তি ঘোষিত হওয়ার ফলে "খেলাফত আন্দোলনের" মূল ভিত্তি ধ্বসে পড়ে। অন্যদিকে দেশের মধ্যে এমন কিছু অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, যার ফলে সে পরিবেশও বিনষ্ট হয়ে যায়। এতদ্‌সত্ত্বেও "খেলাফত আন্দোলনের" বেশ কিছু সুদূর প্রসারী গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান থেকে গিয়েছিল। যেমন, সাধারণ মানুষের অন্তরেও ইংরেজ সরকারের বিরোধিতা ও শত্রুতার সাহস সুদৃঢ় হয়েছিল, তাদের অন্তর হতে সরকারের ভয়ভীতি সম্পূর্ণ রূপে মুছে গিয়েছিল। আর আমাদের ন্যায় মানুষেরা তো "নিজেদের সরকার" গঠনের স্বপ্ন দেখছিল। তা না হলেও অন্ততঃ "খেলাফত আন্দোলন" চলাকালীন সময়ে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, সে পরিবেশের স্বপ্ন দেখে যাচ্ছিলাম। যা আমি নিজেই মিউ শহরে প্রত্যক্ষ করেছি।

দেওবন্দের ছাত্রজীবন ও "জমিয়াতুল ওলামার" সাথে সম্পর্ক স্থাপন

পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এসব ঘটনাপ্রবাহ ছিল আমার ছাত্র জীবনে। পরবর্তী সময়ে আমার শিক্ষাজীবনের শেষ দু'বছর আমি দারুল উলূম দেওবন্দেই অতিবাহিত করি। উল্লেখ্য যে, এখানে আমি ষাট বছর পূর্বের দারুল উলূম দেওবন্দের কথাই বলছি। মাত্র ৩/৪ বছর আগে হযরত শায়খুল হিন্দ (রঃ) ইন্তেকাল করেছেন। "খেলাফত আন্দোলন" দ্বারা আমার মধ্যে যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল, দেওবন্দের পরিবেশ তার সহায়ক হওয়ার কারণে সে উৎসাহ-উদ্দীপনা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছিল ও সুদৃঢ় হয়ে উঠেছিল। "খেলাফত আন্দোলন" থেমে গিয়েছিল বটে, কিন্তু সে আন্দোলনের দ্বারা সৃষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনার খোরাক হিসেবে মুসলমানদেরই সংগঠন "জমিয়াতুল ওলামা হিন্দ" কার্যক্ষেত্রে থেকেই গিয়েছিল। দারুল উলূম দেওবন্দে শিক্ষাপ্রাপ্ত আমাদের ন্যায় লোকেরা নিজেদের পূর্বসুরীদের সংস্পর্শে থেকে এ সংগঠনকে নিজেদেরই সংগঠন ধারণা করতঃ তার সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে নিতেন। সে মতে আমি নিজেও উক্ত সংগঠনের সাথে জড়িত হয়েছিলাম।

তদানিন্তন "জমিয়াতুল ওলামা"

তৎকালীন সময়ে এ সংগঠন সত্যিকার অর্থে "জমিয়াতুল ওলামা" ছিল। কেবলমাত্র ওলামায়ে কেরামই এ সংগঠনের সদস্য ও কর্মকর্তা হতে পারতেন। অবশ্য তখনও এ সংগঠন অন্যান্য রাজনৈতিক দলসমূহের ন্যায় সর্বশ্রেণী থেকে সাধারণ সদস্য সংগ্রহ ও নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করেনি।

যদিও আমাদের এ সংগঠনে দেওবন্দী ছাড়াও অন্যান্য শ্রেণী ও মতানুসারী এক বিপুল সংখ্যক ওলামায়ে কেরাম অন্তর্ভূক্ত ছিলেন, আবার তাঁরা এর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, যেমন, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, আহলে হাদীস গ্রুপের ওলামায়ে কেরাম, ফিরিঙ্গী মহল গ্রুপের ওলামায়ে কেরাম, বদায়ূনী গ্রুপের ওলামাদের মধ্যে মাওলানা আজাদ সুবহানী, মাওলানা নেছার আহমদ কানপুরী, মাওলানা ফাখের এলাহাবাদী, (মাওলানা আহমদ রেজা খানের খলীফাদের মধ্যে) মাওলানা মুখতার আহমদ মিরাটী প্রমূখ, তাঁর ভাই মাওলানা নজীর আহমদ খজন্দী ও মাওলানা আবদুল আলীম মিরাটী (পাকিস্তানের মাওলানা নুরানী মিয়ার শ্রদ্ধেয় মরহুম পিতা)। তবুও "জমিয়াতের" বেশী সংখ্যক সদস্য ও কর্মকর্তা দেওবন্দী ওলামায়ে কেরাম ছিলেন।–২

---

২. মাওলানা আহমদ রেজা খান বেরেলবী "খেলাফত আন্দোলনের" কট্টর বিরোধী ছিলেন। নিজের স্বভাব অনুযায়ী তিনি এ বিষয়ের উপর কয়েকখানা পুস্তকও রচনা করেছিলেন। কিন্তু মাওলানা মুখতার আহমদ মিরাটীসহ তাঁর কতিপয় খলীফা এ বিষয়ে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। যা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নামান্তর। –(নোমানী)

এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে তৎকালীন সময়ে এক মজার কথা চালু হয়েছিল যে, কোন এক সময় (হানাফী মতানুসারী বদায়ূনী) মাওলানা আবদুল মাজেদ বদায়ুনী মরহুম অভিযোগের সুরে সলফী গ্রুপের মরহুম মাওলানা আবুল কালাম আযাদকে বলেন, আমাদের "জমিয়াতের" নাম হল "জমিয়াতুল ওলামা, হিন্দ"। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে "জমিয়াতে ওলামায়ে দেওবন্দ"ই হতে চলেছে। উত্তরে, তখন মাওলানা আবুল কালাম আযাদ নিজের স্বভাব সুলভ বিশেষ ভঙ্গিতে বলেন যে, "ভাই, ভারতে যখনই "জমিয়াতুল ওলামা" প্রতিষ্ঠিত হবে, তখনই তার গঠন–প্রকৃতি এ ধরনেরই হবে বৈ কি। কেননা, এখানে ওলামা তৈরীর কাজ একমাত্র দেওবন্দই সম্পাদন করছে। সুতরাং যখনই ওলামাদের একত্রিত করা হবে, তখন তাদের সংখ্যাই বেশী হবে। যদি আমরা ও আপনারা একাজ সম্পাদন করে যেতাম, তাহলে আমাদের সংখ্যাই বেশী হতো।"

স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেসের সাথে যৌথ কার্যক্রম

"খেলাফত আন্দোলন" চলাকালীন সময়ে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে "ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের" সাথে যৌথ কার্যক্রম গ্রহণের যে মূলনীতি প্রণয়ন করা হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে "জমিয়াতুল ওলামা"-ও একইভাবে সে নীতির উপর কায়েম ছিল। কেননা, "জমিয়াতের" দৃষ্টিতে দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য বিষয় ছিল।

স্বাধীনতা সম্পর্কে "জমিয়াতের" বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি

এখানে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে, দেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে "জমিয়াতুল ওলামার" একটি বিশেষ নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, যা তদানিন্তন "জমিয়াতের" সম্মেলনসমূহে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণগুলোর অনুলিপিসমূহে সংরক্ষিত রয়েছে এবং প্রয়োজনে আজও দেখতে পারা যাবে বৈকি। আর "জমিয়াতের" অধিবেশনসমূহে গৃহীত বিভিন্ন প্রস্তাবেও রয়েছে এ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতির কথা। (বিশেষতঃ বিহারের নায়েবে আমীরে শরীয়ত হযরত মাওলানা মোহাম্মাদ সাজ্জাদ সাহেবের মুরাদাবাদ সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ, কোলকাতা সম্মেলনে প্রদত্ত হযরত মাওলানা সৈয়দ সুলাইমান নদভীর সভাপতির ভাষণ এবং পেশাওয়ার সম্মেলনে দেয়া হযরত মাওলানা আনোয়ার শাহ-এর সভাপতির ভাষণসমূহ।)

এখনো আমার স্মরণ আছে যে, তৎকালীন "জমিয়াতুল ওলামা" কর্তৃক রচিত গঠনতন্ত্রে **"লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য"** শিরোনামের অধীনে সম্ভবতঃ প্রথম ধারাতেই লিপিবদ্ধ রয়েছে, **"শরীয়তের মূলনীতির আলোকে সমগ্র ভারতের পুর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা।"**

মোদ্দা কথা, ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে "জমিয়াতুল ওলামার" একটি বিশেষ নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। উপরন্তু, এ বিশেষ নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে জমিয়াতের মুরব্বী, কর্মকর্তা ও নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতা সংগ্রামকে নিজেদের জন্য "জেহাদ ফি সাবিলিল্লাহ" বা আল্লাহর পথে জেহাদ মনে করতেন। আর এ নিয়তেই তাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে এত ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করতে পেরেছিলেন।

"শুদ্ধি সংগঠনের" আন্দোলনের যুগ

"খেলাফত আন্দোলনের" সার্বিক দুর্বলতা এবং পরবর্তীতে আন্দোলনের ইতি ঘটে যাওয়ার কয়েক বছর পর্যন্ত এমন কিছু কারণে, যেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার অবকাশ এখানে নেই, বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়। অধিকন্তু, আর্য হিন্দুদের "শুদ্ধি সংগঠন আন্দোলনের" ফলে সে সময় হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্পূর্ণ বিনষ্ট ও ধ্বংস হয়ে যায়। এতদ্ব্যতীত, দ্বীন সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন মুসলমানরা উল্লেখিত "শুদ্ধি সংগঠন আন্দোলনের" বিরুদ্ধে দ্বীনের হেফাজতের নিমিত্তে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে "জমিয়াতুল ওলামার" সর্বাত্মক প্রচেষ্টা এ ক্ষেত্রেই নিয়োজিত ছিল। এছাড়া সে সময় "জমিয়াতুল ওলামা" "আল-জমিয়াত" নামে নিজেদের একটি পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মাওলানা মাওদুদী সাহেবকে উক্ত পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করা হয় এবং তখন তাঁর যৌবন কাল ছিল। আমি "আল-জমিয়াত" পত্রিকার মাধ্যমেই সর্বপ্রথম তাঁর নামের সাথে পরিচিত হই। পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে সময় বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী প্রচেষ্টাসমূহ স্তিমিত হয়ে পড়েছিল এবং কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও কোন আন্দোলন সংগ্রাম অব্যাহত ছিল না।

১৯৩০ সাল থেকে পুনরায় স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু

১৯৩০ সালে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেস পুনরায় স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করে। পক্ষান্তরে, "জমিয়াতুল ওলামা"-ও এ সংগ্রামে কংগ্রেসের সাথে যৌথভাবে অংশ নেওয়ার জন্য দলের "আম্রোহা" অধিবেশনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অতঃপর কংগ্রেসের সাথে সংগ্রামের ময়দানে অবতীর্ণ হয়।

তৎকালীন সময়ে আমার অবস্থা ও দায়িত্বসমূহ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমি "জমিয়াতুল ওলামার" সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। আমার এ সম্পর্ক যদিও মানসিক ও চৈন্তিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গভীর ও সুদৃঢ় ছিল এবং দেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা ও ত্যাগ স্বীকারকে আমি "ফি সাবিলিল্লাহ" মনে করতাম ও বুঝতাম, কিন্তু এতদ্সত্বেও এ ব্যাপারে রাজনৈতিক

প্রচেষ্টা এবং আন্দোলনের কর্মক্ষেত্রে নামে মাত্রই আমি শরীক ছিলাম। কেননা, তৎকালীন সময়ে শিক্ষকতাই ছিল আমার প্রধান দায়িত্ব। এতদ্ব্যতীত আর্য-হিন্দুদের পক্ষ থেকে পরিচালিত "শুদ্ধি" আন্দোলনের (যা উপরে বর্ণিত হয়েছে) ফলে তখনকার সময়ে আর্য-হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিতর্ক সভা ও মোনাযারার ময়দান বেশ উত্তপ্তই ছিল। এক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তাআলা আমাকে ইসলামের পক্ষে কথা বলার ও প্রতিনিধিত্ব করার কিছু যোগ্যতা প্রদান করেছিলেন বিধায় আমি সেগুলোতেও অংশগ্রহণ করে যাচ্ছিলাম। অধিকন্তু, কাদিয়ানী ফিৎনা ও কাদিয়ানী মুবাল্লিগদের তৎপরতাও সে সময় অত্যন্ত জোরদার ও বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাদের মোকাবিলা করতঃ উক্ত ফিৎনা থেকে উম্মতের হেফাজতের দায়িত্ব পালনের তাওফীকও আল্লাহ্ তায়ালা আমার মত দুর্বলকে দান করেছিলেন।

অপরদিকে প্রায় একই সময়ে নজ্দের ওহাবী হুকুমতের তৎকালীন শাসক আবদুল আজিজ বিন সউদ শরীফ হোসাইনকে (বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ইংরেজদের সাহায্য ও সমর্থনে যিনি তুর্কীর খেলাফতে-ওসমানিয়া ও খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতঃ হেজাযের উপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন) মক্কা-মদীনাসহ সমগ্র হেজায এলাকা থেকে বিতাড়িত করতঃ সেখানে স্বীয় কর্তৃত্বই প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিলেন এবং স্বীয় মতবাদ অনুসারেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলে সেখানে ধর্মীয় সংস্কার সাধন করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি মক্কা মোকাররমার কবরস্থান "জান্নাতুল-মোয়াল্লা" ও মদীনা মুনাওয়ারার কবরস্থান "জান্নাতুল-বকীতে" কবরের উপর নির্মিত গম্বুজসমূহ ভেঙ্গে দিয়েছিলেন, (রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর হেদায়াতের স্পষ্ট বিরোধিতা করত) যা কোন কোন আহ্‌লে বাইত ও সাহাবায়ে কেরামের মাজারের উপর কোন এক সময় নির্মিত হয়েছিল। হেজাযের এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুস্থানের বিভিন্ন শ্রেণীর কবর-পূজারীর দল, বেদআতী ও শিয়া সম্প্রদায় ঐক্যফ্রন্ট গঠনপূর্বক "ওহাবী ও ওহাবী মতবাদের" বিরুদ্ধে বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে এক ঝটিকা অভিযান শুরু করে। এখানে হিন্দুস্থানে শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (রঃ) এবং তাঁর "দাওয়াতে তাওহীদ" ও সুন্নাতের পতাকাবাহী দেওবন্দী ওলামায়ে কেরামদেরকেই তাঁরা তাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য বানায়। উপরন্তু, কাফের আখ্যা দেয়া, বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মাধ্যমে মাওলানা আহমদ রেজা বেরেলবী কর্তৃক প্রবর্তিত সেই পুরাতন ফিৎনা পুনরুজ্জীবিত হয়ে বেশ জোরদার হয়ে উঠে, যা "খেলাফত আন্দোলন" চলাকালীন সময়ে সমূলেই উৎপাটিত হয়েছিল। এ ক্ষেত্রেও বিতর্কসভা ও মোনাযারার ময়দান বেশ উত্তপ্ত হয়ে যায়। এ বিষয়ে আমি আল্লাহ্ তাআলার তাওফীকে হক মতবাদ ও আহ্‌লে হক্কের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করা ও কথা বলায় সক্রিয় অংশ নিয়েছিলাম। মোদ্দা কথা, দীর্ঘকাল পর্যন্ত শিক্ষকতার সাথে সাথে ইসলামের পক্ষে কথা বলা এবং দ্বীনে-হক ও আহ্‌লে হক্কের বিরুদ্ধে পরিচালিত আক্রমণসমূহে প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রসমূহেও আমার বিশেষ ভূমিকা ছিল বৈকি। আল্লাহ্ তায়ালা নিজ মেহেরবানী দ্বারা এসব কাজ কবুল করুন এবং ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ ক্ষমা করুন।

মাওলানা মাওদুদীর "তরজুমানুল কোরআন" পত্রিকা প্রকাশ

"তরজুমানুল কোরআন" পত্রিকা সম্ভবতঃ ১৯৩২ সালের দিকে প্রকাশিত হয়েছিল। হযরত মাওলানা আবদুস শুকুর সাহেব ফারুকী লখনৌবী "দারুল মুবাল্লেগীন" নামের একটি প্রতিষ্ঠান লখনৌতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, দারুল উলুম দেওবন্দের ন্যায় বড় বড় দ্বীনি মাদরাসাসমূহে শিক্ষা সমাপনকারী যোগ্যতা সম্পন্ন ছাত্রদের যুগোপযোগী ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগ এবং অভ্যন্তরীণ ফিৎনাসমূহ থেকে ইসলামকে হেফাজত করা ও বাইরের আক্রমণের প্রতিরোধ করার যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনের জন্য লেখা ও বক্তৃতা এবং মোনাযারা বা বিতর্কশাস্ত্রের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া। মরহুম মাওলানা সাহেব এ প্রতিষ্ঠানের খেদমতের জন্য আমাকেও অহ্বান করেছিলেন। তাই এ দায়িত্ব নিয়ে কিছুদিন আমি সেখানে অবস্থান করেছিলাম। সে সময় তাঁর সম্পাদিত মাসিক "আন্নজম-লখনৌ" পত্রিকা চালু ছিল। উক্ত পত্রিকা অফিসে হায়দারাবাদ থেকে "তরজুমানুল কোরআন" নামের একটি পত্রিকা আসতে শুরু করে। পত্রিকাটির উপর সম্পাদক হিসেবে নাম লেখা থাকত "মাওলানা সৈয়দ আবুল-আলা মাওদুদী"।-৩

মাওলানা লখনৌবী মরহুমের ছেলে মাওলানা আব্দুল মোমেন ফারুকী, যিনি নিজেও একজন নবীন লেখক ছিলেন, একবার তাঁর একটি সংখ্যা আমাকে দেন। পত্রিকাটি পাঠ করে আমি অনুভব করি যে, এ পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা আবুল আলা মাওদুদী সাহেবকে আল্লাহ তাআলা ইসলামের বিষয়াবলী ও মূলতত্ত্বসমূহকে যুগোপযোগী হিসেবে উপস্থাপন করার অসাধারণ যোগ্যতা ও দক্ষতা দান করেছেন। আর পাশ্চাত্য লেখকদের গ্রন্থসমূহে ইসলাম সম্পর্কে যে সব ভূল ধারণার বীজ বপন করা হয়েছে এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান ও ধ্যান-ধারণা দ্বারা ইসলামের প্রতি যে সব সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে, সে সবের মূলোৎপাটন করতঃ অন্তরের প্রশান্তি ও দৃঢ়তা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ দক্ষতা ও পারদর্শিতার অধিকারী। এরপর থেকে আমি "তরজুমানুল কোরআনের" প্রত্যেকটি সংখ্যার অপেক্ষায় থাকতাম। পত্রিকাটি মৌলভী আব্দুল মোমেন মরহুম আমাকে পৌছিয়ে দিতেন এবং আমি অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে পাঠ করতাম।

---

৩. প্রকৃত পক্ষে "তরজুমানুল কোরআন" পত্রিকাটি অন্য এক ব্যক্তি প্রকাশ করেছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁর নাম ছিল আবু মোহাম্মদ মোস্‌লেহ। আব্দুল মজীদ কোরাইশী সাহেব যেমন লাহোর থেকে "সীরাত আন্দোলন" পরিচালনা করতেন, তেমনিভাবে আবু মোহাম্মদ মোসলেহও হায়দারাবাদ থেকে "কোরআন আন্দোলন" পরিচালনা করতেন। এ আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে তিনি "তরজুমানুল কোরআন" নামক পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন। তিনি নিজেই এ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু তিনি সফলতার সাথে এ পত্রিকা পরিচালনা করতে পারেননি বিধায় কোন লেনদেন বা চুক্তির মাধ্যমে মাওলানা মাওদুদী সাহেব পত্রিকাটি নিয়ে নেন। তখনকার দিনে তিনি হায়দারাবাদেই অবস্থান করছিলেন। তাঁরই সম্পাদনায় ১৩৫২ হিঃ সালের মোহররম থেকে "তরজুমানুল কোরআনের" প্রকাশনা শুরু হয়।

বেরেলী থেকে "আল-ফুরকান" প্রকাশিত

লখনৌ অবস্থানকালেই আমি "আল-ফুরকান" পত্রিকা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এবং মোহাররম-১৩৫৩ হিজরী, মোতাবেক, মার্চ ১৯৩৪ সালে বেরেলী থেকে এ পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। ফলে তার বিনিময় স্বরূপ "তরজুমানুল কোরআন" পত্রিকা তখন আমি সরাসরি পেতে থাকি। পত্রিকাখানি আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং তাঁর প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাই পূর্বের পূর্ণ এক বছরের যে সব সংখ্যা লখনৌতে দৃষ্টিগোচর হয়েছিল, অথচ আমার কাছে ছিল না সেসব সংখ্যাও "তরজুমানুল কোরআনের" হায়দরাবাদস্থ অফিস থেকে মূল্যের বিনিময়ে সংগ্রহ করে নিই এবং উক্ত পত্রিকার পূর্ণ ফাইল আমার নিকট সংরক্ষিত থাকাটাকে আমি আবশ্যক মনে করি। অধিকন্তু, "তরজুমানুল কোরআন" পাঠে মাওলানা সাহেবের প্রতি আমার ভক্তি ও ভালোবাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতেই থাকে। তাই সে যুগে তাঁকে আমি "মোতাকাল্লিমে ইসলাম" বা "ইসলামী দার্শনিক" লিখে যাচ্ছিলাম। এতদভিন্ন আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং আল্-ফুরকানের মাধ্যমে "তরজুমানুল কোরআনের" পাঠক ও গ্রাহক হওয়ার জন্য জনসাধারণকে উদাত্ত আহবান জানাতাম এবং উৎসাহিত করতাম।

"তরজুমানুল কোরআন" একটি খাঁটি ধর্ম ও শিক্ষা-বিষয়ক পত্রিকা

তখনকার দিনে "তরজুমানুল কোরআন" একটি খাঁটি ধর্ম ও শিক্ষা-বিষয়ক পত্রিকাই ছিল। দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন ও এতদসংক্রান্ত বিষয়াবলীর কোন আলোচনাও পত্রিকার পাতায় থাকত না। এমনকি, তখনকার দিনে যে বৃটিশ সরকার সবচেয়ে বড় স্বৈরাচারী সরকার ছিল এবং ভারতবর্ষ ও ইসলামী বিশ্বের এক বিরাট অংশের উপর প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধেও এ পত্রিকায় কিছুই লেখা হত না। পক্ষান্তরে, "হুকুমতে ইলাহিয়্যা", "ইক্কামতে দ্বীন" ও "ইসলামী নেজাম" অথবা এসব উদ্দেশ্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে কোন দল বা সংস্থার প্রতিষ্ঠা ও গঠন সম্পর্কিত কোন আলোচনাও পত্রিকার পৃষ্ঠাসমূহে পাওয়া যেত না। এসব বিষয় তখনকার দিনে এ পত্রিকার আলোচ্য বিষয়সমূহের পরিধির বহির্ভূত ছিল।

"তরজুমানুল কোরআনে" রাজনৈতিক আলোচনার সূচনা

"তরজুমানুল কোরআন" প্রকাশিত হওয়ার চতুর্থ বর্ষে ১৯৩৫ সালের "ভারত শাসন আইন"-এর ভিত্তিতে ১৯৩৬ সালে সমগ্র ভারতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তখনকার দিনে পৃথক নির্বাচন প্রথা চালু ছিল। মুসলমান প্রতিনিধিদেরকে মুসলমানরা নির্বাচিত করত এবং হিন্দু প্রতিনিধিদেরকে হিন্দুরাই নির্বাচিত করত। এই নির্বাচনের ফলে দেশের সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জিত হয়ে যায়।

পরিণামে, এসব প্রদেশে অন্য কোন দলের অংশীদারিত্ব ব্যতিরেকে এককভাবে কংগ্রেসী সরকার গঠিত হয়। মুসলিম প্রধান সীমান্ত প্রদেশও এ সাত প্রদেশের মধ্যে ছিল। পক্ষান্তরে, অন্যান্য প্রদেশসমূহে কোন কোন স্থানীয় দলসমূহ দ্বারা কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। এ সব প্রাদেশিক সরকার আইনের দিক দিয়ে বৃটিশ সরকারের অধীনস্থ হওয়া সত্ত্বেও প্রায় স্বাধীন ছিল।

এ পর্যায়ে আমাদের ন্যায় লোকদের নিকট দু'টি বাস্তব বিষয় পরিষ্কার হয়ে উঠে। প্রথমতঃ দেশ সম্পূর্ণরূপে ইংরেজদের অধিকারমুক্ত হওয়ার সময় আর বেশী দূরে নয়। দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন যে ধারায় চলছে এর ফলে যে স্বাধীনতা অর্জিত হবে এবং যে গণতান্ত্রিক জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে, তা মুসলমানদের আশা-আকাঙ্খা মোতাবেক হবে না। বরং মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশসমূহে বিশেষতঃ তাদের তাহ্‌জীব ও জাতীয় মূল্যবোধের ক্ষেত্রে নিত্য-নতুন বিপদের সৃষ্টি হবে।

১৯৩৬ সালের নির্বাচনের পর দেশীয় রাজনীতির উপর মাওলানা মাওদুদীর লেখাসমূহ

সে সময় মাওলানা মাওদুদী সাহেব উপরোক্ত বিষয়ের উপর "তরজুমানুল কোরআনে" লিখতে শুরু করেন। সত্যি বলতে কি, তিনি ছিলেন কলমের রাজা, তাই তাঁর এসব লেখা শক্তিশালী প্রমাণের দিক দিয়ে অত্যন্ত মজবুত ও হৃদয়গ্রাহী ছিল। এমন কি, আমি নিজেও এসব লেখা দ্বারা অস্বাভাবিকরূপে প্রভাবিত হয়েছিলাম। তদুপরি অন্যান্য পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীর পাতায়ও এসব লেখা পুনঃপ্রকাশিত হতো। শুধু তাই নয়, "জমিয়াতুল ওলামার" মুখপত্র "আল-জমিয়াত" পত্রিকায়ও এসব লেখার দুই কিংবা তিন কিস্তি প্রকাশিত হয়। (অথচ এসব লেখা তখনকার "জমিয়াতের" রাজনৈতিক কর্মসূচীর প্রতি বিরাট আঘাত হানছিল।) "আল-ফুরকান" পত্রিকায়ও এসব লেখা পুনঃপ্রকাশিত হচ্ছিল এবং আমি নিজেও এর সমর্থনে লিখে যাচ্ছিলাম।

মাওলানা মাওদুদী সাহেবের সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক

মাওলানা মাওদুদী সাহেবের সাথে তখন আমার সম্পর্ক বেড়ে যায় এবং পারস্পরিক চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান শুরু হয়। উপরোক্ত বিষয়ে লেখাসমূহের এক পর্যায়ে মাওলানা মাওদুদী সাহেব মুসলমানদের সামনে "ইহ্‌য়ায়ে দ্বীন" ও "এলায়ে কালিমাতুল্লাহ"-কে মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য করে একটি "জামায়াত" প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা পেশ করেন। যে জামায়াত বা দল খাঁটি দ্বীনের ভিত্তিতে সংস্কারমূলক দাওয়াতী কাজ করে যাবে। যেমনিভাবে, মরহুম মাওলানা আজাদ সাহেব এক সময় নিজের "আল-হেলাল" পত্রিকার মাধ্যমে "হিযবুল্লাহ" নামের একটি জামায়াত বা দল গঠনের কাজ শুরু করেছিলেন। আমার যতদূর মনে পড়ে, তিনি এ লেখাতে "আল-হেলাল" পত্রিকা

হতে এতদসংক্রান্ত উদ্বৃতিও নকল করেছিলেন। তাঁর এই ইতিবাচক পরিকল্পনার সাথে সে সময় আমি নিজেও ঐকমত্য পোষণ করেছিলাম।

অতঃপর আমরা এমন এক পর্যায়ে উপনীত হই যে, চিঠি-পত্রের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, "তরজুমানুল কোরআন" ও "আলফুরকানের" মাধ্যমে ভারতবর্ষের ভবিষ্যত সম্পর্কে মুসলমানদের নিকট যা কিছু বলা হচ্ছে এবং যে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে, তাকে একটি আন্দোলনরূপে অগ্রসর করার জন্য বাস্তব প্রচেষ্টার লক্ষ্যে কোন কর্মসূচী ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হোক। ইতোমধ্যে মাওলানা মাওদুদী সাহেব এক পত্রে আমাকে অবহিত করেন, "যেহেতু পরিকল্পিত কাজের জন্য হায়দারাবাদ সম্পূর্ণরূপে অনুপযুক্ত, তাই আমি এই স্থান ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং পাঞ্জাবের একটি স্থানকে আমার নিজের ও কাজের কেন্দ্ররূপে বেছে নিয়েছি। এখন আমি সেখানে যাওয়ার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত রয়েছি"। অতঃপর এক সময় তিনি আমাকে জানিয়ে দেন, "আমি অমুক তারিখে দিল্লী যাচ্ছি, চাওড়ীওয়ালান মহল্লার "শামসী কটেজে" আমি অবস্থান করব– (এটা ছিল মাওলানার শ্বশুর বাড়ী)। উক্ত তারিখে আপনি দিল্লী পৌছবেন। সেখানে আগামী কাজের জন্য বিস্তারিত আলোচনা হয়ে যাবে।

মাওলানা মাওদুদী সাহেবের সাথে আমার প্রথম মোলাকাত

আমাদের এ পর্যন্ত সর্ব প্রকার সম্পর্কই ছিল অদেখা; পারস্পরিক মোলাকাতের কোন সুযোগই আসেনি। আমি তাঁর সাথে মোলাকাত, ভবিষ্যত পরিকল্পনা ও কর্মপন্থা সম্পর্কে আলোচনার জন্য দিল্লী সফর করি। মাওলানা মাওদুদী সাহেবের ঈমান মজবুতকারী লেখাসমূহ দ্বারা তাঁর জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে কোন ব্যক্তি যে রকম ধারণা করতে পারে, তার থেকে তাঁর জীবন পদ্ধতি অনেক ভিন্ন ছিল বলে আমি পূর্বেই শুনেছিলাম। অর্থাৎ যে ইসলামী জীবনের প্রতি তিনি জোরালো ভাষায় আহবান করেন, সে জীবনের অস্তিত্ব স্বয়ং তাঁর মধ্যে নেই। যে ব্যক্তি আমাকে এ সম্পর্কে বলেছিলেন, তিনি মাওলানার সাথে সাক্ষাতকারীদের একজন ছিলেন এবং "তরজুমানুল কোরআনের" লেখাসমূহ দ্বারা তিনি প্রভাবিত ও ভক্ত হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, মাওলানা মাওদুদী সাহেব দাড়ি মুণ্ডানো অবস্থায় থাকেন। আমার মনে আছে, এতদশ্রবণে আমি যেমন বিস্মিত ও আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলাম, তেমনিভাবে দুঃখিত ও অনুতপ্ত হয়েছিলাম। সর্বোপরি নৈরাশ্যবোধ করেছিলাম।-[৪]

---

৪. যতদূর আমার স্মরণ আছে, এটা ছিল ১৯৩৭ সনের ঘটনা। যখন চার পাঁচ বছর পর্যন্ত "তরজুমানুল কোরআনের" মাধ্যমে মাওলানার সে সব ঈমান মজবুতকারী লেখা প্রকাশিত হচ্ছিল, যেগুলোর দ্বারা তিনি আমাদের ন্যায় লোকদেরকে তাঁর ভক্ত-অনুরক্ত করে নিয়েছিলেন। তাঁর সম্পর্কে আমার সে ধারণাই ছিল, যে ধারণা একজন দ্বীনের দিশারী সম্পর্কে হওয়া দরকার।

অবশ্য এ মোলাকাতের মাত্র কয়েকদিন পূর্বে হায়দারাবাদ হতেই এক বিশ্বস্ত সূত্রে আমি অবগত হয়েছিলাম যে, বর্তমানে তাঁর জীবন-পদ্ধতিতে আমাদের ন্যায় লোকের জন্য সন্তোষজনক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। (জনৈক সম্মানিত বুযর্গ লিখেছিলেন যে, বর্তমানে মাওলানা মাওদুদী সাহেবের চেহারায় ঈমানের বীজ অঙ্কুরিত হতে শুরু করেছে।) আমি এ সংবাদে অত্যন্ত আনন্দবোধ করেছিলাম। সে যা-ই হোক, তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য আমি দিল্লীতে উপস্থিত হই। চাওড়ীওয়ালানের "শামসী কটেজে" উপস্থিত হয়ে তাঁর সাথে মোলাকাত করি। সেই প্রথম মোলাকাতে তাঁকে দেখেই অন্তরে আমার এক ধাক্কা লেগেছিল। কেননা, তখনও তাঁর বাহ্যিক আকৃতি যেমন হওয়াটা উচিত ছিল এবং যে রকম আশার সঞ্চার হয়েছিল, তার থেকে অনেক ভিন্নই থেকে গিয়েছিল। অবশ্য তিনি সে সময় দাড়ি মুন্ডানো অবস্থায় ছিলেন না বটে, কিন্তু সেদিক দিয়ে নামে মাত্র পরিবর্তন হয়েছিল। তবে যেহেতু আমি তাঁর লেখাসমূহ দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলাম এবং তাঁর সাথে এক বিশেষ আন্তরিক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছিল, তাই মনকে প্রবোধ দিয়েছিলাম যে, বাস্তব জীবনে সংশোধনের সবেমাত্র সূচনা হয়েছে, ইনশাআল্লাহ আগামীতে এ অবস্থা বিদ্যমান থাকবে না। আর তাঁর জীবন ও লেখার মধ্যে যে সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন, ইনশাআল্লাহ তা হয়ে যাবে । অতঃপর আগামী কর্মপন্থা সম্পর্কে উক্ত মোলাকাতেই বিস্তারিত আলোচনা হয়।

হায়দারাবাদ থেকে মাওলানা মাওদুদীর পাঞ্জাব গমন

এর কয়েক মাস পর এমন এক সময় আসে, যখন মাওলানা মাওদুদী সাহেব হায়দারাবাদ ত্যাগপূর্বক পাঠানকোটের সন্নিকটে "দারুল ইসলাম" নামক এক নতুন বস্তিতে চলে আসেন । বস্তিটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেখানকার চৌধুরী নেয়াজ আলী খান সাহেব নামক জনৈক একনিষ্ঠ দানবীর । এই বস্তিটি প্রতিষ্ঠা ও ওয়াকফ করার মধ্যে তার উদ্দেশ্য ছিল যে, কিছু সংখ্যক আল্লাহর বান্দাহ সেখানে বসবাস করতঃ বলিষ্ঠভাবে দ্বীনের খেদমত করে যাবেন ।-৫

৫. দারুল ইসলাম ও তাঁর প্রতিষ্ঠাতা চৌধুরী নেয়াজ আলী খান মরহুম ঃ

"দারুল ইসলাম" কোন বিরাট বস্তি ও বসতির নাম ছিল না। এর বাস্তব রূপ ও পরিচয় হল এতটুকু মাত্র যে , গুরুদাসপুর জেলার পাঠানকোটের সন্নিকটে একটি ছোট্ট বস্তি। জামালপুরের অধিবাসী চৌধুরী নেয়াজ আলী খান এবং তাঁর ভাই চৌধুরী আবদুর রহমান খান জামালপুরের সন্নিকটে নিজস্ব জমিদারীর একটি বিশেষ অংশ ওয়াকফ করতঃ সেখানে দু'খানা থাকার ঘর, কয়েকখানা কোয়ার্টার ঘর ও একখানা মসজিদ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন । (ভ্রাতৃদ্বয় অতি ভাল অন্তর এবং দ্বীনদার ছিলেন । আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে বৈষয়িক সম্পদও দান করেছিলেন। আমাদের বুযর্গদের মধ্যে হযরত মাওলানা আহমদ আলী সাহেব লাহোরী (রাহঃ) ও মাওলানা মুফতী আহমদ হাসান সাহেব অমৃতসরী (রাহ)-এর ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন এ ভ্রাতৃদ্বয়) অতঃপর এসবকে "ফি সবিলিল্লাহ" ওয়াকফ করেছিলেন এখানে দ্বীনের কিছু ভাল কাজ হওয়ার উদ্দেশ্যেই। এসব ঘর ও মসজিদকে নিয়েই "দারুল

(এর পর পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন)

কয়েক মাস পর মাওলানা মাওদুদী সাহেব স্বীয় আন্দোলন ও নিজের কর্মপন্থার এক রূপরেখা "তরজুমানুল কোরআনের" মাধ্যমে প্রকাশ করেন এবং নিজের সমমনা বন্ধুদেরকে একটি নির্ধারিত তারিখে "দারুল ইসলামে" সমবেত হওয়ার জন্য দাওয়াত দেন। উক্ত সমাবেশে একটি জামায়াত বা দল কিংবা একটি প্রতিষ্ঠান আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠিত হয়ে যাবে। তখন মাওলানার তৈরী পরিকল্পনা, রূপরেখা ও কর্মপন্থার সাথে মৌলিকভাবে আমিও ঐকমত্য পোষণ করেছিলাম।

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

ইসলাম" নাম রাখা হয়েছিল। চৌধুরী নেয়াজ আলী খান "তরজুমানুল কোরআন" পাঠ করেই একেবারে আমার ন্যায় মাওলানা মাওদুদী সাহেবের লেখাসমূহ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাঁকে বেশ সম্মান করতেন । এ সূত্র ধরেই তিনি তাঁর সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন । তিনি মাওলানা মাওদুদী সাহেবকে হায়দরাবাদ থেকে এখানে এসে কাজ করার জন্য দাওয়াত দিয়েছিলেন। এতে ডক্টর ইকবাল মরহুমের পরামর্শের বিশেষ দখল ছিল।

"দারুল ইসলামের" প্রতিষ্ঠাতা চৌধুরী নেয়াজ আলী খান সাহেব সম্পর্কে যখন আলোচনা হচ্ছে তখন আমার মন চায় যে, আল্লাহর এ মুখলিস বান্দাহর আরো পরিচয় দেয়া হোক। চৌধুরী সাহেব জমিদার হওয়া ছাড়াও অবসরপ্রাপ্ত একজন সরকারী বড় অফিসার ছিলেন এবং তাঁর অন্তরে দ্বীনের খেদমতেরও প্রেরণা ছিল। দেশ বিভাগের পর যখন সমগ্র পূর্ব পাঞ্জাব থেকে মুসলমানদেরকে বের করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তখন চৌধুরী সাহেবও পাকিস্তানে চলে আসেন। সেখানেও তিনি জাওহারাবাদে "দারুল ইসলাম" সদৃশ এক বস্তি নির্মাণ করে। তিনি আমাকে এবং বন্ধুবর মাওলানা আলী মিয়াকে বারংবার পত্র দিতে থাকেন, "আপনাদের উভয়েরই এখানে প্রয়োজন রয়েছে এবং এখানে কাজের ক্ষেত্রও আছে। আমি এখানে আপনাদের জন্য সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে রেখেছি।" (এটা ছিল সে সময়কার কথা, যখন হিন্দুস্থান থেকে মুসলমানরা দলে দলে পাকিস্তানে চলে আসছিল।) পরিশেষে, চৌধুরী সাহেব হাত চিঠি দিয়ে একজন লোক পাঠিয়ে দেন এবং বিস্তারিত লিখেন, "আপনাদের জন্য সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয়েছে। আপনারা দু'জনেই পরিবার-পরিজন নিয়ে চলে আসবেন।" এ সর্বশেষ পত্রের উত্তরে আমি চৌধুরী সাহেবের একনিষ্ঠতার স্বীকৃতি, সুধারণা ও মেহেরবানীর শুকরিয়া আদায় করতঃ লিখেছিলম, আমরা উভয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত হিন্দুস্থানে কিছু সংখ্যক মুসলমানও থাকবে, তাদের খেদমতের জন্য আমরা এখানে থেকে যাব।" দেশ বিভাগের সময় আমার ধারণা মতে, চৌধুরী সাহেবের বয়স আশি বছরেরও বেশী হয়েছিল। কিন্তু সাহসের দিক দিয়ে তিনি যুবক ছিলেন। পাকিস্তান পৌছেও অনেক দিন পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। দ্বীনের চিন্তা-ভাবনা এবং খেদমতের ধ্যান-ধারণা তাঁর সাথেই ছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁর মাগফেরাত করুন এবং তাঁর প্রতি বিশেষ রহমত করুন। −(নোমানী)

“দারুল ইসলাম” আন্দোলনের প্রথম অধিবেশন : আমার নৈরাশ্য ও অক্ষমতা প্রকাশ

নির্ধারিত তারিখেই আমি “দারুল ইসলামে” উপস্থিত হই। আমার আশা ছিল যে, মাওলানা মাওদুদী সাহেবের মধ্যে সংশোধন ও পরিবর্তনের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, তাতে এতদিনে তিনি অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন এবং তাঁর মধ্যে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কিন্তু সেখানে পৌছেই তাঁর সাথে যে দু'-এক দিন অবস্থান করি তাতে আমি দুঃখজনকভাবে নিরাশ হয়ে পড়ি এবং আমার অনুমিত হয় যে, এখনো তিনি নিজেকে পরিবর্তন করার আদৌ ইচ্ছা পোষণ করেননি। “দারুল ইসলামের” প্রতিষ্ঠাতা চৌধুরী নেয়াজ আলী খান সাহেব আগে থেকেই অদেখা অবস্থায় আমার সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। এ সুযোগে তাঁর সাথেও আমার প্রথম সাক্ষাত হয়ে যায়। তিনি মাওলানা মাওদুদী সাহেবের ব্যাপারে চিন্তিত হওয়ার সাথে সাথে আমার অনুরূপ প্রতিক্রিয়াই ব্যক্ত করে বসেন। চৌধুরী সাহেব নিজে সম্পূর্ণরূপে শরীয়তের পাবন্দ ছিলেন এবং সুখী জীবন যাপন করতেন।

মাওলানা মাওদুদী সাহেবের উক্ত দাওয়াতের প্রেক্ষিতে বাহির হতে আগত আমি ছাড়া আরো কিছু লোক ছিলেন। অবশ্য তাদের সর্বসাকূল্য সংখ্যা দশের নীচেই হবে। -৬

পরদিন নির্ধারিত সময়ে সকলে একত্রিত হয়ে বসে একটি দল বা একটি সংস্থা গঠনের রূপরেখা নির্ণয় করার কিছুক্ষণ পূর্বে আমি একাকীভাবে মাওলানা মাওদুদী সাহেবকে বলি যে, আমি এখানে আপনার সহযোগী হওয়ার ইচ্ছা নিয়েই এসেছিলাম, যা আপনিও জানেন। কিন্তু এখানে আসার পর আমার মধ্যে কিছুটা অস্থিরতা ও দুদোল্যমান অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তাই বর্তমানে যে দল বা সংস্থা গঠিত হতে যাচ্ছে, আমি তাতে শরীক হব না। এ বিষয়ে প্রথমেই আপনাকে অবহিত করে দেয়াটা আমি সমীচীন মনে করি। কিন্তু, আপনার উদ্দেশ্য ও দাওয়াতের সাথে আমার ঐকমত ও সমর্থন রয়েছে।

মাওলানা মাওদুদী সাহেব অত্যন্ত মেধাবী লোক ছিলেন বিধায় কোন্ বিষয়টি আমার জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে, তা তিনি উপলব্ধি করে নেন। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, আপনার এই অস্থিরতা ও চিন্তা-ভাবনার কারণ আমি বুঝতে পেরেছি।

৬. এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমানে ভারত কিম্বা পাকিস্তানে যারা জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাদের মধ্যে কেউ মাওলানা মাওদুদী সাহেব কর্তৃক আহুত “দারুল ইসলামের” প্রথম অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন না। সম্ভবতঃ সে সময় তাঁরা মাওলানা মাওদুদী সাহেব সম্পর্কে ওয়াকিফহালও ছিলেন না।

আসল কথা হল যে, আমি কোন্ জগতের লোক ছিলাম এবং কোথেকে চলে আসি। তা আপনি অনুমানও করতে পারবেন না। আপনার ইচ্ছা, আমি মুহূর্তের মধ্যেই পরিবর্তিত হয়ে যাই। আপনি যা চাচ্ছেন তা ইন্‌শাআল্লাহ ক্রমশঃ হয়ে যাবে। আমার পরামর্শ হল যে, আপনি নিজের রায়ের পুনর্বিবেচনা করুন। এতদ্ব্যতীত আপনার অস্বীকৃতি অন্য সব লোকের উপরও প্রভাব বিস্তার করবে।

আমি আরজ করলাম, কোন কাজে শরীক হওয়ার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অন্তরের যে স্বস্তি ও আস্থার প্রয়োজন, প্রকৃতপক্ষে বর্তমান অবস্থায় তা আমি সৃষ্টি করতে পারছিনা। অথচ আমি শরীক হতে পারছিনা বলে অত্যন্ত দুঃখিত ও অনুতপ্ত। যদি ভবিষ্যতে আল্লাহ আমাকে স্বস্তি ও আস্থা দান করেন, তবে ইন্‌শাআল্লাহ নিয়মিতভাবেও আপনার সাথে শরীক হয়ে যাবো। তবে নিয়মিতভাবে শরীক না হলেও এমনিভাবে সহযোগিতা থাকবে বৈকি। অন্যদিকে, অন্যান্য লোকদের উপর প্রভাব পড়ার সমস্যার সমাধান এভাবেও হতে পারে যে, অধিবেশনে প্রথমে আমি নিজের আস্থাহীনতা ও অস্বস্তি কিংবা অস্বীকারের কথা প্রকাশ না করে নীরবে বসে থাকবো।

অতঃপর কাজ সেভাবেই করা হয়েছিল। অন্যান্যরা যখন নিজেদের মতামত প্রকাশ করে এবং সদস্য পদ গ্রহণপর্ব সমাপ্ত করে নেয়, যাদের অক্ষমতা প্রকাশ করার ছিল তারা অক্ষমতা প্রকাশ করে দেয়, তখন সবশেষে, আমি নিজের সম্পর্কে বলে দিই যে, বর্তমানে আমি সদস্য পদ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি, আমার আরো চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।

আমি এখানে আমার বিরত থাকা অথবা অস্বীকার করার কারণটা স্পষ্ট করে দেয়া উচিত মনে করি। আমার ধারণা ছিল যে, এত বিরাট ও মহান দাবী নিয়ে যে দ্বীনি জামায়াত বা সংস্থা গঠিত হবে এবং এত মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে দুনিয়ার সামনে ঘোষণা দেবে, (যেগুলো সম্পর্কে আন্দোলনের ঘোষণা পত্রে বর্ণিত হয়েছে।) যদি এ দাওয়াতের সাথে এর নেতার জীবন পদ্ধতির অন্ততঃ প্রয়োজনীয় সামঞ্জস্য না থাকে, তবে প্রথমতঃ এটা চলবে না। আর যদি কলমের জোরে কিছুটা চলতেও থাকে, তবে তার দ্বারা মুসলমানদের দ্বীনি সংস্কারের কোন আশা করা যেতে পারে না। অথচ এ পথের মৌলিক কাজ হল যে, মুসলমানদের মধ্যে নতুনভাবে ঈমানী প্রেরণা এবং তাদের জীবনে দ্বীনি ইনকিলাব সৃষ্টি করা। যেমনটি করেছিলেন হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহঃ), শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) এবং তাঁদের সহকর্মীরা।

“দারুল ইসলামের” অভ্যন্তরে বসেই গঠিত উক্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল “ইদারায়ে দারুল ইসলাম”। মাওলানা মাওদুদী সাহেব-এর আমীর ছিলেন এবং তিনি ছাড়াও সম্ভবতঃ চার ব্যক্তি সদস্য হয়েছিলেন।-৭

৭. উপরোক্ত চার জনের মধ্যে একজন মাওলানা মাওদুদী সাহেবের “তরজুমানুল কোরআন” পত্রিকার বেতনধারী ম্যানেজার ছিলেন। তাকে সবচেয়ে বেশী উৎসাহী দেখাচ্ছিল। কিন্তু পরে সে ব্যক্তি মাওলানার বেশী আর্থিক ক্ষতি সাধন করেছিল এবং অত্যন্ত মারাত্মক লোক হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল।

"দারুল ইসলাম" থেকে মাওলানা মাওদুদীর লাহোর গমন ও "লাহোর ইসলামিয়া কলেজের" চাকুরী গ্রহণ

মাত্র কয়েক মাস পরেই "দারুল ইসলাম" থেকে মাওলানা মাওদুদী সাহেব লাহোর চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ সিদ্ধান্তের কারণ হল, "দারুল ইসলামের" প্রতিষ্ঠাতা চৌধুরী নেয়াজ আলী খান সাহেবের এমন বেশ কিছু প্রতিক্রিয়া ও অনুভূতি, যেগুলো "ইদারায়ে দারুল ইসলামে" অংশগ্রহণ করার পথে আমার জন্য প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল। এ বিষয়টি আমি সে সময়ও বুঝতে পেরেছিলাম। যাই হোক মাওলানা মাওদুদী সাহেব লাহোর চলে গেলেন এবং "তরজুমানুল কোরআনও" সেখান থেকে প্রকাশ হতে থাকলো। কিছুদিন পর তিনি সম্ভবতঃ "দ্বীনিয়াতের" অধ্যাপক কিম্বা প্রভাষক হিসেবে লাহোর ইসলামিয়া কলেজের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন।

এই পুরো সময়ে মাওলানা মাওদুদী সাহেবের সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক পূর্বের ন্যায় বিদ্যমান ছিল, তাতে কোন রকম পরিবর্তন হয়নি। নিয়মিত চিঠি-পত্রের আদান-প্রদানও অব্যাহত ছিল। আমার স্মরণ আছে যে, কোন কারণে তাঁর কলেজের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়েছিল। তিনি এক পত্রে তা বিস্তারিতভাবে আমাকে লিখেছিলেন। এখন যতদূর মনে পড়ে, কলেজের সাথে তাঁর এ সম্পর্ক অল্পদিন পরেই ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, যার বিস্তারিত বিবরণ আমার জানা নেই।

"দারুল ইসলাম" আন্দোলনের পরিসমাপ্তি

কিছুদিন পর "ইদারায়ে দারুল ইসলাম" সম্পর্কিত আলোচনা "তরজুমানুল কোরআনেও" প্রকাশ হচ্ছিল না। অতঃপর স্বয়ং মাওলানা মাওদুদী সাহেবের পত্র মারফত কিম্বা অন্য এক সূত্রে আমি জানতে পারি যে, তিনি এ কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েছেন। সুতরাং দাওয়াতের কাজ বন্ধ রয়েছে।

তখনকার দিনে আমার অবস্থা

তখনকার দিনে স্বয়ং আমার অবস্থা এই ছিল যে, "দারুল ইসলাম" সংগঠন কালে দু'-তিনদিন মাওলানা মাওদুদী সাহেবের সাথে সেখানে অবস্থানপূর্বক তাঁর সম্পর্কে মানসিকভাবে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে একজন ভাল চিন্তাবিদ ও ভাল লেখক করেছেন বটে, কিন্তু দ্বীনি বিপ্লব সাধনের পবিত্র দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী ও জীবন পদ্ধতি অর্জন করার কোন আকর্ষণ ও ইচ্ছা তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছিলনা। তাই এ সম্পর্কে তাঁর পক্ষ থেকে আমি সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ি। কিন্তু তাঁর লেখাসমূহ ও নিজের চিন্তা-ভাবনা দ্বারা সে সময় দ্বীনি কাজের যে রকম প্রচেষ্টার প্রয়োজন আমি বুঝেছিলাম, আমি অনুভব করছিলাম যে, সে

প্রয়োজন দিন দিন বেড়েই চলছে। কিন্তু আমি স্বয়ং নিজের যোগ্যতা ও দুর্বলতাসমূহের উপর সঠিক পর্যালোচনা করতঃ নিজের সম্পর্কে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, এ ধরনের কাজের নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্য আমি নই। অবশ্য যদি কোনখানে এ ধরনের কাজ শুরু হয়ে যায়, তবে আমি একজন সৈনিকরূপে কাজ করে যাব বৈকি। তাই আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, আল্লাহর কোন যোগ্য বান্দাহ্ কিম্বা কতিপয় যোগ্য বান্দাহ্ এ ধরনের কোন কাজ শুরু করলেই আমিও তাঁদের সাথে শরীক হয়ে যাবো।

সৈয়দ আহমদ শহীদের জীবনী প্রকাশিত : মাওলানা আলী মিয়ার সাথে মোলাকাত ও পরামর্শ

তখন মাওলানা আলী মিয়া কর্তৃক রচিত "সৈয়দ আহমাদ শহীদের জীবনী" সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি অনুগ্রহ করে আমার জন্যও তার একটি কপি পাঠিয়ে ছিলেন। বেশ ভাল ভাবে আমার স্মরণ আছে যে, তা পাঠ করেই আমার অন্তর আগুনের ন্যায় জ্বলে উঠেছিল। সে সময় "দারুল উলুম নদওয়া" লখনৌর ঠিকানায় আমি মাওলানা আলী মিয়ার কাছে একখানা পত্র লিখি। যতদূর আমার মনে পড়ে, পত্রের মধ্যে উক্ত কিতাব সম্পর্কে আমার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতঃ আমি লিখেছিলাম যে, আপনি আমাকে স্পষ্টভাবে বলুন, আপনি কি এ কিতাবটি শুধু রচনা করারই ইচ্ছা করেছিলেন যা রচিত হয়েছে, না সে কাজও করার ইচ্ছা পোষণ করেন, এ কিতাবটি যে কাজের দাবী রাখে? যদি এ দ্বিতীয় বিষয়টিই সঠিক হয়ে থাকে, তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি আপনার সাথে সাক্ষাত করতে চাই। যদি আপনার কোন প্রকার অসুবিধা না থাকে, তবে নিকটবর্তী সুযোগে আপনি দু'এক দিনের জন্য বেরেলীতে তাশরীফ আনবেন। আর যদি আপনি কোন কারণে এখানে আসতে না পারেন, তবে যদি পত্রের উত্তরে আমাকে অবহিত করেন, তা হলে ইনশাআল্লাহ আমি নিজেই আসব।

এ পত্রের উত্তর মাওলানা নিজ বাড়ী রায়বেরেলী থেকেই দিয়েছিলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন,"বর্তমানে আমি নিজ ঘরেই রয়েছি এবং অমুক কারণে সফর করতে অপারগ। সুতরাং আপনি নিজেই এখানে এসে যান।" এরপর আমি সম্ভাব্য স্বল্প সময়ের মধ্যে রওয়ানা হয়ে রায়বেরেলীতে পৌছে যাই।

এখানে এ বিষয়টিরও উল্লেখ করে দেয়া সমীচীন মনে করি যে, মাওলানা আলী মিয়াও মাওলানা মাওদুদীর "তরজুমানুল কোরআনের" লেখাসমূহ দ্বারা আমার ন্যায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ দিক দিয়ে আমাদের উভয়ের ধ্যান-ধারণা ও আবেগের মধ্যে সম্পূর্ণ মিল ছিল। রায়বেরেলী পৌছেই আমাদের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়। মাওলানা মাওদুদী সাহেব-ও তাঁর সে সব লেখা, যেগুলো তিনি "আগামী বিপ্লব" সম্পর্কে লিখেছিলেন এবং যেগুলো আমাদের উভয়কেই অত্যন্ত প্রভাবিত করেছিল, সে সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা হয়। সম্ভবতঃ এ সাক্ষাৎকালে আমি "ইদারায়ে দারুল ইসলাম" প্রতিষ্ঠার সূত্রে আমার নিজের পাঠানকোটের সফর এবং মাওলানা মাওদুদী সাহেব সম্পর্কে স্বীয় ধারণা ও অনুভূতির উল্লেখ করি।

সে যা-ই হোক, বর্তমানে বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দ্বীনের খেদমত ও আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে যতদূর পারা যায় আমাদের কি করা উচিত এবং আল্লাহর নামে তা আরম্ভ করে দেয়া দরকার, এ বিষয়ে তখন আমরা উভয়েই ঐকমত্যে পৌঁছি। প্রাথমিক কাজ ও তার কর্মপদ্ধতি সম্পর্কেও কিছু মৌলিক আলোচনা হয়। সমমনা ও নিঃস্বার্থপর ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি জামায়াত বা দল প্রতিষ্ঠাই ছিল কাজের প্রথম পর্যায়। আমি আলী মিয়াকে বললাম, সর্বপ্রথম আমাদের এমন একজন ব্যক্তিত্বের অনুসন্ধান করা উচিত, যিনি নিজকে এ কাজের জন্য সম্পূর্ণরূপে ওয়াকফ করতে পারেন। তিনি "আমীর" হিসেবে থাকবেন এবং তাঁর মধ্যে সে সব প্রয়োজনীয় বিষয় অন্ততঃ থাকতে হবে, যেগুলো এমন ধরনের একটি জামায়াতের আমীরের মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়। (মাওলানা আলী মিয়াকে আমি বললাম,) আমি নিজের সম্পর্কে প্রথমেই বলে দিচ্ছি, আমি চিন্তা-ভাবনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, আমি এ দায়িত্বের যোগ্য নই। এখন আপনি পরিষ্কারভাবে আপনার সম্পর্কে বলুন যে, সে দায়িত্ব গ্রহণে আপনি প্রস্তুত হতে পারবেন কি-না? তিনিও নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করলেন এবং তার কারণও ব্যক্ত করলেন। এ আলোচনায় এমন কতিপয় ব্যক্তির প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয়, যাদের দ্বারা এ দায়িত্ব পালনের আশা করা যেতে পারত। অতঃপর আমরা উভয়ে এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে সফরও করি। এসব সফরের মধ্যে এমন সব দূর-দূরান্তের সফরও ছিল, যা হিন্দুস্তানের সীমানা পার হয়ে কয়েক মাইল পরে কাবুল সীমান্ত শুরু হয়। কিন্তু এতসব সফর ও মুলাকাতের পরও তখন নিজেদের ধ্যান-ধারণা ও আবেগ-অনুভূতি মোতাবেক সম্মিলিতভাবে কোন কাজ শুরু করা যেতে পারেনি।

উল্লেখিত ঘটনাবলী সম্ভবতঃ ১৯৩৮-৩৯ সনে সংঘটিত হয়েছিল। সে সময় সচেতন মুসলমানদের মধ্যে আবেগপূর্ণ ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়েছিল এবং এ ধরনের কাজের জন্য বিশেষভাবে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। তাই তখন এ জন্য অন্তরাত্মায় প্রকটভাবে অস্থিরতা বিরাজ করছিল যে, এমনি ধরনের কোন কাজ আরম্ভ হয়ে যাক। পূর্বেও যেমন আরজ করা হয়েছে যে, "খেলাফত আন্দোলন" –কালেই অন্তরে এর বীজ অংকুরিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

অতঃপর ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। তখন এ অস্থিরতা আরো অধিকভাবে বেড়ে যায়। কেননা, তখন অনুভূত হচ্ছিল যে, এ যুদ্ধ বিশ্বের অন্যান্য জাতিসমূহের মধ্যে সম্ভবতঃ বিরাট বিরাট পরিবর্তনের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার পর মাওলানা মাওদুদী সাহেব "তরজুমানুল কোরআনে" হিন্দুস্তানের আন্দোলনসমূহ এবং মুসলমানদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংক্রান্ত বিষয়ে যে সব ধারাবাহিক লেখা লিখেছিলেন, সেগুলো এর গতিকে আরো তীব্র করে দেয় এবং এ অস্থিরতাকে আরো অগ্রসর করে দেয়। অতঃপর এ সব লেখার সর্বশেষ অংশগুলো দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি সে কাজের নিমিত্তে পুনরায় কোন জামায়াত বা দল প্রতিষ্ঠা করতে চান, যে কাজের দাওয়াত তিনি দিয়েই আসছেন।-৮

আমার লাহোর সফর এবং জামায়াতের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে মাওলানা মাওদুদী সাহেবের সাথে আলোচনা

তখন আমি একবার লাহোর সফর করি। এমন কতিপয় বিশিষ্ট বন্ধু, যারা আমার ন্যায় মাওলানা মাওদুদী সাহেবের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখতেন এবং তাঁর লেখাসমূহ ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাবিত ছিলেন, সর্বোপরি দ্বীনি দাওয়াতের কাজ আরম্ভ করার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিলেন, তাঁরা লাহোরেই তাঁর কাছাকাছি অবস্থান করছিলেন। তাঁরা যে কোনভাবে অবগত ছিলেন যে, মাওলানা মাওদুদী সাহেবের সাথে আমার ব্যক্তিগতভাবে বন্ধুত্বের সম্পর্ক এবং তাঁর দাওয়াত ও বর্তমান ভূমিকার সাথে মৌলিকভাবে আমার ঐকমত্য থাকা সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে কোন ত্রুটি অনুভব করার কারণে "ইদারায়ে দারুল ইসলাম" প্রতিষ্ঠা কালে আমি তার সদস্য পদ গ্রহণ করতে পারিনি। সে যা-ই হোক, লাহোর পৌঁছার পর সে সব বন্ধু-বান্ধব আমার সাথে আলাপ করেন। এ আলোচনার এক পর্যায়ে তাঁরা আমাকে একথাও বলেন, বর্তমানে মাওলানার জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং আমাদের মতে এখন কোন জামায়াত প্রতিষ্ঠা করে কাজ শুরু করার সময় এসেছে।

---

৮. তাঁর এতদসংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা "জামায়াতে ইসলামীর" প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পূর্বে "তরজুমানুল কোরআন" হতে নকল করে ৬০ হিজরীর রজব মাসে "আল-ফুরকানেও" প্রকাশ করা হয়েছিল। লেখাটির শিরোনাম ছিল "বিশ্বে কি হতে চলেছে এবং আমাদের ফরয (দায়িত্ব) কি?"এ লেখাটি যেন "জামায়াতে ইসলামী" প্রতিষ্ঠার পটভূমি ছিল। এ সময় আমি বোম্বাইয়ের বন্ধু-বান্ধবদের দাওয়াতে সেখানে সফর করি। আমি সেখানে একাধারে ৮-১০টা ভাষণ দিয়েছিলাম। এ সব ভাষণের বিষয়বস্তু এবং মূল বক্তব্য ছিল ইসলামের পুনরুজ্জীবন ও ইসলামী বিপ্লবের জন্য একটি সুসংহত আন্দোলনের উপর। আমি স্বীকার করি যে, তখন আমি মাওলানা মাওদুদী সাহেবের দ্বারা এত বেশী প্রভাবিত ছিলাম যে, তাঁর পরিভাষাসমূহকে আমি তাঁরই ভাষায় বলতাম। যেমন, আমি ইসলামকে "একটি বিপ্লবী আন্দোলন" বলতাম। এসব ভাষণ সংকলিত হয়ে প্রথমে "আল-ফুরকান" পত্রিকায় অতঃপর "বোম্বাইয়ের ভাষণসমূহ" নামে পুস্তিকাকারেও প্রকাশিত হয়েছিল। এসব ভাষণকে আমার পক্ষ থেকে "জামায়াতে ইসলামী" প্রতিষ্ঠার পটভূমি বলা যেতে পারে বৈকি। সে সময় আমার অবস্থা এমন ছিল যে, শুধু মাওলানা মাওদুদী সাহেবের ভাষা নয়, বরং তাঁর বিশেষ চিন্তাধারা ও মতা দর্শকেও আমার মন-মস্তিষ্ক প্রায় বিনা যাচাই ও নিরীক্ষায় গ্রহণ করে নিত। তখন "আল-ফুরকান" পত্রিকার "শাহ ওলিউল্লাহ" বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। মাওলানা মাওদুদী সাহেব আমার অনুরোধে উক্ত সংখ্যার জন্য সে প্রবন্ধটিই লিখেছিলেন, যা পরবর্তীতে "ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন" নামে পুস্তিকাকারে পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়। এ পুস্তকটি "জামায়াতে ইসলামীর" মৌলিক রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। সে সময়ে যদিও তার কোন কোন বিষয় আমার অন্তর গ্রহণ করেনি, কিন্তু যতদূর মনে পড়ে, তাকে সামগ্রিক ভাবে জ্ঞান বৃদ্ধিকারী একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ মনে করেছিলাম এবং বহুল প্রচারের আশায় তাকে "শাহ ওলিউল্লাহ" বিশেষ সংখ্যা হতে সংকলন করে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারেও প্রকাশ করেছিলাম।

উপরেও যেমন বিস্তারিতভাবে লিখেছি, আমি প্রায় দু'বছর পর্যন্ত এ অস্থিরতার মধ্যে ছিলাম এবং বিভিন্ন প্রকার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তখন আমার চাহিদা মোতাবেক দ্বীনি কাজ কোথাও শুরু হতে পারছিল না, তাই আমি পুনরায় কিছুটা প্রস্তুত হয়েছিলাম। কিন্তু তবুও বিশেষভাবে নিশ্চিত হওয়ার জন্য মাওলানা মাওদুদী সাহেবের সাথে কিছু স্পষ্ট কথা বলার প্রয়োজন মনে করি। সুতরাং তাঁর সাথে সাক্ষাত হওয়ার পর আমি আরজ করলাম যে, যদি অনুমতি হয় তবে আপনার সাথে আপনার সম্পর্কে কিছু একাকী কথা বলব। তিনি আনন্দচিত্তে এর জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। আমি তাঁকে বললাম, আপনি অবগত আছেন যে, আপনার মতের সাথে আমার বেশ ঐকমত্য এবং আপনার সাথে আমার গভীর ভালবাসা ও সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও আমি "ইদারায়ে দারুল ইসলাম" প্রতিষ্ঠা কালে তার সদস্য পদ গ্রহণে কেন বিরত ছিলাম। আমার মতে এটা সত্য যে, আমাদের কেউ নিষ্পাপ নয় বরং কোন দ্বীনি কাজের জন্য কোন নিষ্পাপ অথবা কোন মহান ব্যক্তির অপেক্ষায় বসে থাকাও ভুল। কিন্তু এতেও আমার কোন সন্দেহ নেই যে, যে ধরনের কাজ আমরা শুরু করতে চাই, সে কাজের নেতার জন্য অপরিহার্য যে, তাঁর জীবন তাঁর দাওয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া। যদি এ রকম না হয়, তবে দাওয়াতের সাথে না আল্লাহর সাহায্য-মদদ থাকবে আর না মানুষ এর দ্বারা প্রভাবিত হবে। আমি আরো আরজ করি যে, এই পুরো সময়টা এ ধরনের কাজের জন্য আমি অস্থির ছিলাম। কিন্তু কোন কাজ শুরু করতে পারিনি। এখন "তরজুমানুল কোরআনের" মাধ্যমেও আমি জানতে পারি এবং এখানকার আমার ও আপনার বন্ধু-বান্ধবরাও আমাকে বলেছেন যে, বর্তমানে এই উদ্দেশ্য ও দাওয়াতের জন্য একটি জামায়াত বা দল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি নিজের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য আপনার সম্পর্কে কতিপয় বিষয় স্বয়ং আপনার নিকট থেকেই জানতে চাই।

মাওলানা মাওদুদী সাহেব বললেন, আপনি কেন ধরে নিলেন যে, আমিই উক্ত জামায়াত বা দলের নেতা হব? আপনি এমন কোন লোক সম্পর্কে চিন্তা করুন, যিনি আপনার মতে যোগ্য ব্যক্তি হবেন। অধিকন্তু, আমার কথা হলো যে, আপনিই কেন এ দায়িত্ব গ্রহণ করবেন না? আমি বললাম, যতদূর আমার সম্পর্কে প্রশ্ন রয়েছে, আমি নিজেকে ভালভাবে যাচাই করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, আমি এধরনের কোন জামায়াত বা দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করার যোগ্য নই। যদি এটা হত, তবে এতদিনে কর্মক্ষেত্রে আমি নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়তাম। সুতরাং এহেন সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা ছেড়ে দিন। অন্য কোন যোগ্য লোকও আমার জানা মতে নেই; বরং আমি আপনার সাথে পরিষ্কারভাবে বলছি যে, বিগত দু'বছর পর্যন্ত আমি এ চেষ্টাই চালিয়েছি যে, এ কাজের যোগ্য কোন আল্লাহর বান্দাহ দাঁড়িয়ে যাবেন। কিন্তু আমি এতে ব্যর্থ হই। তাই এটাই হতে হবে যে, যদি আপনি কোন জামায়াত বা দল প্রতিষ্ঠা করেন তবে তার নেতা কিম্বা আমীর আপনিই হবেন। এজন্য আমি প্রয়োজন মনে করি যে, আমি নিজের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে আপনার সম্পর্কে স্বয়ং আপনার সাথে পরিষ্কার কথা

বলা। অতঃপর আমি তাঁকে কতিপয় প্রশ্ন করি। তন্মধ্যে, যেগুলো স্মরণ আছে সেগুলো হল এই যে-

আপনি পরিষ্কারভাবে বলুন যে, শরীয়তের আহকাম বা বিধি-বিধান সম্পর্কে বর্তমানে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপদ্ধতি কি? তিনি বললেন, যতদূর পর্যন্ত সম্ভব আমি শরীয়তের আহকামের পাবন্দী করে থাকি এবং করতে চাই।

অতঃপর আমি তাঁকে বললাম, আপনি বিশেষ কোন ইমামের মজহাবের অনুসরণকে (তক্‌লীদে শখসী) প্রয়োজন মনে করেন না, এ বিষয়ে তো আমার জানাই আছে; কিন্তু আমার মতে, এ ফেৎনার যুগে যে বিষয়ে চার ইমাম ঐকমত্য পোষণ করেন সে বিষয়ের বিরোধিতা যাতে না করা হয়, সম্ভবতঃ এটাকে আপনিও প্রয়োজন মনে করেন।

তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি এটাকে জরুরী মনে করি এবং এ সীমা অতিক্রম করাকে জায়েয মনে করি না।

(তখন পর্যন্তও তাঁর দাড়ি অত্যন্ত ছোট ছিল এবং মাথায় ইংরেজী ফ্যাশনের চুলও ছিল)। আমি বন্ধুত্বপূর্ণ সরলতায় তাঁর দাড়ির প্রতি ইঙ্গিত করে আরজ করি যে, এ ধরনের দাড়ি রাখা কি আপনার মতে জায়েয আছে?

তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি হারাম কিম্বা নাজায়েয মনে করি না। তবে অনুত্তম (খেলাফে আওলা) মনে করি। আমার মতামত হল এই যে, যাতে দূর হতে দৃষ্টিগোচর হয়, সে পরিমাণ দাড়ি রাখা জরুরী এবং একমুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখা সুন্নত।

আমি আরজ করলাম, ফেকাহর কিতাবসমূহে তো একমুষ্টি পরিমাণ দাড়িকে "ওয়াজিব" লেখা হয়েছে এবং যে ব্যক্তি এর চেয়ে কম রাখে আর দাড়ি কাটে, তার এ কাজকে নাজায়েয বলা হয়েছে। তদুপরি স্পষ্টতঃ উল্লেখ রয়েছে যে, এ মাসয়ালাটি সর্বসম্মত। আমি সে সময় "ফতহুল-কদীর" ও "দুররুল মুখতার" প্রভৃতির সে বাক্যাংশ তাকে পাঠ করে শুনালাম, যা সে সময়ও মুখস্ত ছিল-

"কোন কোন পশ্চিমারা (মরক্কো ও তিউনিসিয়া প্রভৃতি দেশের লোক) ও নপুংসকরা যে একমুষ্টি পরিমাণের চেয়ে কম দাড়ি রাখে এবং কাটে এটা কারো মতে জায়েয নেই।"

তিনি বললেন, হাম্বলী মজহাবের "মুগনী" নামক ফেকাহর কিতাবে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, এর চেয়ে কম রাখাও জায়েয আছে।

আমি আরজ করলাম, আমি "মুগনী" কিতাবটি দেখিনি, তাই সে সম্পর্কে কিছু বলতে পারব না। কিন্তু একটি মূলনীতির উল্লেখ করছি যে, যদি সকল ফকীহ-মুজতাহিদ কোন একটি কাজকে না-জায়েয বলেন এবং কোন কিতাবে জায়েয বলেও কোন কথা থাকে, আবার সেটি করার মধ্যে শরীয়তের কোন রকম উপকারও না থাকে, তবে এটা স্পষ্ট যে তাকওয়া ও সতর্কতার দাবী হল যে, সে কাজ হতে বিরত থাকা। এতদ্ব্যতীত সেহাহ্ (হাদীছের প্রামাণ্য কিতাবসমূহ)-এর যেসব হাদীছে নির্দেশসূচক বাক্য

দ্বারা দাড়ি রাখার হুকুম দেয়া হয়েছে, সেখানে দু'টি শব্দ পাওয়া যায়। শব্দদ্বয়ের আরবী ভাষার দিক দিয়ে ধাতুগতভাবে অর্থ দাঁড়ায়, "লম্বা করা" ও "বৃদ্ধি করা"। ফকীহ্গণ সম্ভবতঃ সাহাবায়ে কেরামের আমল বা কার্য-পদ্ধতি হতে বুঝে নিয়েছেন যে, যদি প্রায় একমুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখা হয়, তবে শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাযথভাবে পূর্ণ হবে। সুতরাং ফেকাহর স্পষ্ট বর্ণনাকে কিছুক্ষণের জন্য বাদ দিলেও যদি একটু গভীর ভাবে আপনি চিন্তা করেন, তবে এতটুকু তো আপনাকেও মানতে হবে যে, শুধু এ পরিমাণ দাড়ি রাখলে, যা আপনার কথা মত "শুধু দূর হতে দৃষ্টিগোচর হয়", উক্ত শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাযথভাবে পূর্ণ হবে না; বরং শব্দদ্বয়ের পরিষ্কার দাবী ও যথাযথ অর্থ হল যে, দাড়ি কিছু পরিমাণ লম্বা, বর্ধিত ও লটকানো হওয়া। অথচ বর্তমানে আপনার দাড়ি অত্যন্ত ছোট। সুতরাং আমাদের মতে হাদীছের দৃষ্টিতেও এ ধরনের দাড়ি রাখা জায়েয হওয়ার কোন অবকাশ নেই।

আমার স্মরণ আছে যে, আমার কথা শুনে তিনি বেশ কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করার পর বলেছিলেন, আমি এভাবে এই দিকটা কোন সময় চিন্তা করিনি। এখন আমার ধারণা হল যে, আপনার কথাই যথার্থ এবং আমার সংশোধন করে নেয়া দরকার।

অতঃপর আমি তাঁর চুলের দিকে ইঙ্গিত করে সেই বন্ধুত্বের নিয়মেই বললাম যে, এ ধরনের চুল রাখতে আপনি কি কোন অসুবিধা মনে করেন না? তিনি বললেন, আপনার মতে এটা কি "কযাআ", যে সম্পর্কে হাদীছে নিষেধ এসেছে? আমি বললাম, আমি এটাকে "কযাআ" বলছিনা বটে, কিন্তু একথা বলছি যে, এ ধরনের চুল রাখাটা সালেহীনদের রীতি বিরোধী এবং "গায়রে সালেহীন" বা খারাপ লোকদের পদ্ধতি। বিশেষতঃ যেসব লোক দ্বীন ও শরীয়তের পাবন্দীর আহবানকারী হবেন, তাদের জন্য এসব বিষয়ের কোন রকম অবকাশ নেই। এ কথার উপরও তিনি বললেন, আপনার একথা যথার্থ। আমি এ বিষয়টিও সংশোধন করে নেব।-৯

---

৯. এখানে অত্যন্ত আফসোসের সাথে এ ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ আলোচনার প্রায় ৮ মাস পর ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জামায়াতে ইসলামীর এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। তখন পর্যন্ত মাওলানা মাওদুদী সাহেব সে অবস্থায় ছিলেন, যে অবস্থায় তিনি আলোচনার সময় ছিলেন। (এ সুদীর্ঘ আট মাস সময়ে তাঁর মধ্যে কোন পরিবর্তন আসেনি।) তাই এ বিষয়ে তাঁকে আবারো কিছু বলতে হয়েছে, যা পরে আলোচনা করা হবে। অতঃপর আলহামদু লিল্লাহ, তিনি উক্ত দু'বিষয়ে (দাড়ি ও চুল) সংশোধন করে নেন।

এক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় অত্যন্ত দুঃখের সাথে উল্লেখ করতে হয় যে, এখন থেকে ২২ বছর পূর্বে "ইতিবৃত্তের" পর্যায়ে আল-ফুরকানে যখন মাওলানা মাওদুদী সাহেবের সাথে আমার এ আলোচনা সম্পর্কে লেখা হয়, তখন জামায়াতে ইসলামীর কলমবাজ মুজাহিদীনরা আমার এহেন 'ধৃষ্টতা' ও 'মূর্খতার' জন্য ভীষণ সমালোচনা-মুখর হয়ে উঠে। তাদের বক্তব্য হল যে, দ্বীন প্রতিষ্ঠার এমন পবিত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমি দাড়ির পরিমাণ ও ইংরেজী ফ্যাশনের চুল সংক্রান্ত বিষয়ে লেখালেখি শুরু করে দিয়েছি। (মনে হয়, তাদের মতে এগুলো ধর্তব্য বিষয় নয়।) সে সম্পর্কে যা কিছু তাদের এবং জামায়াতের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদেরকে আরজ করা সমীচীন বলে বিবেচিত হয়, তা সে সময়ে আরজ করা হয়েছিল। তবুও বর্তমানে এ ব্যাপারে আরো একটু বলার ইচ্ছা হচ্ছে যে, এ গুনাহগার ও জাহেল নিজের প্রভু পরওয়ারদেগারের সে অনুগ্রহ ও দয়ার জন্য আন্তরিক, মৌখিক এবং লেখার দ্বারা শুক্‌রিয়া আদায় করছি, আল্লাহ তা'আলা এ দুর্বলের এ ভুমিকাকেই মাওলানার দাড়ি ও চুলের সংশোধনের কারণ করে দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ, শেষ পর্যন্ত তাঁর দাড়ি হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের ওলামাদের ন্যায় বেশ চমৎকার দাড়ি হয়ে গিয়েছিল এবং চুলেরও সংশোধন হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সমস্ত অনুসারী ও অনুগামীদেরকে এর তাওফীক দান করুন।

এই সাক্ষাৎকারে মাওলানা মাওদুদী সাহেব -এর থেকে তাঁর ব্যক্তিগত অবস্থার আরো কতিপয় বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তিনি অকপটে সরল উত্তর প্রদান করেন। এ সম্পূর্ণ আলোচনাটি অত্যন্ত বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অতঃপর আমি নিজের আস্থা ও আশ্বস্ততার কথা প্রকাশপূর্বক তাঁকে বললাম যে, এখন আপনি কোন তারিখ নির্ধারণ করে একটি জামায়াত বা দল প্রতিষ্ঠার জন্য সমমনা লোকদের দাওয়াত দিন। মনে পড়ে, তখন সম্ভবতঃ আমার পরামর্শ অনুযায়ী তারিখ নির্ধারণ ও দাওয়াত প্রদান করা হয়।

"জামায়াতে ইসলামীর" প্রতিষ্ঠা : আমার অংশগ্রহণ ও দায়িত্ব

নির্ধারিত তারিখে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সমমনা ব্যক্তিবর্গ একত্রিত হয়ে "জামায়াতে ইসলামী" প্রতিষ্ঠা করেন। (১৩৬০ হিঃ শাবান, মোতাবেক ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাসেই তা হয়েছিল।) আমিও সম্পূর্ণ নিশ্চিত ও প্রশান্ত মনে সে সময় তাতে শরীক হয়েছিলাম এবং এর "আমীর" পদের জন্য আমিই মাওলানা মাওদুদী সাহেবের নাম পেশ করেছিলাম। উপরন্তু, তখন আমি পরিষ্কার ভাষায় বলেছিলাম যে, গঠনতন্ত্র অনুযায়ী "আমীরের" মধ্যে যে গুণাবলী থাকার প্রয়োজন, (খোদাভীতি, দ্বীনি জ্ঞানের মধ্যে পারদর্শিতা, সঠিক সিদ্ধান্তের অধিকারী, ধৈর্য ও দৃঢ় সংকল্প) খোদার ফজলে সেসব তাঁর মধ্যে বর্তমান রয়েছে। সেদিক দিয়ে বর্তমানে জামায়াতের সদস্যবৃন্দের মধ্যে তিনিই একমাত্র যোগ্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর জ্ঞানের পারদর্শিতা এবং উন্নত চিন্তাধারার ব্যাপারে তো আমি পূর্ব থেকেই স্বীকার করে নিয়েছিলাম আর তাক্‌ওয়া (খোদাভীতি) ও শরীয়তের অনুসরণ সম্পর্কে তাঁর সাথে কিছুদিন পূর্বে আমার যে আলোচনা হয়েছিল, তার দ্বারা আমার অন্তরকে আশ্বস্ত করে নিয়েছিলাম। (ইতিপূর্বেও যা বর্ণিত হয়েছে)।

এই প্রতিষ্ঠা অধিবেশনে আমার যে ভুমিকা ছিল, সম্ভবতঃ তা অধিবেশনের কার্যবিবরণীতেও উল্লেখিত হয়েছিল। মনে পড়ে যে, আমার মুনাজাতের মাধ্যমেই অধিবেশন সমাপ্ত হয়েছিল। আমি শুধু জামায়াতে ইসলামীর রুকনই ছিলাম না, বরং আমাকে "নায়েবে আমীর"-ও করা হয়েছিল এবং বিভিন্ন এলাকার জন্য আরো তিনজনকেও "নায়েবে আমীর" করা হয়েছিল। যথাঃ মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, মাওলানা সৈয়দ সিবগাতুল্লাহ মাদারেসী, মাওলানা সৈয়দ জাফর নদভী ফুলওয়ারী প্রমুখ। কিন্তু সম্ভবতঃ পরে "নায়েবে আমীরের" পদটি জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র থেকে বিলুপ্ত করা হয়।

জামায়াতে ইসলামীর গঠন ও প্রতিষ্ঠা এবং আমার কর্মতৎপরতা

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা অধিবেশন থেকে প্রত্যাবর্তন করে "আল-ফুরকানের" শাওয়াল সংখ্যায় "একটি দ্বীনি আন্দোলনের পরিচিতি" শিরোনামে আমি একটি লেখা প্রকাশ করেছিলাম। তাতে বিস্তারিতভাবে এ অধিবেশন এবং জামায়াতে ইসলামীর গঠন ও প্রতিষ্ঠার বর্ণনা দেয়া হয়। অধিকন্তু, এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, দাওয়াত ও কর্মপন্থা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেয়া হয়। এ লেখায় আমি "জামায়াতের" পুর্ণ গঠনতন্ত্রকে অক্ষরে অক্ষরে অন্তর্ভূক্ত করেছিলাম। কতিপয় বিশেষ ধারা বিশেষতঃ "আমীরের মর্যাদা" সম্পর্কে মাওলানা মাওদুদী সাহেবের বক্তৃতাসমূহ থেকে সুদীর্ঘ উদ্বৃতাংশসমূহও নকল করেছিলাম। পরিশেষে, "কতিপয় সন্দেহ ও সংশয় এবং সেগুলোর নিরসন ও উত্তর" শিরোনামে আমি একটি স্বতন্ত্র লেখাও প্রকাশ করেছিলাম। তাতে "জামায়াত" এবং মাওলানা মাওদুদীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সে সব প্রশ্ন ও সন্দেহের উত্তর দেয়া হয়েছিল, সে সময় অবধি যে প্রশ্নগুলো প্রকাশ পেয়েছিল কিংবা প্রকাশের আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল। উক্ত লেখায় অত্যন্ত জ্বালাময়ী ও মর্মস্পর্শী ভঙ্গীতে এবং সর্বশক্তি ও দৃঢ়তার সাথে সকল মুসলমানকে বিশেষতঃ উম্মতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে জামায়াতে শরীক হওয়া অথবা অন্ততঃ সহযোগিতা করার জন্য আমি আহবান জানিয়েছিলাম। এ লেখাটি ("একটি দ্বীনি আন্দোলনের পরিচিতি") "আল্-ফুরকান" পত্রিকার পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রসারিত হয়েছিল। "আল-ফুরকানের" উদ্বৃতি দিয়ে মাওলানা মাওদুদী সাহেব লেখাটি "তরজুমানুল কোরআনে" –ও প্রকাশ করেছিলেন।

আমার ধারণা মতে, জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াতকে সম্পূর্ণরূপে এবং বিস্তারিত দলীল–প্রমাণ সহকারে তখন পর্যন্ত এত পরিষ্কার ভাষায় স্বয়ং মাওলানা মাওদুদী সাহেব -ও "তরজুমানুল কোরআনে" লিখেননি। ঘটনা ছিল এই যে, সে সময় আমি জামায়াতের দাওয়াত এবং প্রতিনিধিত্বের আবেগে মুহ্যমান ছিলাম। যেখানেই গিয়েছি, সেখানেই সভায় বক্তব্য রাখার সুযোগ হয়ে যেত, প্রায়শঃ আমার বক্তব্যের বিষয়বস্তু এটাই হত। অথচ আমার জানা ছিল যে, আমার কোন কোন দ্বীনি আকাবের (মুরব্বী) আমার এহেন পদক্ষেপকে অপছন্দনীয় মনে করতেন। কিন্তু আমি স্বীয় পদক্ষেপকে সম্পূর্ণ সঠিক মনে করছিলাম। আর নিজের মুরব্বীদের এই মনে করে অক্ষম ও নির্দোষ মনে করতাম যে, তাদের সামনে সে পরিস্থিতি ও বিষয়াবলী এমনভাবে স্পষ্ট হয়নি, যেমনভাবে আমার নিকট হয়েছে। (সে সময় অবধি আমাদের দেওবন্দী জামায়াতের মুরব্বীদের পক্ষ হতে মাওলানা মাওদুদী সাহেব এবং জামায়াতে ইসলামীর এভাবে বিরোধিতা এবং কঠোর সমালোচনা শুরু হয়নি, যা পরবর্তী সময়ে সামনে এসেছে। তবে দেওবন্দী জামায়াতের

প্রায় সকল মুরব্বী মাওলানা মাওদুদী ও জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষন করতেন না।)

অতঃপর উক্ত শাওয়াল সংখ্যার পর জিলক্বদ, জিলহজ্ব যৌথ সংখ্যায় জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কিত সংশয় ও সন্দেহগুলোর উত্তর সম্বলিত আরো একটি স্বতন্ত্র লেখা প্রকাশ করি। এগারো পৃষ্ঠার এ লেখাটির শিরোনাম ছিল, "জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে কিছু কথা"। যা হোক, জামায়াতের প্রতিষ্ঠার পর মাসিক "আল-ফুরকান"-ও মাওলানা মাওদুদী সাহেবের "তরজুমানুল কোরআনের" ন্যায় জামায়াতের সংগঠক ও মুখপত্রে রূপান্তরিত হয়েছিল। তখনকার দিনে এটাই ছিল "আল-ফুরকান" পত্রিকার দাওয়াত এবং এটাই ছিল আমার জীবনের ব্রত।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠার কয়েক মাস পর মাওলানা মাওদুদী সাহেব এক পত্র দ্বারা আমাকে এ সুসংবাদ প্রদান করেন যে, মাওলানা মোহাম্মদ আলী কান্দলভী সাহেবও জামায়াতের সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন এবং অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে এসেছেন।-১০

এ সংবাদে আমি বেশ আনন্দিত হই। কেননা, তিনি আমাদের গ্রুপে (দেওবন্দী জামায়াতের) একজন বিশিষ্ট জ্ঞানী লোক ছিলেন। সে সময় আমাদের জামায়াত জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াতকে যাচাই করে নিক, এটাই ছিল আমার একান্ত আকাঙ্খা। কিন্তু কিছুদিন পর মাওলানা মাওদুদী সাহেবের লেখাসমূহ পাঠ করে তাঁর অন্তরে কিছু জিজ্ঞাসা ও আশঙ্কার উদ্রেক হয়। সে ব্যাপারে তিনি মাওলানা মাওদুদী সাহেবের সাথে চিঠি-পত্র বিনিময় করেন। সে সম্পর্কে মাওলানা মাওদুদী সাহেব পত্র দ্বারা আমাকে অবহিত করেন। পক্ষান্তরে, মাওলানা মোহাম্মদ আলী সাহেবও কয়েক পৃষ্ঠার এক দীর্ঘ চিঠি আমার নিকট প্রেরণ করেন। আমি সবিস্তারে উক্ত পত্রের উত্তর প্রদান করতঃ তাঁকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করি। আমার এ জবাবী পত্রও জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধিত্ব ও প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ লেখাসমূহের অন্তর্ভূক্ত। ১৩৬১ হিজরীর জুমাদাল উখরার "আল-ফুরকানে" ১৫ পৃষ্ঠাব্যাপী এ লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল। মাওলানা মাওদুদী সাহেব "আলফুরকানের" উদ্ধৃতি দিয়ে "তরজুমানুল কোরআনে" –ও লেখাটি প্রকাশ করেছিলেন। লেখাটির শিরোনাম ছিল, "জামায়াতে ইসলামীর স্বরূপ ও আমাদের কর্ম পদ্ধতি : কতিপয় সংশয়ের উত্তর"। সে সময় আমার ধারণা ছিল যে, এ লেখাটির দ্বারা আমি জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপনকারীদের সামনে চূড়ান্ত দলীল-প্রমাণ সম্পূর্ণ করে দিয়েছি।

---

১০. মাওলানা কান্দলভী সাহেব একজন পারদর্শী ও অভিজ্ঞ আলেমে দ্বীন ছিলেন। তিনি শিয়ালকোর্টে বসবাস করতেন। দেশ বিভাগের পরেও সেখানে থেকে। সম্ভবতঃ এখনও এ জগতেই আছেন। কেননা, এখনো অন্য কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি।

জামায়াতে ইসলামীর এই প্রাথমিক যুগে জামায়াতের দাওয়াত সম্পর্কিত মাওলানা মাওদুদী সাহেবের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ লেখাই আবশ্যকীয়ভাবে "আল-ফুরকানে" প্রকাশ করা হত। তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ "ইসলামী হুকুমত কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়" এবং এর পূর্বেকার অন্য একটি প্রবন্ধ "ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ" "আল-ফুরকানে" প্রকাশিত হয়। তদুপরি, এগুলোকে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ হিসেবে পুস্তিকাকারেও আমি প্রকাশ করেছিলাম, যাতে সুযোগ মত জনসাধারণের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা যায়। পূর্বেও যেমন আরজ করা হয়েছে যে, সে সময় "আল-ফুরকান" জামায়াতে ইসলামীর সংগঠক ও মুখপত্রে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং তার দাওয়াত ও প্রতিনিধিত্ব করাই ছিল আমার জীবনের ব্রত এবং হাদীছ শরীফের বাণী, "তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজের ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে", তাই আমার আন্তরিক কামনা ছিল যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাসী সমস্ত বান্দাদেরই এই অবস্থা হয়ে যাক। এ বাস্তব কথাটির প্রকাশ করতেও কোন অসুবিধা নেই, বরং বর্তমান সময়ে তা প্রকাশ করা সম্ভবতঃ যথাযথ ও সমীচীন হবে যে, সে সময় জামায়াতের মধ্যে মাওলানা মাওদুদী সাহেবের পরে আমাকেই গণ্য করা হত। স্বয়ং মাওলানা মাওদুদী সাহেবও আমার সাথে বিশেষ সম্মানের আচরণ করতেন, যার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও স্বীকৃতি দেয়া আমার উচিৎ।

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠার পর আমার লখনৌ ও আজমগড় প্রভৃতি স্থানে সফর

মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভীর সাথে আমার যোগাযোগ ও সম্পর্ক এবং ধ্যান-ধারণার ও কর্মস্পৃহার অভিন্নতা সম্পর্কিত আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। তবে তিনি লাহোরের সে অধিবেশনে শরীক ছিলেন না, যে অধিবেশনে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এ অধিবেশন এবং জামায়াতের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত সম্পূর্ণ কার্যবিবরণী বিস্তারিতভাবে তিনি জানতে পেরেছিলেন জামায়াতের সে সব সাথীর (বন্ধু-বান্ধবদের) মাধ্যমে, যারা লখনৌ থেকে লাহোর উপস্থিত হয়ে অধিবশনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত, এ ব্যাপারে আমাদের পারস্পরিক পত্র বিনিময়ও অব্যাহত ছিল। যা হোক, অতঃপর তিনি জামায়াতে ইসলামীতে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন এবং সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেন। তখন আমি লখনৌ সফর করি। "তরজুমান" পাঠে যাদের মন-মস্তিষ্ক জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত কবুল করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, তাদের একটি ছোট্ট অধিবেশন জনৈক সাথীর ঘরে অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে দাওয়াত সম্পর্কে আমার মতামত ব্যক্ত করি। অতঃপর জামায়াতে

ইসলামীতে শরীক হওয়ার শর্তসমূহ বর্ণনা করি। মাওলানা আলী মিয়া এবং আরো কতিপয় বন্ধু "কালেমায়ে শাহাদাত" পুনরাবৃত্তি করতঃ আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতের সদস্যপদ গ্রহণ করেন।-১১

তখনকার দিনে আমি "আজমগড়"-ও সফর করি। শাহগঞ্জ ও আজমগড়ের মধ্যবর্তী কোন এক ষ্টেশনে উভয় দিক থেকে আগত ট্রেন দু'টি কোন অজ্ঞাত কারণে বেশ কিছুক্ষণ সময় অবস্থান করে। আমি আজমগড় থেকে আগত ট্রেনের সেকেন্ড ক্লাসে (তখনকার দিনে) মাওলানা সৈয়দ সুলাইমান নদভীকে দেখতে পাই। আমি তাড়াতাড়ি ট্রেন থেকে নেমে সাক্ষাতের জন্য তাঁর নিকট উপস্থিত হই। সালাম ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর সর্বপ্রথম সৈয়দ সাহেব আমাকে বললেন যে, জামায়াতে ইসলামীতে মাওলানা মাওদুদী সাহেবের সাথে আপনিও শরীক রয়েছেন, তবে তাঁর সম্পর্কে আপনি কি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হতে পেরেছেন? আমি আরজ করি যে, আমি তো নিশ্চিত হয়েই শরীক হয়েছি। তিনি বললেন, আল্লাহ আপনার নিশ্চিত হওয়াটা ঠিক করুন। আমি তো তাঁর লেখাসমূহে নতুনত্বের গন্ধ পাই। এ ধরনের লোক দ্বীনের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য নয়। অতঃপর সৈয়দ সাহেবের ট্রেন ছেড়ে যায় আর আমি নিজের ট্রেনে এসে পড়ি।

মাওলানা আমীন আহসান সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ

উক্ত সফরে আমি "সরাইমীরস্থ মাদ্‌রাসাতুল ইসলাহে" উপস্থিত হয়ে মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহীর সাথে সাক্ষাৎ করি। তখন পর্যন্ত সম্ভবতঃ তাঁর সাথে আমার বিশেষ সম্পর্ক অথবা পরিচয় ছিল না। হয়ত দু' একবার মোলাকাতের সুযোগ হয়েছিল এবং কোন প্রয়োজনে পত্র বিনিময় করেছি। কিন্তু, আমি জানি না, কেন তিনি আমার প্রতি বিশেষ ভালবাসা এবং আমার উপর বিশেষ আস্থা প্রকাশ করেছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, যে সময় মাওলানা মাওদুদী সাহেবের লেখাসমূহ তীব্র গতি ও প্রচন্ড শক্তি সহকারে স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেসের সহযোগী মুসলমানদের বিরুদ্ধে আঘাত হানছিল, তখন মাওলানা আমীন আহসান সাহেব মাওলানা মাওদুদী সাহেবের লেখাসমূহের অন্যতম উত্তর প্রদানকারী ছিলেন। এমনকি, যতদূর আমার মনে পড়ে বাস্তবে তখনকার সময়ে শুধুমাত্র তাঁরই লেখাসমূহকে কোন প্রকারে মাওলানা মাওদুদী সাহেবের লেখাসমুহের উত্তর বলা যেতে পারত। কিন্তু, ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার পর মুসলমানদের অন্যান্য দলের (মুসলিম লীগ প্রভৃতি) ভূমিকা প্রসঙ্গেও একই প্রকারে কঠোর সমালোচনা করতঃ তিনি পরিষ্কার করে দেন যে, তাঁর আসল দাওয়াত হল "আল্লাহর কালেমাকেই সমুন্নত করা" আর তাঁর ভূমিকা মুসলিম জাতীয়তাবাদের পূজারীদের থেকে তেমন ভিন্ন, যেমনভাবে ভিন্ন দেশীয় জাতীয়তাবাদীদের থেকে। তখন মাওলানা আমীন আহসানের মতও মাওলানা মাওদুদী

১১. জামায়াতের সদস্য পদ গ্রহণ করার সময় "কালেমায়ে শাহাদাতের" আবৃত্তি করার নিয়ম এ ভাবে ছিল যে, যেমন পীরদের নিকট বাইয়াত গ্রহণ কালে "কালেমায়ে শাহাদাত" আবৃত্তির নিয়ম রয়েছে।

সাহেবের মতের সাথে মিলে যায়। ফলে, জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছু দিন পরেই তিনি তার সদস্য পদ গ্রহণ করেন। আমি যখন সরাইমীরে উপস্থিত হই, তখন মাওলানা আমীন আহসান সাহেব জামায়াতের সদস্য হয়েই গিয়েছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি আমাকে বলেছিলেন, ভাই! পরিষ্কার কথা হল যে, আমি মাওলানা মাওদুদী সাহেবকে জানি না; তোমাকেই জানি। যদি মাওলানা মাওদুদী সাহেব আগামীতে কোন ভুল পথে পরিচালিত হন, তখন আমি তো আল্লাহর কাছে তোমাকেই ধরে পেশ করে বলব যে, এর নিকট জিজ্ঞেস করুন। কেননা, ইনিই আমার জিম্মাদার। কিন্তু সে আলোচনা এমন এক পর্যায়ের ছিল, যাকে আমি এক প্রকার রসিকতাই মনে করেছিলাম। তবে এ সুযোগে আমি তাঁকে মাওলানা মাওদুদী সাহেব সম্পর্কে আমার ধারণা ও অনুমান কি, তা বলে দেয়া প্রয়োজন মনে করি। আমার মনে পড়ে যে, তখন আমি তাঁকে বলেছিলাম, আসল কথা হল যে, এ দাওয়াত ও কাজের জন্য যে রকম নেতার প্রয়োজন, মাওলানা মাওদুদী সাহেব সে রকম তো নন। কিন্তু, যদি তাঁর সাথে দু'চারজন এমন ব্যক্তি পাওয়া যায়, যারা সে রকম হন এবং সে সব ঘাটতি পূরণ করতে পারেন, যেগুলো তাঁর মধ্যে বর্তমান রয়েছে, তবে ইনশাআল্লাহ কাজ কিছুটা চলে যাবে।

প্রতিষ্ঠা অধিবেশনের ছয়মাস পর দ্বিতীয় অধিবেশন

অতঃপর প্রতিষ্ঠা অধিবেশনের প্রায় ছয়মাস পরে জামায়াতে ইসলামীর দায়িত্বশীল ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে লাহোরে মজলিসে শুরার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তখন আমি চোখের অসুখে ভীষণ আক্রান্ত ছিলাম। চোখে আঘাত লেগেছিল বিধায় পাট্টি বাঁধতে হয়েছিল। এমন কি আমার পরিবারের লোকেরা এমতাবস্থায় কোন প্রকারে আমার লাহোর সফর করার পক্ষপাতী ছিল না। কিন্তু, এ অবস্থায়ও আমি বেরেলী থেকে লাহোর পর্যন্ত সফর করি এবং অধিবেশনে অংশগ্রহণ করি। মাওলানা আমীন আহসান ও মাওলানা আলী মিয়াও এতে অংশগ্রহণ করেন। জামায়াতের কোন অধিবেশনে তাঁরা উভয়েই এই সর্বপ্রথম শরীক হলেন। মাওলানা মাওদুদী সাহেবের বাহ্যিক আকৃতির যে সব বিষয়ের সংশোধনের ওয়াদা তিনি করেছিলেন, সে সব বিষয়ের আশানুরূপ পরিবর্তন পরিলক্ষিত না হওয়ায় আমি অত্যন্ত দুঃখিত ও ব্যথিত হই। তখন আমি এ ব্যাপারে নিজে কিছু না বলাই শ্রেয় মনে করলাম। তাই আমি একাকী মাওলানা আমীন আহ্সান সাহেবকে বললাম যে, আপনি এসব বিষয়ে নিজের পক্ষ থেকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। যাতে তিনি অনুভব করতে পারেন যে, শুধুমাত্র আমিই এ সব বিষয়ে সংশোধন করাকে প্রয়োজন মনে করছি না; বরং মাওলানা আমীন আহ্সান ইসলাহীর ন্যায় উদার ও স্পষ্ট ধারণার আলেমও এটা প্রয়োজন মনে করছেন।

আমার স্মরণ আছে যে, লাহোর থেকে প্রত্যাবর্তন কালে মাওলানা আমীন আহ্সান ইসলাহী সাহেব আমার উপস্থিতিতেই মাওলানা মাওদুদী সাহেব এবং তাঁর সে সব সাথীর সাথে, যারা তাঁর সাথে সেখানে অবস্থান করেন, আলাপ করতে গিয়ে বলেন যে, আমি অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় এ বিষয়টি প্রকাশ করে দেয়া আমানত ও দাওয়াতের দাবী মনে করি যে, এখানে আগমনের পূর্বে আমি যতটুকু প্রভাবিত ছিলাম, এখানে এসে তাতে কিছুটা ভাটা পড়েছে। আপনারা নিজেরাই এ দায়িত্বটি অনুধাবন করবেন যে, **আপনারাই পাতিলের সে ভাত, যেগুলো দেখেই মানুষ পাতিল সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করবে।** –১২

তাই জামায়াতের মঙ্গল কামনার ক্ষেত্রেও এটা কর্তব্য যে, আপনারা নিজেদেরকে এভাবে তৈরী করে নেবেন যে, এখানে এসে যারা আপানাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করবেন, তারা আপনাদেরকে ইসলাম এবং ইসলামী দাওয়াতের নমুনা স্বরূপ দেখতে পান। আমি নির্দিষ্ট করে বলার প্রয়োজন মনে করছি না যে, আপনাদের কোন্ কোন্ বিষয়টি অধিকতর সংশোধনযোগ্য। এ ব্যাপারে আপনারা নিজেরাই চিন্তা করে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবেন।

যতদূর আমার মনে পড়ে, তদুত্তরে মাওলানা মাওদুদী সাহেব বলেছিলেন, হ্যাঁ আমার এই উপলব্ধি আছে যে, আমার নিজকে অনেক পরিবর্তন করার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু আমি ভাল মনে করি যে, আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের সাথে সাথে এবং তার দাবী অনুসারেই বাহ্যিক পরিবর্তন সাধিত হোক।

জামায়াতে ইসলামীর মজলিসে শুরার এ অধিবেশনে গঠনতন্ত্রের উপর পুনর্বিবেচনা করা হয় এবং এ দায়িত্ব আমাদের তিনজনকে দেয়া হয়– আমি, মাওলানা ইসলাহী ও মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী। হয়ত তাদের উভয়ের স্মরণ আছে যে, তখন তাতে ছোট-বড় যে সব বিষয় সংশোধন করা হয় তা সব আমিই করেছিলাম এবং তাঁরা দু'বন্ধুই আমার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছিলেন। কতিপয় বিষয়ে সংশোধনের পক্ষে আমার মত ছিল, কিন্তু তাঁরা সেগুলো প্রয়োজন মনে করেননি এবং আমিও এর জন্য বেশী পীড়াপীড়ি করিনি।

লাহোর থেকে কেন্দ্র স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত

উক্ত মজলিসে শুরায় সম্ভবতঃ আমার ও মিস্ত্রি মোহাম্মাদ ছিদ্দিক মরহুমের প্রস্তাব, বরং পীড়াপীড়ির ভিত্তিতে লাহোরে জামায়াতের কেন্দ্র না রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বরং লাহোরের পরিবর্তে আমরা অন্য কোন স্থানে এমন একটি আবাদী বা বসতি স্থাপন করব, যেটাকে আমাদের মতাদর্শের আলোকে যথাসম্ভব দ্বীনি আদর্শ বসতিরূপেই গড়ে তুলব। আর জামায়াতের যে সব সদস্য সেখানে স্থানান্তরিত হতে পারবে, তারা সেখানেই চলে যাবে। আমি নিজেও সেস্থানে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাদির আলোকে শিয়ালকোটের এলাকাকে এর জন্য সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত বিবেচনা করা হয়। তদুপরি, এ সিদ্ধান্তও গৃহীত হয় যে, এ এলাকায় যদি শীঘ্র জায়গার ব্যবস্থা না হয়, তবে অস্থায়ীভাবে "দারুল ইসলাম"– কে কেন্দ্র করার ব্যাপারে চৌধুরী নেয়াজ আলী খান সাহেবের সাথে আলোচনা করা হোক।

---

১২. মাওলানা আমীন আহ্সানের এই বাক্যসমূহ হুবহু আমার স্মরণ আছে। আশা করি, এখানে কোন শব্দ আমার নয়।

চৌধুরী সাহেবের সাথে আমার এবং মিস্ত্রী সাহেব মরহুমের বন্ধুত্ব ছিল প্রগাঢ়। তাই আমাদের নিশ্চিত আশা ছিল যে, চৌধুরী সহেব আনন্দের সাথে রাজী হবেন। অতঃপর তা-ই হয়েছিল, শিয়ালকোট এলাকায় যে স্থানটি বিবেচনাধীন ছিল হয়ত তা ব্যবস্থা করা যাচ্ছিল না অথবা কোন কারণে উক্ত পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হয়েছিল। যা-ই হোক, যখন "দারুল ইসলাম" সম্পর্কে চৌধুরী সাহেবের কাছে পত্র দেয়া হয়, তখন তিনি সম্মত হয়ে যান।-১৩

"দারুল ইসলামে" জামায়াতের কেন্দ্র

সম্ভবতঃ জুমাদালউখরায় মাওলানা মাওদুদী সাহেব স্বীয় অফিসসহ লাহোর থেকে পুনরায় "দারুল ইসলাম" প্রত্যাবর্তন করেন এবং "দারুল ইসলাম" জামায়াতের কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়ে যায়। মিস্ত্রী সাহেবও সেখানে এসে বসবাস শুরু করেন। আরো দু'-তিন বন্ধু এসে যান। কিন্তু আমার যাওয়ার ব্যবস্থাদিতে কিছুটা দেরী হয়ে যায়। ফলে প্রায় দু'-তিন সপ্তাহ পরে আমি সেখানে পৌছে যাই। আমার স্মরণ আছে যে, আমি নিজের এ সফরকে এক প্রকার হিজরতের সফর ধারণা করেছিলাম এবং আল্লাহ তাআলার এই তাওফীক দানের জন্য আমার বিশেষ আনন্দ ছিল।

১৩. মিস্ত্রী মোহাম্মদ ছিদ্দিক সাহেব জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে এক আদর্শবান দরবেশ ও বুযর্গ ছিলেন। সম্ভবতঃ জামায়াতের সদস্যদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশী বয়সের ছিলেন। তিনি পারিভাষিক আলেমে দ্বীন ছিলেন না, কিন্তু কোরআন মজীদের প্রেমিক ছিলেন। অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করতেন। নামায এত ভাল মতে আদায় করতেন যে, আমার জীবনে মাত্র কয়েকজনকেই সেভাবে নামায আদায় করতে দেখেছি। আল্লাহর কালিমার পূর্ণ বিজয় এবং এ পথে উৎসর্গ হওয়াই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় আশা। "খেলাফত আন্দোলনের" সুচনায়, বরং তারও কিছু দিন পূর্বে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ "দ্বীনের পুনরুজ্জীবন" এবং আল্লাহর কলিমার পূর্ণ বিজয়ের লক্ষ্যে "হিজবুল্লাহ" নামক যে জামায়াত গঠন করেছিলেন এবং যার জন্য তিনি মানুষের কাছ থেকে বাইয়াত গ্রহণ করতেন, মিস্ত্রী সাহেব তাতেও সাড়া দিয়ে মাওলানা আযাদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। মাওলানা আযাদ নিরাশ হয়ে কিম্বা কিছু চিন্তা-ভাবনা করে এ আন্দোলনের ইতি টেনেছিলেন। কিন্তু মিস্ত্রী সাহেবের অন্তরে সে অনুপ্রেরণা বিরাজমান ছিল। তাই তিনি মাওলানা মাওদুদী সাহেবের লেখাসমুহ পাঠে প্রভাবিত হয়ে তাঁর দাওয়াতের প্রতিও সাড়া দান করেন। তিনি জামায়াতের শুধু সদস্য নন, বরং প্রতিষ্ঠাতাদেরই একজন ছিলেন। জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্র লাহোর থেকে যখন "দারুল ইসলামে" স্থানান্তরিত হয় তখন তিনিও সেখানে এসে যান। অতঃপর যখন আমি জামায়াতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি (যার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে) তখন কিছু দিন পর মিস্ত্রী সাহেবও সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এর বিস্তারিত বিবরণ আমার জানা নেই। অবশেষে তিনি তাঁর সাবেক আবাসভূমি "সুলতানপুর লুদী" (কাপুরতলা রাজ্য পাঞ্জাব)-এর কবরস্থানের কূড়ে ঘরে বসবাস করছিলেন। দেশ বিভাগের সময় যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়, তাতে কোন নরপিশাচ গুলী দ্বারা তাঁকে আঘাত করে। অতঃপর তিনি পাকিস্তানে চলে যান। অনেক চিকিৎসার পর তিনি আরোগ্য লাভ করেন। আবার কিছু দিন পর তিনি সেখানে ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন এবং তাঁর প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন।

"দারুল ইসলাম" পৌছেই আমার এক বিরাট সমস্যা

"দারুল ইসলামে" এসে এক সপ্তাহের মধ্যেই এমন কিছু বিষয় সম্পর্কে আমি অবগত হতে শুরু করলাম যে, শরীয়তের আহ্কামের যে পরিমাণ পাবন্দী অথবা বলতে হয়, "আমলী তাক্বওয়া" জামায়াতের প্রত্যেক সদস্যের জন্য আবশ্যিক শর্তরূপে নির্ধারিত হয়েছে, স্বয়ং মাওলানা মাওদুদী সাহেবও এ পর্যন্ত নিজকে সেগুলোর পাবন্দরূপে তৈরী করেননি। উপরন্তু, জামায়াতের প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পূর্বের একান্ত আলোচনায় "তাকওয়া" ও "শরীয়তের পাবন্দী" সম্পর্কে মাওলানা সাহেবের যে অবস্থার আমি ধারণা করেছিলাম, বাস্তবে কিন্তু তাঁর সে রকম অবস্থা নয়। বরং এব্যাপারে তিনি এতই উদাসীন ও হাল্কা মনোভাব পোষণ করেন যা "তাকওয়া"-র সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এতদসম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর আমার অন্তরে বিরাট আঘাত লাগে এবং বারংবার চিন্তা-ভাবনা করেও আমি এ ব্যাপারে তাঁকে অপারগ ধারণা করতে পারিনি। কিংবা তাঁর এ রকম চাল-চলনের কোন সঠিক ব্যাখ্যাও বের করতে পারিনি।-১৪

১৪. আজ থেকে ২২ বছর আগে ১৩৭৭ হিজরীর রমজান মাসে "আল-ফুরকানে" যখন আমি আমার এই "ইতিবৃত্ত" লিখেছিলাম, তখন এ বিষয়টি এভাবে বরং এ বাক্যসমূহ দ্বারাই লেখা হয়েছিল। এর চেয়ে বেশী স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাষায় বিবরণ দেয়া সমীচীন মনে করা হয়নি। সে সময় মাওলানা মাওদুদী সাহেবের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী কোন কোন লোক এই ব্যাপারে যা লিখেছিল, তার দাবী ও চাহিদা ছিল যে, প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করে দেয়া, যা আমার জন্য এই অনুভূতি ও প্রভাবিত হওয়ার বিশেষ কারণ হয়েছিল। যদিওবা তাতে নিজের অন্তর ও স্বভাবের উপর জোর দেয়ার প্রয়োজন হত। আন্তরিক দুঃখের সাথে এখন আমার লিখতে হচ্ছে। (উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঘটনাটি কোন গোপন বিষয় নয়, যা প্রকাশ করা হচ্ছে। তখন যারা "দারুল-ইসলামে" অবস্থান করতেন এটা তাদের সকলেরই জানা ছিল।

যে ঘটনা আমাকে বিচলিত করেছিল : যে দিন আমি দারুল ইসলামে পৌছেছিলাম, তার পরের দিন কোন এক নামাযের পর মসজিদেই মাওলানা মাওদুদী সাহেব উপস্থিত সহযোগীদের সম্বোধন করে বললেন যে, ইসলামী বস্তির জন্য একজন পরিদর্শকেরও প্রয়োজন আছে। অতঃপর আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, এ দায়িত্ব আপনিই গ্রহণ করুন। আমি বললাম, এখানে তো আমরা মুষ্টিমেয় লোক রয়েছি। এদের জন্য আবার পরিদর্শকের কি প্রয়োজন? তিনি বললেন, এর ভিত্তি এখন থেকে রচিত হওয়া উচিত। যা হোক, আমাকে "পরিদর্শক" নিযুক্ত করা হল। আবার সে মজলিসে এ বিষয়টিও বলে দেয়া হল যে, আমার দায়িত্ব হল, আমাদের এই পরিধিতে যাতে শরীয়তবিরোধী কোন কাজ না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা। আমার অবস্থানের দু' চার দিনই মাত্র অতিবাহিত হয়েছিল, সম্ভবতঃ জামায়াতের কোন এক সাথীর মাধ্যমে আমি জানতে পারি যে, মাওলানা মাওদুদী সাহেবের বাবুর্চী (তখনও যুবক) তাঁর পাক ঘরে মহিলাদের সামনে খানা পাক করে এবং তার কাছ থেকে পর্দা করা হয় না। অধিকন্তু, "দারুল ইসলামে" অবস্থানকারী সাথীদের মধ্যে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। প্রথমতঃ এ সংবাদ বিশ্বাস করার জন্য আমার মন-মস্তিষ্ক প্রস্তুত ছিল না। আমি চিন্তা করেছিলাম, কিভাবে এমন হতে পারে! মাওলানা মাওদুদী সাহেব কর্তৃক রচিত "পর্দা" নামক কিতাবটি এর বহু পুর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জানতে পারি যে, বাস্তব ঘটনা এ রকমই। এঘটনা আমাকে বিচলিত ও হতবাক করে দেয়। সম্ভবতঃ এর কারণ এটাও হতে পারে যে. এ পর্যন্ত যে পরিবেশে আমার জীবন অতিবাহিত হয়েছে. সেখানে এরকম কল্পনাও করা যেতে পারে না যে. কোন রকম খোদাভীতি ও ধার্মিকতাভিত্তিক জীবনের সাথে এ রকমও হতে পারে। জামায়াতের গঠনতন্ত্রে প্রথম শ্রেণীর সদস্যদের সম্পর্কে লিখিত ছিল যে,-

"এদের জন্য শরীয়তের আহকামের পাবন্দীর ব্যাপারে কোন প্রকার রেয়ায়েত করা হবে না। তাদেরকে মুসলমানদের জীবনের পূর্ণ নমুনাই পেশ করতে হবে। তাদের জন্য রুখসত (ঐচ্ছিক)-এর পরিবর্তে আযিমত (বাধ্যতামূলক) এর পদ্ধতিই আইন বলে গণ্য হবে।"

তখন আমার সামনে আরো একটি বড় সমস্যা ও জটিলতা উপস্থিত হয়। তা হল, জামায়াতের প্রতিষ্ঠার সময় মাওলানা মাওদুদী সাহেবকে "আমীর" করার প্রস্তাব আমি নিজেই পেশ করেছিলাম এবং সকলের সামনে আমার এই নিশ্চিত ও আশ্বস্ত হওয়ার বিষয়ও প্রকাশ করি যে, মাওলানা মাওদুদী সাহেব স্বীয় এলম, আমল এবং নিজের জ্ঞান-বুদ্ধির যোগ্যতার আলোকে জামায়াতের আমীর হওয়ার যোগ্য লোক। জামায়াতের গঠনতন্ত্রে আমীরের জন্য যে সব প্রয়োজনীয় শর্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে, সেগুলো পুরোপুরি তাঁর মধ্যে রয়েছে।-১৫

অতঃপর "আল-ফুরকানের" পাতায়ও আমার এ রকম জানা ও নিশ্চিত হওয়ার বিষয় বারবার প্রকাশ করতে থাকি। এটা ছিল আমার পক্ষ থেকে মাওলানা মাওদুদী সাহেব সম্পর্কে এক প্রকার "শাহাদত", যা সে সময় আমি নিজের জানা মতে প্রদান করেছিলাম। এখন "দারুল ইসলামে" তাঁর সাথে কিছু দিন অবস্থান করার পর বুঝতে পারি যে, তাঁর অবস্থা সে রকম নয় যা তাঁর বলা থেকে আমি ধারণা করেছিলাম এবং যা আমি বক্তৃতা ও লেখার মাধ্যমে বারংবার প্রকাশ করেছিলাম। তখন আমি অনুভব করি যে, এ নতুন তথ্যাবলী সম্পর্কে অবগত হওয়ার পরও আমার জামায়াতের সদস্য পদে বহাল থাকাও এমন এক প্রকার কার্যগত সাক্ষ্য, যা ভুল এবং বাস্তব বিরোধী হওয়া সম্পর্কে আমি জানতে পেরেছি। আবার এটা এক প্রকার কপটতাও বটে। কিন্তু যেহেতু বহু উচ্চ সংকল্প নিয়েই জামায়াতে ইসলামীর সাথে শরীক হয়েছিলাম এবং তখন তার সাথে অনেক পবিত্র আশা-আকাংখা জড়িত ছিল, তাই এ রকম সন্দেহেরও উদ্রেক হচ্ছিল যে, আমি যা চিন্তা-ভাবনা করে বলেছি, এটা শয়তানের কোন প্রতারণা নয় তো? কিম্বা মন্দ কাজের নির্দেশ দানকারী প্রবৃত্তির ধোকা নয় তো? আমি ঘন্টার পর ঘন্টা বসে বসে এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছি এবং তখন আমার কি করা উচিত সে সিদ্ধান্তে আমি তখনও উপনীত হতে পারিনি।

এখানে এ বিষয়টিও ভালভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন যে, মাওলানা মাওদুদী সাহেব আমীর পদের যোগ্য নন, তাই এ পদ থেকে তাঁর সরে যাওয়া উচিত অথবা মাওলানা মাওদুদীর কতিপয় দুর্বলতার কারণে জামায়াতে শরীক হওয়া এবং এর সদস্য হওয়া এখন আর জায়েয নেই, এমন কোন সমস্যা আমার সামনে ছিল না; বরং আমার কাছে আসল সমস্যা শুধুমাত্র আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে এই ছিল যে, মাওলানা মাওদুদী সাহেব সম্পর্কে আমি বারংবার একটি সাক্ষ্য দিয়ে এসেছি এবং বর্তমানে আমি অবগত হতে পেরেছি যে, আমার উক্ত সাক্ষ্য সত্য নয়; বরং বাস্তবের পরিপন্থী। এহেন অবস্থায় যদি আমি নিয়মিতভাবে জামায়াতের সদস্যপদে বহাল থেকে যাই, তবে তা হবে আমার পূর্বেকার সাক্ষ্যের বারংবার পুনরাবৃত্তি করা, যা বর্তমানে আমার জানা মতে সত্য সাক্ষ্য নয়।

১৫. গঠনতনন্ত্রে আমীর হওয়ার জন্য যে সব প্রয়োজনীয় গুণাবলীর শর্ত করা হয়েছে, তন্মধ্যে "দ্বীনী জ্ঞানসমূহে পারদর্শিতা ও সঠিক সিদ্বান্তের ক্ষমতার"-ও পূর্বে "তাক্বওয়া" বা খোদাভীতির উল্লেখ ছিল।

শুধু এটাই ছিল আমার আসল সমস্যা, যার কোন সমাধান আমার বুঝে আসছিলনা। ফলে আমি কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। এতদ্ব্যতীত আরো কতিপয় বিষয় এ অনুভূতির সাথে যুক্ত হয়েছিল, কিন্তু সেগুলো এ পর্যায়ের ছিল না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয় ছিল এটাই।

আমার যে সব জ্ঞানী, দূরদর্শী মুরব্বী ও বন্ধু-বান্ধব জামায়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না, তাদের সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল যে যদি তাঁদের সাথে এ ব্যাপারে আমি পরামর্শ করি, তা হলে জামায়াতের গুরুত্ব, মর্যাদা, ভাবমূর্তি ও মহৎ উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল না হওয়ার কারণে তাঁরা সঠিক রায় দিতে পারবে না। তাই জামায়াতের মধ্য হতে আমি দু'জন জ্ঞানী লোককে বেছে নিই। প্রথমজন হলেন, মাওলানা আমীন আহ্‌সান ইসলাহী ও দ্বিতীয়জন মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী। আমি উপস্থিত সমস্যা সম্পর্কে একটি বিস্তারিত চিঠি লিখে মাওলানা আমীন আহ্‌সান ইসলাহীর নামে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে "মাদরাসাতুল ইস্‌লাহ্‌" সরাইমীর, আজমগড় জেলায় প্রেরণ করি। উক্ত পত্রে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তাঁর নিকট আবেদন করি যে, পত্র পাওয়ার সাথে সাথেই যেন তিনি তাড়াতাড়ি মাওলানা আলী মিয়ার কাছে যান এবং উভয়ে চিন্তা-ভাবনা করে আমাকে পরামর্শ দেন যে, এমতাবস্থায় শরীয়তের আলোকে আমার নীরবে জামায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার অবকাশ আছে কি না এবং তাতে আমার কোন প্রকার গুনাহ হবে কি-না, অথবা এহেন অবস্থায় আমার জন্য জরুরী কি-না যে স্বীয় অনাস্থা প্রকাশপূর্বক জামায়াতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা। আমি এই চিঠিখানা রেজিষ্ট্রী করে পাঠিয়েছিলাম এবং রেজিষ্ট্রীযোগে উত্তরও চেয়েছিলাম। আশা ছিল, এক সপ্তাহের মধ্যে নিশ্চয় আমি উত্তর পেয়ে যাব। কিন্তু কোন উত্তর পেলাম না।

আমার স্মরণ আছে যে সে সব দিন আমার জন্য কত কঠিন ছিল এবং রাত-দিন আমি কত কেঁদেছি। আমি অনুভব করেছিলাম যে, আমি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন। আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে আমার ঈমান ও আমার আল্লাহ প্রেমের পরীক্ষা। আমি কোন কোন সময় চিন্তা করতাম যে, যখন এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে সামনে এসে গিয়েছে যে মাওলানা মাওদুদী সাহেব সম্পর্কে আমার আস্থা প্রকাশ এবং সাক্ষ্য সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ছিল না, সুতরাং নিজকে এ জামায়াত থেকে পৃথক করে সাক্ষ্যের দায়িত্ব থেকে বেরিয়ে আসা আমার উচিত। এ সম্পর্কে আমার দ্বিধা-সংকোচ ও চিন্তা-ভাবনার একটি মাত্র কারণ ছিল, তা হল পাছে মানুষ আমাকে "বেওকুফ" সাব্যস্ত করবে না তো? আবার কোন কোন সময় চিন্তা করেছিলাম যে, যদি আমি সম্পর্ক ছিন্ন করতঃ নিজের অনাস্থা প্রকাশ করি, তবে এমন একটি ইসলামী দাওয়াত এবং জামায়াতের ক্ষতি হবে, যেটাকে মাওলানা মাওদুদী সাহেবের দুর্বলতা সত্বেও আমি বর্তমান সময়ে সবচেয়ে উত্তম ইসলামী দাওয়াত এবং জামায়াত মনে করি। আর এর ক্ষতিকে দ্বীনেরই ক্ষতি বলে মনে করি।

তখন আমি রাত-দিন বারবার দোয়া এবং এস্তেগফারও করে যাচ্ছিলাম। যখন এমতাবস্থায় দশ-বার দিন অতিবাহিত হয়ে যায় এবং আমার পত্রের উত্তরও আসেনি, তখন আমি উচিত মনে করলাম যে, এখানের স্থানীয় বন্ধুদের মধ্যে মিস্ত্রী সাহেবের নিকট আমার সমস্যা প্রকাশ করতঃ তাঁরই পরামর্শ গ্রহণ করা। আমি তাঁকে একজন খাঁটি মুমিন ও আদর্শ পর্যায়ের মুখলিস ও মুত্তাক্বী হিসেবে জানতাম।-১৬

অবশেষে, আমি মিস্ত্রী সাহেবের কাছে আমার সমস্যার কথা পেশ করি। তখন অবগত হতে পারি যে, তিনিও নাকি এ ধরনের কিছু সমস্যার মধ্যে রয়েছেন। যা-ই হোক তাঁর সাথে পরামর্শ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, আমি নিজের অন্তরের সব কথা মাওলানা মাওদুদী সাহেবের কাছে লেখব। অতঃপর আমি তা-ই করলাম। সে সময়ে জামায়াতের রুকনদের মধ্যে মাওলানা মোহাম্মদ জাফর সাহেব ফুলওয়ারীর অবস্থান সেখানে ছিল। মাওলানা মাওদুদী সাহেবের নিকট পত্র লেখার সময়ে অথবা তার পরে, মাওলানা জাফর সাহেবের কাছে নিজের মতামত প্রকাশ করা এবং তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করা সমীচীন মনে করি, হয়ত অন্য কোন পন্থা বেরিয়ে আসবে। এই মনোভাব নিয়ে মাওলানা জাফরের সাথে আলোচনা করে অবগত হতে পারি যে, তিনিও অত্যন্ত আস্থাহীন ও নিরাশ হয়ে পড়েছেন। তিনিও মত প্রকাশ করলেন যে, মাওলানা মাওদুদী সাহেবকে সব কথা স্পষ্টভাবে লিখে দেয়া উচিত। বরং তিনি পীড়াপীড়ি করে বললেন, এ চিঠিতে আমি নিজেও কিছু লিখব।

আমার যতটুকু স্মরণ আছে যে, কয়েক দিন ব্যয় করেই সে চিঠি সম্পূর্ণ করেছিলাম। অতঃপর মাওলানা জাফর সাহেবও উক্ত চিঠিতে নিজের পক্ষ থেকে একটি লাইন লিখে দেন। যার মর্ম সম্ভবতঃ এই ছিল যে, "আমারও এই একই প্রকারের ধ্যান-ধারণা"। পরিশেষে এই চিঠি অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ও দুঃখের সাথে মাওলানা মাওদুদী সাহেবকে প্রদান করি।

এখন যতটুকু মনে পড়ে, সম্ভবত সে চিঠিখানা এশার নামাযের পর আমি তাঁকে প্রদান করেছিলাম। চিঠিখানা ছিল অতি দীর্ঘ। (যতদূর স্মরণ আছে, প্রায় দশ-বার পৃষ্ঠার চিঠি ছিল।) পরদিন ফজরের নামাযের পরেই মাওলানা মাওদুদী সাহেব আমাকে এর উত্তর এক বিস্তারিত পত্রাকারে প্রদান করেন। কিন্তু তাঁর উত্তরে আমার আসল সমস্যার সমাধান হয়নি এবং আমার অস্থিরতাও কমেনি। বরং এ পত্র দ্বারা আমি শুধুমাত্র এ ধারণাই নিতে পেরেছিলাম যে, মাওলানা মাওদুদী সাহেব একজন কলমের রাজা। তাই তিনি যা লিখতে চান, তা অত্যন্ত নিপুণ ও হৃদয়গ্রাহী করে লিখতে পারেন বৈকি। আর, এ বিষয়ে তো আমি প্রথম থেকেই স্বীকৃতি দিয়ে এসেছি।

১৬.পত্রের উত্তর না আসার কারণ স্বয়ং মাওলানা আমীন আহ্সান সাহেবের নিকট জানতে পেরেছিলাম যে ঠিক সে সময় কংগ্রেসের (কুইট ইন্ডিয়া)"ভারত ছাড়" আন্দোলনের কারণে পূর্ব ইউপি-তে রেলওয়ের নিয়ম-নীতি বিঘ্নিত হচ্ছিল। আজমগড়ের দিকে সম্ভবতঃ কয়েক সপ্তাহ ট্রেন চলতে পারেনি বিধায় আমার দেয়া পত্র কয়েক সপ্তাহ পরেই তাঁর হস্তগত হয়েছিল।

এরপর আমি পত্রালাপের সূত্রকে অব্যাহত রাখা অর্থহীন মনে করি। তাই একাকীভাবে সরাসরি স্বয়ং মাওলানার সাথে কথা বলি এবং তাঁকে বলি যে, আপনার উত্তর দ্বারা আমার অস্থিরতা ও পেরেশানী দূরীভূত হয়নি। আমি আমার সমস্যার কোন সমাধান এর দ্বারা খুঁজে পাইনি। আমার কাছে প্রকৃত ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল যে, আমি অনুভব করেছি যে, "আমীর" হওয়ার জন্য আমি নিজেই আপনার নাম পেশ করে এবং পরবর্তীতে নিজের লিখনীর মাধ্যমে আপনার সম্পর্কে বারংবার নিজের পূর্ণ আস্থা প্রকাশ পূর্বক আল্লাহর বান্দাদের সামনে এক প্রকার সাক্ষ্য প্রদান করেছি। এখন আমি বুঝতে পেরেছি, আমার সাক্ষ্য সঠিক নয়, বরং বাস্তবের পরিপন্থী ছিল। এমতাবস্থায় যদি আমি এভাবে জামায়াতের "রুকন" থেকে যাই, তবে নিজের কাজের মাধ্যমে যেন বারংবার অনুরূপ সাক্ষ্যের পুনরাবৃত্তিই করে যাচ্ছি, যা বাস্তবের পরিপন্থী হওয়ার ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। আর মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা সবচেয়ে বড় গুনাহ। আমি শুধু এই পাকড়াও হতে রক্ষা পেতে চাই। কিন্তু আমি এ পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারিনি। আল্লাহ্ তাআলা আপনাকেও দ্বীনের জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধি দান করেছেন এবং আপনার সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কও রয়েছে। তাই আমি সরলভাবে আবারও আপনার কাছে আরজ করছি যে, যদি আপনার নিকট এমন কোন বিকল্প ব্যবস্থা থাকে, যাতে নিয়মিতভাবে জামায়াতের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারি এবং মিথ্যা সাক্ষ্যের গুনাহ থেকেও রক্ষা পেতে পারি, তবে তা আপনি আমাকে সহজভাবে বলে দিন। আমার জামায়াতের সাথে এভাবে সম্পৃক্ত থাকার আন্তরিক বাসনা রয়েছে। শুধু এ নিশ্চয়তাই চাই যে, আল্লাহ্ তাআলার কাছে আমি পাকড়াও হবোনা।

মাওলানা মাওদুদী সাহেব আমাকে বেশ কিছু কথা বললেন, কিন্তু সে সব কথা আমার ব্যথ্যার ঔষধ ছিলনা। তিনি আমার এ সমস্যার কোন সমাধান দিতে অক্ষমই থেকে গেলেন। অবশ্য তাঁর গৃহের যে বিষয়টির জন্য সর্বাধিক বিরূপ প্রতিক্রিয়া আমার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল, (অর্থাৎ মেয়েদের অন্দরমহলে বাবুর্চির খানা পাকানো এবং তার কাছ থেকে মেয়েদের পর্দার ব্যবস্থা না হওয়া) সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা হয়েছিল। তিনি এর কিছু কারণও আমাকে বর্ণনা করেন। কিন্তু এ আলোচনা আমার সে অনুভূতিকে আরো পাকাপোক্ত করে দেয় যে, জামায়াতে ইসলামীর "রুকন" হওয়ার জন্য যতটুকু শরীয়তের পাবন্দী করা জরুরী বলে নির্ধারিত করা হয়েছে, মাওলানা মাওদুদী সাহেব নিজের বেলায় এ পর্যন্ত ততটুকু পালনেরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি।-১৭

---

১৭. এ আলোচনার কিছু বিস্তারিত বিবরণ নিজের রুচি ও স্বভাবের বিরুদ্ধে লেখাটা এখন প্রয়োজন মনে করছি। আমি মাওলানাকে আরজ করলাম যে, একথাটি তো বুঝে আসছে যে, খানা পাক করার জন্য বাবুর্চির প্রয়োজন, কিন্তু সে মেয়েদের বাবুর্চিখানায় পাক করবে এবং মেয়েরা তার কাছ থেকে পর্দা করবে না, এটার কি প্রয়োজন? সে তো ঘরের বাইরের অংশে বসেও পাক করতে পারে। কাজটা "ভাল নয়" বলে মাওলানা নিজেও স্বীকার করলেন, কিন্তু অসুবিধা প্রসঙ্গে বললেন, এরা সাধারণতঃ চোর হয়। (বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

বলতে কি, এ আলোচনার দ্বারা নৈরাশ্য ও অস্থিরতা আরো বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, সে সময় আমি নিজের সম্পর্কে সে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করি, যা সম্ভবতঃ আমি নিজের চিঠিতেও লিখেছিলাম। অর্থাৎ– বর্তমান সময়ে আমি "দারুল ইসলাম" থেকে চলে যাব এবং এখান থেকে চলে গিয়েই এ সমস্যার উপর আরো অধিক চিন্তা-ভাবনা করব আর পরার্মশের সাহায্যও গ্রহণ করব।

"দারুল ইসলাম" হতে স্বদেশভূমি চম্বলে

পরিশেষে, আমি তা-ই করলাম এবং সেখান হতে (দারুল ইসলাম হতে) স্বদেশভূমি চম্বলে চলে আসি। সম্ভবতঃ ৬১ হিজরীর শেষ তারিখেই এটা হয়েছিল। বেরেলীর পরিবর্তে আমাকে চম্বলে এ জন্যই আসতে হয়েছিল যে, বেরেলীতে যে ভাড়ার ঘরে আমি থাকতাম, তা আমি খালি করে দিয়েছিলাম এবং অন্য এক ভদ্রলোক তা ভাড়া করে নিয়েছিল। তদুপরি, "দারুল ইসলাম" চলে যাওয়ার প্রাক্কালে ঘরের সমস্ত জরুরী সামানও হাতছাড়া করেছিলাম। বিক্রিযোগ্য জিনিসগুলো বিক্রয় করে দিয়েছিলাম আর অন্যান্য জিনিষপত্র বন্ধু-বান্ধব ও গরীবদের মধ্যে বিলি-বন্টন করে দিয়েছিলাম। আমার স্ত্রীকে আমি নিজের স্বদেশভূমি চম্বলে আমার মাতা-পিতার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাকে বলেছিলাম, "দারুল ইসলামে" থাকার সব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে আমি এসে তোমাকে নিয়ে যাব। মৌঃ আতীকুর রহমানের বয়স তখন ১৪/১৫ বছর হয়েছিল। সে বেরেলীতে "মিসবাহুল উলূম মাদরাসায়" কাফিয়া, মিরকাত, ও 'আলমান্তিক' প্রভৃতি কিতাব পড়ছিল। আমি তাকে আমার সাথে "দারুল ইসলাম" নিয়ে গিয়েছিলাম, যাতে সেখানে সম্পূর্ণ খাঁটি দ্বীনি ও আন্দোলনের পরিবেশে সে লালিত-পালিত হয় এবং মাওলানা মাওদুদী সাহেব ও জামায়াতের অন্যসব বন্ধুদের নিকট হতে উপকৃত হতে পারে।

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর) তাই বাধ্য হয়ে ঘরের ভেতরে চোখের সামনেই পাক করাতে হয়। আমি আরজ করলাম যে, হয়ত চুরির সামান্য ক্ষতি স্বীকার করতে হবে, না হয় বর্তমান বাবুর্চির পরিবর্তে (সম্ভবতঃ এই বাবুর্চির নাম ছিল ইসমাইল) নজীর-এর দ্বারা কাজ নেয়া যেতে পারে। তার সম্পর্কে চুরি অথবা খেয়ানতের সন্দেহ হতে পারেনা। (এ নজীর সম্ভবতঃ কপুরতলা রাজ্যের বাসিন্দা ছিল। সে অশিক্ষিত কিম্বা অল্পশিক্ষিত যুবক ছিল এবং অত্যন্ত নেক্কার ও চরিত্রবান ছিল। জামায়াতের সাথে সম্পৃক্ত ছিল বিধায় "দারুল ইসলাম" এসে গিয়েছিল।) সে আমাদের খানা পাক করত। তাই এই নজীর সম্পর্কে মাওলানাকে আরজ করলাম যে, আপনি খানা পাক করার জন্য ইসমাইলের পরিবর্তে নজীরকে কর্মচারী হিসেবে রেখে দিন এবং ইসমাইল আমাদের খানা পাক করবে। উত্তরে তিনি বললেন, নজীর খানা পাক করতে জানেনা। তার দ্বারা কাজ চলবেনা। (ঘটনা হল এই যে, নজীর বেচারা উত্তমরূপে খানা পাক করতে জানত না।) মাওলানার সাথে এ আলোচনার দ্বারা আমার মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার ছিল, তাই হয়েছিল এবং এ আলোচনা-ই "উটের কোমরে সর্বশেষ ধুলিকণার" ন্যায় হয়ে যায়।

কিন্তু আমার ধারণা যে, "দারুল ইসলাম" থেকে আমার চলে আসার পর মাওলানা মাওদুদী সাহেব হয়ত "ভাল নয়" কাজটি সংশোধন করেন। (নোমানী)

সেখানে আমি নিজেই তাকে পাঠ্যসূচীর কিতাবগুলো পড়াবার ইচ্ছা করেছিলাম বিধায় যে সব কিতাব সে পড়ছিল, সেগুলোও সাথে নিয়েছিলাম। সম্ভবতঃ ভুলে মন্তেকের প্রসিদ্ধ কিতাব "শরহে তাহজীবুল মান্তেক" সাথে নেয়া হয়নি। "দারুল ইসলাম" পৌছে যখন আতিকুর রহমানের লেখা-পড়া শুরু করা হয়, তখন আমি মাওলানা মাওদুদী সাহেবকে প্রসঙ্গক্রমে বললাম যে, কেউ যদি লাহোর কিম্বা অমৃতসর যাওয়ার থাকে তবে আতিকুর রহমানের জন্য একটি "শরহে তাহ্জীব" আনতে হবে। তিনি বললেন, কিতাবটি তো আমার কাছেও থাকতে পারে। আমি এ কথা শুনে বিস্মিত হই। কেননা, আমি মনে করতাম যে, তিনি আমাদের মাদরাসাগুলোর নিয়ম-পদ্ধতিতে দরসে নেজামীর মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করেননি। যেখানে মান্তেকের কিতাবসমূহও পড়ানো হয়। যা হোক, তিনি নিজ ঘরে গিয়েই আমাকে "শরহে তাহ্জীব" এনে দেন। আমি জিজ্ঞেস করি, আপনি কি "শরহে তাহ্জীব"-ও পড়েছিলেন? তিনি বললেন, আমার কাহিনী হল এই যে, আমার শ্রদ্ধেয় পিতা হায়দ্রাবাদ রাজ্যে ওকালতি করতেন। শেষ জীবনে তিনি দ্বীনদারী ও আখেরাতের চিন্তায় বিভোর হয়ে পড়েন। আমি ছিলাম তাঁর কনিষ্ঠ সন্তান। তিনি আমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, আমাকে দ্বীনি শিক্ষা প্রদান করবেন। সেজন্য তিনি জনৈক মৌলভী সাহেবকে বেতন দিয়ে নিযুক্ত করেন। তিনি আমাকে ঘরেই পড়াচ্ছিলেন। নাহু-সরফ ও মান্তেকের প্রাথমিক কিতাবগুলো আমি পড়ে নিয়েছিলাম। "শরহে তাহ্জীব" -ও পড়েছিলাম। ইতিমধ্যে আমার পিতা ইন্তেকাল করেন। ফলে আমার শিক্ষা লাভ করা অব্যাহত থাকেনি। এ প্রসঙ্গে মাওলানা মাওদুদী সাহেব এ-ও বলেন যে, পরে যখন দিল্লীতে আমি অবস্থান করছিলাম (সম্ভবতঃ সময়টা "আল্‌জমিয়াত" পত্রিকার সম্পাদনার কালই হবে) তখন মাওলানা এশফাকুর রহমান সাহেব কান্দলভী দিল্লীর ফতেহপুরী মাদরাসায় তিরমিজী শরীফ পড়াতেন। আমি তাঁর তিরমিজী শরীফের সবকে অংশগ্রহণ করতাম।-১৮

"দারুল ইসলামে" কিছুকাল অবস্থান কালে মওলবী আতিকুর রহমানের শিক্ষা প্রসঙ্গে স্বয়ং মাওলানা মাওদুদী সাহেবের প্রাথমিক শিক্ষার প্রসঙ্গটিও আলোচনায় এসে গিয়েছে। অবশ্য আমি আরজ করছিলাম যে, আমি মাওলানা মাওদুদী সাহেবের সর্বশেষ আলোচনার পর "দারুল ইসলাম" হতে চম্বল চলে আসি, যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই ঘটনায় আমি এত বড় দুঃখ ও ব্যথা পাই যে, হয়ত ইতিপুর্বে আমার জীবনে এত বিরাট কোন ব্যথা পাইনি।

১৮. মাওলানা মাওদুদী সাহেবের জীবনী বা স্মৃতিকথা লিখকদের মধ্যে কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি দিল্লীতে আরো কোন কোন আলেমের নিকট শিক্ষা লাভ করেছেন। তাদের এ মতামতও সত্য হতে পারে।

নতুন পরিস্থিতিতে কঠিন দুঃখ ও ব্যথা

এহেন দুঃখ ও ব্যথার সবচেয়ে বড় কারণ তো ছিল এই যে, জামায়াতে ইসলামীতে অংশগ্রহণ, অতঃপর "দারুল ইসলামে" হিজরত করাটা সে সময় আমার বিশেষ অবস্থাতে আমার জীবনের এক বিরাট সিদ্ধান্ত ছিল। যে সম্পর্কে আমার নিশ্চিত ধারণা ছিল যে, আল্লাহ তাআলার রেজামন্দী লাভ করার আশায় এ পদক্ষেপ নিয়েছি। হয়ত এ কাজটি আমার নাজাতের উপায় হবে। কিন্তু বর্তমানে আমি এমন বেকায়াদায় পড়ে যাই যে, হয়ত "জামায়াতে ইসলামীর" সাথে নিয়মিত থেকে মিথ্যা সাক্ষ্য দানের অপরাধে অপরাধী হব এবং আমার কাজের মাধ্যমে বারংবার সাক্ষ্যের প্রমাণ দিয়ে যাব, না হয় "জামায়াতের" সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো, যা সে সময় আমার জন্য অত্যন্ত কঠিন ও স্বাভাবিকভাবে অতি বেদনাদায়ক সিদ্ধান্ত ছিল। এই দুঃখ ও ব্যথার দ্বিতীয় কারণ ছিল এই যে, মাওলানা মাওদুদীর সাথে আমার ব্যক্তিগত গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। আমি দ্বিধাহীন চিত্তে বলছি যে, এ সম্পর্ক এক প্রকার স্বাভাবিক মুহাব্বতের আকার ধারণ করেছিল। অর্থাৎ, এক পথেরই সাথী ও পথ- প্রদর্শক হওয়া ছাড়াও তিনি ছিলেন আমার এক প্রিয় বন্ধু। আমাদের মধ্যে এ রকম কিছু হওয়াটাই ছিল আমার জন্য এক বিরাট দুর্ঘটনা।

সে যা-ই হোক, উপরোক্ত দু'টি কারণেই এই ঘটনাটি আমার জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক হয়েছে। অধিকন্তু, নশ্বর জগতের কার্যকারণের প্রভাবে সম্ভবতঃ এ ব্যথার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মাত্র দু'চার দিন পরেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমার অসুখ বেড়ে যাচ্ছিল এবং দু'দিন এভাবে অতিবাহিত হয়েছিল যে, আমার জীবনের আশাই কেউ করতে পারছিল না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাকে পুনরায় জীবন দান করেছেন।

সম্ভবতঃ রমজানের পর পত্র মারফত মাওলানা মাওদুদী সাহেব আমাকে জানিয়েছিলেন যে, এ নতুন পরিস্থিতির কারণে তাৎক্ষণিকভাবে জামায়াতের মজলিসে শুরার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়া জরুরী এবং তাতে আপনার অংশগ্রহণও জরুরী। আমি জরুরী ভিত্তিতে পত্রের মাধ্যমে জানিয়ে দিই যে, আমি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছি বিধায় বর্তমানে সফর করার শক্তি আমার নেই। তিনি আমাকে লিখেন যে, তা হলে পুরো মজলিসে-শুরা চম্বলে আসতে পারে এবং সেখানেই শুরার অধিবেশন বসবে। সম্ভবতঃ উত্তরে আমি লিখেছিলাম, আমার কারণে শুরার সব সদস্যকে কষ্ট দেয়া আমি উচিত মনে করিনা। সুতরাং, আপনি যেখানে ভাল মনে করেন, সেখানে মজলিসে শুরার অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন। সে সময় যদি আমি সফর করার উপযুক্ত হই, তবে ইন্‌শাআল্লাহ নিশ্চয় সেখানে পৌছে যাবো।

অতঃপর দিল্লীতে মজলিসে শুরার অধিবেশন আহ্বান করা হয়। আমি সে সময় রোগমুক্ত হই বটে, তবুও দুর্বলতা এত বেশী ছিল যে, চম্বল থেকে দিল্লী পর্যন্ত পুরো সফরটাই আমি শায়িত অবস্থায় করেছিলাম। দিল্লীতে যখন আমার ট্রেন পৌছে যায়, তখন কতিপয় বন্ধু-বান্ধব আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রাণ-

প্রিয় বন্ধু শরকী সাহেবও ছিলেন। তিনিই আমাকে ট্রেন হতে নামিয়ে বিশ্রামাগার পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন। শরকী সাহেব জামায়াতের রুকনদের মধ্যে আমার বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন এবং মাওলানা মাওদুদীরও বিশেষ ভক্ত ও একনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর আলাপ-আলোচনা হতে আমি অনুভব করতে পারি যে, তাঁর নিজস্ব ধারণা হল এবং মাওলানা মাওদুদী সাহেবও তাঁর কাছে একই ধারণা ব্যক্ত করেছেন যে, প্রকৃত পক্ষে "দারুল ইসলাম" -এ অবস্থানরত কোন কোন সাথী কমরুদ্দীন সাহেব প্রমুখ আমার কান ভারী করার প্রয়াস পেয়েছেন এবং তাঁরাই আমার ও মাওলানা মাওদুদী সাহেবের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। আর আমি তাঁদের এই চক্রান্তের শিকার হয়ে পড়েছি।[১৯]

আমি তাঁকে বললাম, এটা একেবারেই অসত্য। আমার যেসব ধারণা ও অনুভূতি রয়েছে, সেগুলো স্বয়ং আমার অন্তরেই সৃষ্টি হয়েছে এবং শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলাই অবগত আছেন যে, এহেন পরিস্থিতিতে আমি কত দুঃখ ও ব্যথা পেয়েছি। শরকী সাহেব আমাকে মাওলানা মাওদুদী সাহেবের এ পয়গাম পৌছে দেন যে, তিনি চিন্তা-ভাবনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, জামায়াতে বর্তমানে একক নেতৃত্বের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করা হবে। পুরো জামায়াতের কোন একক আমীর থাকবেনা; বরং যে সব লোক আমাদের দাওয়াতের সাথে ঐকমত্য পোষণ করবে, তাঁরা নিজেদের সুবিধা মত বিশ্বাসের ভিত্তিতে ইউনিট কায়েম করবে এবং প্রত্যেক ইউনিট নিজেদের মধ্যে যাকে ভাল মনে করে, আমীর করে নিবে। আর যে কাজকে হক মনে করবে, আল্লাহর নামে তা করবে। আমি বললাম, এতোদিন পর্যন্ত আমি অসুস্থ ছিলাম বিধায় নিজের সম্পর্কে আমি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারিনি। "দারুল ইসলাম" থেকে বিদায় নেয়ার সময় আমি যেখানে ছিলাম, এখন সেখানেই রয়ে গিয়েছি। কিন্তু মাওলানা মাওদুদী সাহেবের যদি এ রায় হয় এবং জামায়াতও যদি ভাল মনে করে, তবে এ রকম করা যাবে।

এই আলোচনাটি আমার এবং শরকী সাহেবের মধ্যে একাকী সম্পন্ন হয়েছিল। সম্ভবতঃ ষ্টেশন থেকে নির্ধারিত বিশ্রামাগারে যাওয়ার পথে। তারপর নিয়মিত মজলিসে শুরার অধিবেশন শুরু হয়। আমার অধিক দুর্বলতার কারণে আমি আরজ করেছিলাম যে, বিশেষভাবে আমার উপস্থিতির প্রয়োজন দেখা দিলেই আমাকে ডেকে নেবেন। সে রকমই করা হল। আমার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াবলী যখন আলোচনায় এসেছিল, তখন মজলিসে শুরার অধিবেশনে আমাকে ডাকা হয়। মাওলানা মাওদুদী সাহেব ও আমি মজলিসের অধিবেশনে শরীক হই। এখন যতদুর মনে পড়ে,

---

১৯. দারুল ইসলামে অবস্থানরত সাথীদের মধ্যে মিস্ত্রী সাহেব ও মাওলানা জাফর সাহেব সম্পর্কে তো পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারাও আস্থাহীন ও নিরুৎসাহী হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা ছাড়াও অন্যান্য সাথীরা যারা অবস্থান করছিলেন তাদের অধিকাংশের অবস্থাও একই রকম ছিল। তাদের মধ্যে একজন বেনারসের কমরুদ্দীন সাহেবও (এম-এ) ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ জামায়াতের সেক্রেটারী বা নাজেম ছিলেন।

প্রথমে মাওলানা মাওদুদী সাহেব এ বিষয়টি প্রকাশ করলেন যে বর্তমান নেতৃত্বের প্রতি কোন কোন রুকনের পূর্ণ আস্থা নেই। অতঃপর তিনি নিজের পক্ষ থেকে কতিপয় প্রস্তাব পেশ করলেন। তন্মধ্যে সম্ভবতঃ একটি প্রস্তাব ছিল, যদি মজলিস অনুমোদন করে, তবে তিনি পদত্যাগ করবেন এবং তাঁর পরিবর্তে অন্য একজন আমীর মনোনীত করা হবে। দ্বিতীয় প্রস্তাব মনে হয় এ রকম ছিল যে, আমীরের পরিবর্তে দু' চার জন রুকনের সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠন করা এবং তৃতীয় প্রস্তাবটি শরকী সাহেব পূর্বেই যেটা সম্পর্কে আমার সাথে আলোচনা করেছিলেন, আর আমাকে বলেছিলেন যে, মাওদুদী সাহেব এ রকম করতে ইচ্ছুক এবং তাঁর মতে বর্তমান পরিস্থিতির এটাই হবে সর্বোত্তম সমাধান।

মাওলানা মাওদুদী সাহেব এসব প্রস্তাব মজলিসের সামনে পেশ করেন। কিন্তু, এমনভাবে পেশ করেন যে, অন্যান্যদের অন্তর সম্পর্কে তো আমার জানা নেই, তবে অন্ততঃ তাঁর ভাব-ভঙ্গিতে আমি পরিষ্কারভাবে অনুভব করতে পারি যে, তিনি প্রতিটি প্রস্তাব পেশ করার সময় মজলিসের রুকন বা সদস্যদের মানসিকভাবে তৈরী করে নিচ্ছিলেন, তারা যেন এ সব প্রস্তাবের প্রত্যেকটিকে জামায়াত এবং জামায়াতের মহৎ ও পবিত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের জন্য ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক মনে করেন এবং নিশ্চিতরূপে এগুলো প্রত্যাখান করে বসেন।

স্বয়ং আমার অবস্থা এই ছিল যে, যেহেতু আমি তখনও নিজের সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারিনি, তাই উক্ত অধিবেশনে আমি নীরব থাকাই স্থির করেছিলাম। বাস্তবে আমি নীরবই ছিলাম। অবশ্য যখন অপর কাউকে 'আমীর' মনোনীত করার প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয় এবং আমাকে উক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য বলা হয়, তখন আমি আরজ করি যে, এখন থেকে অনেক পূর্বে এমন কি জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠারও বহু পূর্বে নিজেকে যাচাই ও পরিমাপ করে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, এ ধরনের কোন "জামায়াত" বা দলের আমীর হওয়ার যোগ্য আমি নই। মনে পড়ে, অধিবেশন সমাপ্ত হওয়ার পরও এ সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে আমার সাথে আলোচনা করা হয়েছিল। এমনকি, কোন কোন বন্ধু এ ব্যাপারে জোর দিতে থাকেন। তখন আমি আমার অপরাগতার কথা পুনরাবৃত্তি করি, আর নিজের সম্পর্কে অধিবেশনে যা বলেছিলাম, পুনরায় তা বলি। তখন তারা বললেন, আপনার এ কথাটি আমদের কোনমতেই বুঝে আসছে না যে, আপনি আমীর হওয়ার যোগ্য নন। আমি তাদের কাছে আরজ করলাম, এ হাদীছটি সম্পর্কে সম্ভবতঃ আপনারা অবগত আছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আবু জর গেফারী (রাঃ)-কে বললেন, "হে আবু জর, তোমার মধ্যে আমি এক বিশেষ দুর্বলতা প্রত্যক্ষ করছি। সুতরাং আমি তাগিদ করছি যে, দু'ব্যক্তির উপরও যেন তোমাকে শাসক নিযুক্ত করা না হয়।" এ হাদীছটি দ্বারা রসূলূল্লাহ (সঃ) হযরত আবু জর গেফারী (রাঃ)-এর শারিরীক দুর্বলতা সম্পর্কে কিছু বলেননি; বরং কোন বিশেষ যোগ্যতার অভাবই উদ্দেশ্য ছিল।

বাস্তব কথা হলো, আমি নিজেকে বারংবার যাচাই ও পরিমাপ করার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, আমার মধ্যে এত বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করার মত প্রয়োজনীয় কোন যোগ্যতার অভাব রয়েছে। সুতরাং আমি নিজের সম্পর্কে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, "আমীর হওয়ার যোগ্য আমি নই।" উপরন্তু, আমার এ সিদ্ধান্তে আমি আল্লাহর নিকটও নির্দোষ বিবেচিত হব বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে।

যা হোক, "আমীর হওয়া" সম্পর্কিত বিশেষ আলোচনা ব্যতীত অধিবশনের পূর্ণ কার্যক্রমে আমি পর্যবেক্ষকরূপেই নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিলাম। তার কারণ, যা আমি পূর্বেই আরজ করেছি যে, নিজের সম্পর্কে তখন আমি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছিলাম না। এতদ্ব্যতীত আমার আশঙ্কা ছিল যে, যদি আলোচনা অব্যাহত থাকে, তবে কোন এক পর্যায়ে গিয়ে সে সব বিষয়ও প্রকাশ হয়ে পড়বে, যে সব বিষয়ের প্রকাশ কোন প্রকারেই আমি তখনও ভাল মনে করতাম না। এমন কি, স্বয়ং মাওলানা মাওদুদী সাহেবকে এ সম্পর্কে আমি যে পত্র দিয়েছিলাম, তাতেও আমি সে সব বিষয়ে স্পষ্টভাবে কিছু লিখিনি; বরং মনে পড়ে যে, "তাক্বওয়া সচেতনতার অভাব" -এর ন্যায় অস্পষ্ট শব্দাবলী লিখেছিলাম। যার লক্ষ্য ও তাৎপর্য স্বয়ং মাওলানা মাওদুদী সাহেব তো বুঝতে পারছিলেন এবং "দারুল ইসলামে" অবস্থানকারী সাথীরাও সম্ভবতঃ কিছু বুঝতে পারতেন। কিন্তু অন্য লোক তা কিছুতেই বুঝতে পারতেন না। (বরং আমি উক্ত পত্র সম্পর্কে তাকে বলেছিলাম, তিনি যেন বিষয়টি নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখে দেন।)

মোদ্দা কথা, জামায়াতের মজলিসে শুরার এ অধিবেশনে আমি শুধু শ্রোতা ও পর্যবেক্ষক হিসেবেই শরীক ছিলাম। কেননা, আমি তখন পর্যন্ত নিজের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছিলাম না। অবশ্য "দারুল ইসলামে" অবস্থানরত বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে মাওলানা কমরুদ্দীন সাহেব প্রমুখের ন্যায় কোন কোন "রুকন" (যারা মাওলানা মাওদুদী সাহেবের অবস্থা ও কার্যপদ্ধতির দ্বারা দলীয় কাজ সম্পর্কে নিজেদের নৈরাশ্য ও আস্থাহীনতাই প্রকাশ করেছিলেন) মাওলানা মাওদুদী সাহেবের পেশকৃত সর্বশেষ প্রস্তাবের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে বসেন এবং মজলিসে এ প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালান। কিন্তু মজলিসের অধিকাংশ সদস্য এ প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। বরং এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, জামায়াতের নিয়ম-নীতিতে কোন পরিবর্তন করা যাবে না। যারা নিজেদের আস্থাহীনতার কারণে এ নীতির সাথে থাকাটা পছন্দ না করেন, তারা ইচ্ছা করলে নিজেদের জামায়াতের নীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে কাজ করতে পারবেন।

এ সিদ্ধান্তের পরপরই মাওলানা কমরুদ্দীন সাহেব, মাওলানা জাফর সাহেব এবং সম্ভবতঃ তাঁদেরই মতাবম্বী দু'একজন "রুকন' জামায়াত হতে পৃথক হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন আর সেখানেই তা প্রকাশ করে দেন।

এ সমস্যার যখন এভাবেই সমাধান হয়ে যায়, তখন আমি নিজের শারীরিক দুর্বলতার কারণে মাওলানা মাওদুদী সাহেব এবং অন্যান্য বন্ধুদেরকে আরজ করলাম, এখন যদি আমার বিশেষ কোন প্রয়োজন না থাকে, তবে আমাকে চলে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হোক। অতঃপর তাঁরা আমাকে অনুমতি প্রদান করেন আর আমি চম্বল প্রত্যাবর্তন করি। অবশ্য ফেরার পথে আমি নিজের সম্পর্কে এই আরজ করি যে, আমি রমজানের পূর্বে "দারুল ইসলামে" অবস্থানকালে যেখানে ছিলাম এখনও সেখানে রয়েছি এবং এখনো নিজের সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারিনি। অবশ্য এতটুকু আমি এখনও আরজ করছি যে, আমার একান্ত আকাঙ্খা আমি এভাবেই "জামায়াতের" সাথে সম্পৃক্ত থাকবো। এ সম্পর্কে আমার জন্য যে বিশেষ সমস্যা এবং দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হয়েছে, যদি তার কোন সমাধান আমার বুঝে এসে যায়, তবে ইনশাআল্লাহ্ আমি সে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করবো আর তা জানিয়ে দেব।

যাই হোক, আমি তাঁদের অনুমতি নিয়ে চলে আসি এবং মজলিসের কার্যক্রম তারপরেও অব্যহত থাকে। কিছুদিন পর লখনৌ থেকে মাওলানা আলী মিয়ার পত্র হস্তগত হয়। তাতে তিনি অন্যান্য বিষয়াবলীর সাথে আমার নিকট এ বিষয়টি লিখেছিলেন যে, "আপনার চলে যাওয়ার পর মাওলানা মাওদুদী সাহেব তাঁর নিকট আপনার দেয়া পত্রখানি মজলিসে পাঠ করে শুনান। যদিও আমি নিজে জামায়াতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তবু আপনার পত্র শুনে আমার অন্তরে আপনার প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।-২০

মাওলানা আলী মিয়ার এ পত্রের মাধ্যমে আমার চলে আসার পরেই মাওলানা মাওদুদী সাহেব আমার পত্রখানা মজলিসে পেশ করেছেন মর্মে অবগত হয়ে আমার মনে অত্যন্ত আক্ষেপ ও দুঃখবোধ হয়। যদি তিনি পত্রখানা মজলিসে পেশ করার ইচ্ছাই পোষণ করেছিলেন, তবে আমার উপস্থিতিতেই পেশ করা তাঁর উচিত ছিল।

কিছুদিন পর যখন আমি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠি এবং স্বাস্থ্যও একটু ফিরে আসে, তখন আমি নিজের সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শ করার জন্য এমন সব ব্যক্তির নিকট স্বতন্ত্রভাবেই সফর করি, যাদেরকে আমি পরামর্শ গ্রহণের যোগ্য লোক মনে করতাম। তাঁদের সাথে পরামর্শ এবং আমার ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনার পর আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, এ মিথ্যা সাক্ষ্যের দায়িত্ব হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য জরুরী যে, নিজের অনাস্থার কথা প্রকাশপূর্বক জামায়াতের সাথে নিয়মতান্ত্রিক সম্পর্ক ছিন্ন করা। কিন্তু যে সব বিষয়ের কারণে আমি আস্থাহীন হয়ে পড়েছিলাম এবং যে সব কারণে

২০.এখানে এটাও বলে রাখা জরুরী যে, এর কিছুদিন পর মাওলানা আলী মিয়া নিজেকে জামায়াতে ইসলামী হতে পৃথক করে নিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পৃথক হয়ে যাওয়ার সাথে আমার বিষয়টির কোন সম্পর্ক ছিল না। বরং তার পৃথক হয়ে যাওয়া সম্পর্কেও আমি অনেক দিন পরেই অবগত হয়েছিলাম।

শেষ পর্যন্ত আমাকে জামায়াতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়েছিল, তখন সে সব বিষয় ও কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়ার প্রয়োজন আমি মনে করিনি। অতঃপর আমি জামায়াতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এবং আন্তরিক দুঃখের সাথে আমার এ সিদ্ধান্তের কথা এক পত্রের মাধ্যমে মাওলানা মাওদুদী সাহেবকে অবগত করি।-২১

এতদিন পর্যন্ত আমার ও মাওলানা মাওদুদী সাহেবের মধ্যে যে সব আলাপ-আলোচনা হয়েছে এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে যে সব পত্র বিনিময় হয়েছিল, তাতে সম্পূর্ণরূপে হৃদ্যতার পরিবেশ বহাল ছিল। কিন্তু এ পত্রের উত্তরে মাওলানা মাওদুদী সাহেব যে পত্র দেন, তার ভাষা এর সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। এর কারণ সম্ভবতঃ তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, বর্তমানে যখন আমি জামায়াতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তখন এ সব ব্যাপারে সাধারণতঃ দুনিয়াতে যে রকম হয়ে থাকে সে রকম সম্ভবতঃ আমার মনোভাব পরিবর্তন হয়ে যাবে, আর যে সব বিষয় প্রকাশ করা থেকে তখনও আমি বিরত ছিলাম, সে সব বিষয় জনসাধারণের নিকট প্রকাশের জন্য আমি তৈরী হয়ে যাব এবং তাঁর সম্পর্কে কত কিছুই না বলব ও লিখব।

যা হোক, আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি, এ কাল্পনিক বিপদ বন্ধ করার জন্য তিনি পত্রখানা এভাবেই লিখেছিলেন এবং এর মাধ্যমে তিনি আমাকে এ সতর্ক সংকেত দিয়েছিলেন যে, প্রয়োজন ও অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি কোন্ পর্যায়ে যেতে পারেন। এ পত্রের কারণে আমার কাছে আরো পরিষ্কার হয়ে যায় যে তাঁর মধ্যে খাঁটি দ্বীনদারীর কি পরিমাণ ক্রটি ও স্বল্পতা রয়েছে আর তাকওয়া ও আখেরাতের প্রতি এত আকর্ষণীয় দাওয়াত প্রদান সত্ত্বেও এসব গুণাবলীর আলোকে স্বয়ং তাঁর অবস্থা ও স্থান কি হতে পারে। যদি প্রয়োজন হয়, তবে তিনি সাধারণ দুনিয়াদার ও আল্লাহর ভয়ভীতিহীন নেতা ও সাংবাদিকের পর্যায়েও নেমে আসতে পারেন। কিন্তু আমি এটাকেও তাঁর একটি "দুঃখজনক দুর্বলতাই" মনে করি এবং নিজের জন্য যে নীতি অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, তার উপরই অটল থাকি। আর তাতে কোন প্রকার পরিবর্তনের প্রয়োজন মনে করছিলাম না। উপরন্তু, সে সময় আমার কোন কথা দ্বারা জামায়াতের মূল দাওয়াতে ক্ষতি সাধিত হোক এবং পরিবেশ উত্তপ্ত হোক, এজন্য আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। অতঃপর আমি নিজের অনাস্থা এবং জামায়াতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা সংক্রান্ত বিষয়ে "আল-ফুরকান" পত্রিকায় "আমার নিজের সম্পর্কে একটি ঘোষণা" শিরোনামে একটি সংক্ষিপ্ত নোট লিখেছিলাম। তার সাথে এ বিষয়টিও উল্লেখ করি যে, জামায়াতের মূল দাওয়াত ও উদ্দেশ্যের সাথে এখনও আমি ঐকমত্য পোষণ করি এবং তার সাথে আমার সহযোগিতাও বর্তমান থাকবে। "আলফুরকান"-এর সে নোটটি নিম্নে প্রদত্ত হল। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, এটিও একবার পাঠ করে নিন।

২১. এখানে এ বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য যে, দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মজলিসে শুরার কার্যবিবরণী স্বয়ং মাওলানা মাওদুদী সাহেব সংকলন করতঃ প্রকাশ করেছিলেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, তাতে তিনি এক বিশেষ রাজনৈতিক ধরনের সুবিধার্থে ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত এটাই প্রকাশ করেছিলেন যে, আমিও নাকি কমরুদ্দীন সাহেব প্রমুখের ন্যায় উক্ত মজলিসে-শুরাতেই জামায়াতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি। অথচ প্রকৃত ঘটনা সে রকমই ছিল যা আমি উপরে উপস্থাপন করেছি।

"নিজের সম্পর্কে একটি ঘোষণা"

আমার বন্ধু-বান্ধবরা অবগত আছেন যে, আজ হতে প্রায় পৌণে দু'বছর পূর্বে সৈয়দ আবুল-আলা মাওদুদী সাহেবের নেতৃত্বে ও পরিচালনায় যে একটি "জামায়াত" প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আমিও (আল-ফুরকান-এর সম্পাদক) তাতে শরীক ছিলাম। এ "জামায়াত" ও "দাওয়াতের" পরিচয় এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লষণের ক্ষেত্রে "আল ফুরকানে"– ও যথেষ্ট লেখা হয়েছিল। অতঃপর আমি "জামায়াতের" বর্তমান কেন্দ্র ও ঠিকানায় (দারুল ইসলাম বস্তি) চলে গিয়েছিলাম। আমার ধ্যান-ধারণা ও সংকল্প এর চেয়ে আরো উর্ধে ছিল। এ সম্পর্কে কোন কোন বিশিষ্ট বন্ধুরা অবগতও আছেন। কিন্তু কারো বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ নয়, বরং নিজেরই ভাগ্য বিড়ম্বনার অভিযোগ যে, এ পর্যায়ে এমন কিছু অপ্রত্যাশিত ব্যাপার প্রকাশ পায়, যার ফলে আমি যে আস্থা, আশা ও যে অনুপ্রেরণা নিয়ে উক্ত সংগঠনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলাম আর নিজের সম্পর্কে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম, তাতে পরিবর্তন সাধিত হয় এবং আমার নিজের ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা করা আবশ্যক বলে আমার অনুভুত হয়। অতঃপর আমার জানা মতে, সম্ভাব্য সর্বপ্রকার চিন্তা-ভাবনা করার পর এ জামায়াতের নীতি হতে নিজকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়া প্রয়োজন মনে করি। অবশেষে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নিজকে বিচ্ছিন্ন করেই ফেলি। আমার এই বিচ্ছিন্ন হওয়াটা মৌলিক মতবিরোধের কারণে নয়। এতে কারো কোন প্রকার ভূল বুঝাবুঝির অবকাশ নেই। বরং প্রকৃতপক্ষে কিছু ব্যক্তিগত পর্যায়ের বিষয়ই এর কারণ হয়েছে। যে সব বিষয় বর্তমান থাকা অবস্থায় তার সাথে আমার সম্পৃক্ত থাকাটা সঠিক মনে করিনি এবং এগুলোর সংশোধনের কোন সন্তোষজনক সমাধানও আমি খুঁজে পাইনি। উপরন্তু, আমার এ সম্পর্ক ছিন্ন করাটা এ "জামায়াতের" সাংগঠনিক নিয়মনীতির সাথে। অর্থাৎ এখন আমি তার "নিয়মিত রুকন" নই। কিন্তু এর মৌলিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও মূল "দাওয়াতকে" আমি পূর্বের ন্যায় সঠিক মনে করি। তাই যদিও জামায়াতের সাথে নিয়মিত অংশগ্রহণ ও দায়িত্ব থেকে আমি অব্যাহতি নিয়েছি, তবুও এর আসল উদ্দেশ্যর সাথে আমার সম্পর্ক আগের মতই থাকবে এবং আল্লাহ পাকের নিকট এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রচেষ্টার তাওফীক প্রার্থনা করছি। যদি নিয়মিত সম্পর্ক ব্যতিরেকেও আমি এ উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে কোন সাহায্য করতে পারি, তবে ইন্‌শাআল্লাহ, এখনও সম্ভাব্য সর্বপ্রকার "দ্বীনি পরামর্শ" এবং "ভালো কাজের সহযোগিতার" কোন ত্রুটি হবেনা।

এ ক'টি লাইন লেখার বিশেষ উদ্দেশ্য হল এই যে, নিজের সম্পর্ক ছিন্ন করা সম্পর্কে তাঁদেরকে অবহিত করা যারা আমার নিয়মিত সম্পর্ক এবং সক্রিয় তৎপরতা সম্পর্কে তো ওয়াকেফহাল আছেন অথচ আমার নতুন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবগত নন। তাই তাঁরা আমাকে এ জামায়াতের দায়িত্বশীল খাদেম ও নিয়মিত সদস্য মনে করেই আচরণ করে থাকেন। অথচ আমি নিজের এ পরিচয় ও পদ-মর্যাদার ইতি টেনেছি এবং এ পর্যায়ের সর্বপ্রকার দায়িত্ব হতে অব্যাহতি নিয়েছি। যা হোক, এ ঘোষণার আসল উদ্দেশ্য হল এতটুকুই। তাই আমি সে সব বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা এবং সেগুলোর প্রতি ইশারা ইঙ্গিত করারও প্রয়োজন মনে করিনি, যে সব বিষয় আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কারণ হয়েছে।

সাধারণ ধারণা মতে এ পর্যায়ের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশের বেলায় যে সব দাবী, অনুপ্রেরণা ও কারণ আমার জন্য হতে পারে, সেগুলোর মধ্যে কোন কোনটি নিশ্চয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণও বটে। সম্ভবতঃ প্রায় সবই আমার সামনে রয়েছে। কিন্তু, এতসব কিছুর পরও আমার সিদ্ধান্ত এখনও এই যে, নিজের ব্যক্তিগত কল্যাণ ও সুবিধা নয়; বরং দ্বীনের কল্যাণ ও সুবিধা হল, এতদ-সংক্রান্ত বিষয়াবলীর বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ না করার মধ্যেই। সুতরাং আমার আরজ, কোন বন্ধু-বান্ধব এর চেয়ে অধিক অবগত হওয়ার আশায় ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে কোন পত্র লিখবেন না।"

(আল-ফুরকান : রবিউল আউয়াল, রবিউচ্ছানী-১৩৬২ হিঃ সংখ্যা)

এ পর্যন্ত পাঠকবৃন্দ যা পাঠ করেছেন, তা মাওলানা মাওদুদী সাহেবের সাথে আমার সম্পর্ক ঃ অতঃপর ১৯৪১ ইংরেজীতে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং কিছুদিন পর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জামায়াতে ইসলামীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার বিবরণ ও ইতিবৃত্ত ছিল। বাহ্যতঃ এক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে নিজের সম্পর্কে আমি যে সব সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি, সেগুলোর বহু সংখ্যককে জামায়াতে ইসলামীর বিরোধীরা আমার বিরাট ভুল বলে মনে করবে এবং জামায়াতে ইসলামীর লোকদের নিকট সেগুলো ঈমান ও ইসলামের যথাযথ দাবী বলে মনে হবে। আর কিছু কিছু সিদ্ধান্ত ও ভূমিকা সম্পর্কে উভয় শ্রেণীর লোকের রায় হবে সম্পূর্ণরূপে এর বিপরীত। কিন্তু বাস্তবে আমি ভুল করেছি বা সঠিক করেছি, যাই হোক না কেন আমার জীবনের সে বছরগুলোর বৃত্তান্ত ও ইতিবৃত্ত এটাই। আমি নিজেই স্বীকার করছি যে, এক্ষেত্রে আমার বিরাট বিরাট ভুল হয়েছে। কিন্তু আমি নিজেই প্রভু পরওয়ারদেগারের নিকট পূর্ণ আশা রাখি, তিনি এসব ভূলের জন্য আমাকে পাকড়াও করবেন না।

জামায়াতে ইসলামীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরে

মাওলানা মাওদুদী সাহেব ও জামায়াতে ইসলামীর সাথে আমার সম্পর্ক স্থাপন ও সম্পর্ক ছিন্ন করার যে ইতিবৃত্ত উল্লেখিত হয়েছে, তার মাধ্যমে সচেতন পাঠক সমাজ হয়ত জানতে পেরেছেন যে, আমার সম্পর্ক ছিন্ন করার শেষ সিদ্ধান্ত পর্যন্ত মাওলানা মাওদুদী সাহেবের মধ্যে এমন কোন বিষয় পরিলক্ষিত হয়নি, যে সব বিষয়কে আমি মুসলিম জাতির জন্য ফিৎনা ও ভ্রান্তি বা গোমরাহীর কারণ বলে মনে করতাম। তবে সে সব 'আমলী' দুর্বলতা আমার সম্মুখে ভেসে উঠতো যেগুলোর সাথে তাঁর মত মহান মর্যাদা সম্পন্ন পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। কারণ, তাঁকে আমি ইসলামী পূনর্জাগরণ ও ইসলামী বিপ্লবের দাওয়াতের ঝান্ডাবাহী "জামায়াতে ইসলামীর"

আমীর ও প্রধান মুরশিদ এবং আমার একজন প্রিয় বন্ধু হিসেবে দেখতে পাওয়ার বাসনা পোষণ করতাম। কিন্তু আপনাদের যেমন জানা হয়েছে যে, এ সব 'আমলী' দুর্বলতা জামায়াতে ইসলামীর সাথে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার প্রধান ও একমাত্র কারণ নয়। আমি নিজেও তখন এ সব 'আমলী' দুর্বলতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র ছিলাম না। আর না বর্তমানেও তার থেকে মাহফুজ আছি। বরং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বহু গুনাহে তখনও ছিলাম কলুষিত, এখনও আছি। যদি আমার জন্য 'শাহাদাত' বা সাক্ষ্য প্রদানের সে সমস্যা সৃষ্টি না হতো যা পূর্ববর্তী আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে তা হলে আমি শুধু এ সব 'আমলী' দুর্বলতার কারণে জামায়াতে ইসলামীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম না। কেননা, জামায়াতের মূল লক্ষ্য ও দাওয়াতকেই আমি সে সময়ের জন্য বুনিয়াদীভাবে ইসলামী পূনর্জাগরণ ও ইসলামী আন্দোলনেরই দাওয়াত বলে মনে করতাম এবং মাওলানা মাওদুদী সাহেবের চিন্তাধারা ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে আমার যে অসাধারণ সুধারণা ছিল, তখন পর্যন্ত তাতেও কোন ধরনের সংশয় সৃষ্টি হয়নি।

জামায়াতে ইসলামীর সাথে নিয়মতান্ত্রিক সম্পর্ক ছিন্ন করার পরও অনেক দিন পর্যন্ত আমার অন্তর ও কাজ-কর্মে জামায়াতের প্রতি শুভ কামনা ও সমবেদনামূলক আচরণ বিদ্যমান ছিল। আর জামায়াতে ইসলামীর অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্পর্কও আমার সাথে একনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। তাই এ পর্যায়ে দু'একটা ঘটনা উল্লেখ করা সমীচীন বলে মনে করি।

জামায়াতে ইসলামীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হবার অন্ততঃ দেড় বছর পরের ঘটনা। তখন একবার আমি দিল্লী গিয়েছিলাম। সেখানে শাহী জামে মসজিদে জোহর অথবা আসরের নামায আদায় করি। ঘটনাক্রমে সেখানে জামায়াতে ইসলামীর কয়েকজন বিশিষ্ট 'রুকন' পর্যায়ের সদস্যদের সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তারা প্রায় সকলেই আমার বন্ধু পর্যায়ের লোক ছিলেন। তাদের মধ্যে ভাই আব্দুল আজীজ শরকী সাহেবও ছিলেন। তাঁর আলোচনা পূর্বেও একবার করা হয়েছে। আমি তাঁদের মাধ্যমে জানতে পারি যে, তখন দিল্লীতে জামায়াতে ইসলামী অথবা মজলিসে শুরার এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শরকী সাহেব এবং তাঁর সাথের অন্যান্য বন্ধুরাও আমাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, আমিও যেন তাঁদের সাথে সভাস্থলে গমন করি। যেহেতু, জামায়াতে ইসলামীর সাথে আমার নিয়মতান্ত্রিক সম্পর্ক ছিলনা, সে কারণে সেখানে গমন করা আমার জন্য লৌকিকতা প্রদর্শন ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। সুতরাং আমি বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে অপরাগতা প্রকাশ করলাম। কিন্তু শরকী সাহেব নাছোড় বান্দা। তিনি আমাকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, "আপনাকে যেতেই হবে।" অতঃপর তাঁদের অনুরোধ রক্ষার্থে সভাস্থলে অথবা বিশ্রামাগারে গিয়ে পৌছি। মাওলানা মাওদুদী সাহেব এবং অন্যান্যদের সাথে আমার দেখা হলে তারা সবাই অত্যন্ত সৌজন্যতা ও আনন্দ প্রকাশ করলেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন আমাকে পীড়াপীড়িও করলেন, যাতে আমি জামায়াতে ইসলামীতে প্রত্যাবর্তন করি। যতদূর মনে পড়ে, নসরুল্লাহ খাঁ আজীজ

সাহেবই সবচেয়ে বেশী পীড়াপীড়ি করেছিলেন। আমার মতে, তাঁরা সবাই এতে নিঃসন্দেহে একনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁরা আন্তরিকভাবে আমাকে একথা বলেছিলেন। তাঁরা কেউ জানতেন না যে, আমি কি কারণে "জামায়াত" থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছিলাম। যাক, আমি অত্যন্ত সংগত পদ্ধতিতেই অক্ষমতা ও অপরাগতা প্রকাশ করি।

এ পর্যায়ে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো এই যে, বিহারে কোন একস্থানে (যতদূর মনে পড়ে পাটনা অথবা দরভাঙ্গা) জামায়াতে ইসলামীর এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন ছিল। মাওলানা মাওদুদী সাহেব এবং জামায়াতের অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের যে ট্রেনে সফর করতে হয়েছিল সেটা বেরেলী হয়েই চলতো। জামায়াতের কেন্দ্রস্থল "দারুল ইসলাম" থেকে এক ব্যক্তি আমাকে সংবাদ দেয় যে, "আমাদের ট্রেন অমুক দিন অমুক সময় বেরেলী স্টেশনে পৌছবে।" তাঁর উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আমি যেন স্টেশনে তাঁদের সাথে দেখা করি। অতঃপর আমি নির্দিষ্ট সময়ে স্টেশনে যাই। তৃতীয় শ্রেণীর পূর্ণ একটি বগীতে জামায়াতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরাই ছিলেন। মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, মাওলানা মসউদ আলম মরহুম, মালেক নসরুল্লাহ খাঁ আজীজ (র ঃ) এবং আরও অনেকে। মাওলানা মাওদুদী সাহেবের স্বাস্থ্য একটু খারাপ ছিল। তাই তিনি একা দ্বিতীয় শ্রেণীর বগীতে ছিলেন। সবার সাথে আমার মোলাকাত হলো। তাঁদের মধ্যে দু'একজন আমাকে পীড়াপীড়ি করে বললেন, স্টেশনের এ মোলাকাত যথেষ্ট নয়, বরং আপনাকে আমাদের সাথেই যেতে হবে। অতঃপর আমি শাহজাহানপুরের টিকেট নিয়ে তাঁদের সাথে বসে পড়লাম।

কিছুক্ষণ পর মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত হয়। সবাই পীড়াপীড়ি করলেন যাতে আমিই নামায পড়াই। আমি বহু কারণ দর্শালাম এবং বার বার বললাম যে, আপনাদের মধ্য থেকেই কেউ নামায পড়ালে ভাল হয়। কিন্তু তাঁরা সবাই আমাকে বাধ্য করলেন এবং আমাকেই ইমাম বানিয়ে নামায পড়লেন।

উল্লেখিত ঘটনাবলীর দ্বারা একথা অনুমান করা যায় যে, জামায়াতের সাথে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পরও জামায়াতের প্রভাবশালী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং আমার মধ্যকার সম্পর্ক কোন্ ধরনের ছিল। আমার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পরও অনেকদিন পর্যন্ত আমার অবস্থা এই ছিল যে, যদি কোন ব্যক্তি জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে কোন কথা বলতো এবং তার সাথে আলোচনা করা আমি অপ্রয়োজনীয় মনে না করতাম, তখন জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ হয়ে আমি তার প্রতিবাদ করতাম এবং তার অভিযোগের জবাব প্রদান করতাম। সে সময় আমার কোন কোন সম্মানিত বুযুর্গ ব্যক্তির পক্ষ থেকে মাওলানা মাওদুদী সাহেব ও জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর ও তীব্র মত প্রকাশিত হয়। আমার মনে পড়ে, তখন আমার অন্তরে এর বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয় এবং আমি আমার এক মুহতারাম বুযুর্গের প্রতি এমন ভাষা ও ভঙ্গিতে পত্র লিখি, তাঁর ও আমার মধ্যে যে ধরনের সম্পর্ক, সে হিসেবে ঐ ধরনের ভঙ্গি ও ভাষাতে পত্র লিখার মোটেই অবকাশ ছিল না। সে ভুলের জন্য চিরদিন আমার আফসোস্ থাকবে।

এরপর এমন এক সময় আসে, যখন আমি অনুভব করতে পারি যে, জামায়াতে ইসলামীর অন্তর্ভুক্ত লোকদের মধ্যে অথবা বলা উচিৎ যে মাওলানা মাওদুদী সাহেবের লেখাসমূহ দ্বারা প্রভাবান্বিত লোকদের মধ্যে এ মানসিকতা সৃষ্টি হতে থাকে যে, "দ্বীন বা দ্বীনের চাহিদা ও দাবীসমূহ কি" তা পূর্ববর্তীরা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেননি; একমাত্র মাওলানা মাওদুদী সাহেবই সঠিকভাবে বুঝেছেন। যেহেতু, আমি এ রকম মানসিকতা ও ধ্যান-ধারণাকে তখনও বড় ধরনের গোমরাহী এবং বড় থেকে বড় গোমরাহীর মূল বুনিয়াদ বলে মনে করতাম, তাই "জামায়াতের" মধ্যে এ ধরনের মানসিকতা সৃষ্টির বিষয়টি আমি যখন অনুভব করলাম, তখন জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানা মাওদুদী সাহেব সম্পর্কে আমার রায় ও নীতির মধ্যে পরিবর্তন এসে যায় এবং এখান থেকেই নতুন ধরনের চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়ে যায়।

১৯৫৭ ইংরেজীর পাকিস্তান সফরের পর চিন্তাধারার পরিবর্তন

এর কিছুদিন পর আমি পাকিস্তান সফর করি। সেখানকার জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষস্থানীয় নেতৃবর্গ ও বিশিষ্ট সদস্যগণ এবং মাওলানা মাওদুদী সাহেবের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। (আর এ মতবিরোধ একান্ত দ্বীনি বুনিয়াদের উপর ভিত্তি করেই সৃষ্টি হয়েছিল)। অবশেষে, তাঁরা জামায়াতে ইসলামী থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন, গাজী আব্দুল জব্বার, মাওলানা হাকীম আব্দুর রহীম আশরাফ (সম্পাদক, আলমুনীর, লায়েলপুর), আব্দুল গফ্ফার হাসান সাহেব, (বর্তমান অধ্যাপক, জামেয়া ইসলামীয়া মদীনা মুনাওয়ারা) এবং এ পর্যায়ে তাঁদের অন্যান্য সহযোগী বন্ধুরা। মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহীও তাঁদের একই চিন্তাধারা এবং একই অবস্থার শরীক ছিলেন। কিন্তু তিনি তখন পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী থেকে নিজকে বিচ্ছিন্ন করে নেননি। পরে তিনিও জামায়াতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ছিলেন।-২২

আমি উপরেও উল্লেখ করেছি যে, এ সব ব্যক্তি জামায়াতে ইসলামীর প্রথম কাতারের প্রভাবশালী ও বিশিষ্ট সদস্য এবং আমার একান্ত পরিচিত বন্ধু-বান্ধব ছিলেন। আর আমি একথা প্রকাশ করতেও কোন অসুবিধা বোধ করি না যে, অন্ততঃ আমার ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা মতে এ সব সম্মানিত ব্যক্তি দ্বীনদার ও তাক্ওয়ার দিক দিয়ে মাওলানা মাওদুদী সাহেবের চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য ছিলেন। (আল্লাহই ভাল জানেন তাঁর বান্দাদের অবস্থা)। তাঁদের সাথে মোলাকাত হলে, মাওলানা মাওদুদী সাহেবের সাথে তাঁদের মতবিরোধ সম্পর্কে আমি সবিস্তারে অবগত হই। তাঁরা যা কিছু বলেছিলেন, তার সংক্ষিপ্তসার এই যে–

আমরা কিছুদিন থেকে একথা অনুভব করছিলাম যে, মাওলানা মাওদুদী সাহেব তাঁর নীতি ও লক্ষ্য পরিবর্তন করে চলছেন। তাঁর সামনে এখন একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা লাভ করা। এ লক্ষ্য অর্জন করার জন্য তিনি অন্যান্য

২২. এখানে জামায়াতের প্রথম কাতারের বরং প্রথম কাতারের বিশিষ্ট কয়েকজনের নাম দেওয়া গেল। নতুবা সে সময় জামায়াত -এর সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তিগণের সংখ্যা প্রায় সত্তর জন (৭০) হবে। এটা হাকীম আব্দুর রহীম আশরফ সাহেবের "আলমুনির" পত্রিকার মাধ্যমে জানা গিয়েছিল।

রাজনৈতিক দলসমূহের ন্যায় যখন যে নীতি অবলম্বল করা ভাল মনে করেন, সেটা গ্রহণ করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। যদিও সেটা ইসলামী শিক্ষা ও নীতির যতই পরিপন্থী হোক না কেন, তিনি সেটা গ্রহণ করেই ছাড়বেন। গ্রহণ করবেন তো করবেন ইসলামের নামেই করবেন। যদি তাঁর প্রয়োজন হয় এর জন্য তিনি ইসলামী শিক্ষা ও নীতির মনগড়া ও মনমাফিক ব্যাখ্যা প্রদান করবেন। কিন্তু, আমরা এটাকে অত্যন্ত গোমরাহী ও ফিৎনা মনে করতাম। মাওলানা মাওদুদী সাহেব ও জামায়াতে ইসলামীকে এ নীতি থেকে বিরত থাকার জন্য আমরা চেষ্টা-প্রচেষ্টা অনেক করেছি। অনেক দিন পর্যন্ত এই টানা-টানি ভেতরে-ভেতরে চলছিল। কিন্তু, মাওলানা মাওদুদী সাহেব তাঁর সে নীতি থেকে ফিরে আসার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। অধিকন্তু, বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলোর মত বিভিন্ন চালবাজীর মাধ্যমে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন যে, অবশেষে আমাদেরকেই জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফায়সালা করতে হলো।

আমি অতি সংক্ষেপে (যতদুর সম্ভব) তাঁদের বয়ানের সার-সংক্ষেপ তুলে ধরেছি। তাঁদের মাধ্যমে ঘটনার যে বিস্তারিত বিবরণ জানতে পেরেছিলাম তা অনেক দীর্ঘ। বিস্তারিতভাবে লিখতে গেলে গোটা একটা গ্রন্থ লেখা যাবে। সে সময় মাওলানা হাকীম আব্দুর রহীম আশরাফ সাহেব তাঁর নিজ পত্রিকা "আলমুনীরে" এসব ঘটনা বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করেছিলেন। (এ পর্যায়ে কোন কোন লেখা "আল-ফুরকানে" -ও প্রকাশিত হয়েছিল)। এর পর জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান-এর একজন অত্যন্ত সক্রিয় ও যোগ্য 'রুকন' এবং মাওলানা মাওদুদী সাহেবের নিবেদিত-প্রাণ ভক্ত, ডক্টর এসরার আহমদ সাহেব এসব ঘটনা সম্পর্কে প্রায় আড়াইশো পৃষ্ঠার একটা গ্রন্থ লিখেছেন। (তিনিও মাওলানা মাওদুদী সাহেবের সাথে উপরোল্লিখিত মতবিরোধের কারণে জামায়াতে ইসলামীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন।) "তাহরীকে জামায়াতে ইসলামী এক তাহকীকি মোতালায়া" নামক উক্ত কিতাবের বাংলা নাম করলে দাঁড়ায়, "জামায়াতে ইসলামী আন্দোলন ঃ একটি গবেষণামূলক পর্যালোচনা।" উক্ত গ্রন্থে আজ থেকে ২৪/২৫ বছর আগের পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আভ্যন্তরীণ কোন্দল ও অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং এ পর্যায়ের অন্যান্য ঘটনাবলী সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু, এর সারমর্ম হচ্ছে, যা আমি উপরেই উল্লেখ করেছি। এরপর এ বিষয়ে তিনি 'নক্যে গযল' নামেও একটি পুস্তিকা লিখেছেন। উল্লেখিত কিতাব দু'টি অধ্যয়নযোগ্য।

সারকথা, উক্ত পাকিস্তান সফরে উল্লেখিত ব্যক্তিগণের মাধ্যমে যা কিছু অবগত হই, বিশেষ করে মাওলানা মাওদুদী সাহেবের "দ্বীনি হিকমতে আমলী"র দর্শনের যে ব্যাখ্যা আমার জ্ঞাত হয়, এবং জামায়াতে ইসলামীর প্রকৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সম্পর্কে তাঁদের কাছ থেকে যা কিছু জানতে পারি, (পরবর্তী ঘটনাবলী ও অভিজ্ঞতা যার সত্যতা ও যথার্থতা প্রমাণ করে) তা আমার মন-মস্তিষ্ক ও অন্তরে পড়ে থাকা পর্দাকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে দেয়। অর্থাৎ ২৫ বছর আগে থেকে মাওলানা মাওদুদী সাহেবের ধর্মীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে আমার অতিরিক্ত সুধারণা এবং তাঁর ইসলামী বিপ্লবের দাওয়াত-এর আকর্ষণ আমার অন্তরে যে পর্দা ঢেকে রেখেছিল, তা সম্পূর্ণরূপে সরে যায়।

আমার ভূলের আসল বুনিয়াদ

আমি আমার এই ইতিবৃত্তের প্রতিটি বিষয়ের উপর গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে এ ফলাফলে পৌঁছি যে, মাওলানা মাওদুদী সাহেব ও জামায়াতে ইসলামীর সাথে আমার সম্পর্ক স্থাপনে ভুল হওয়ার পেছনে অন্ততঃ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে দু'টি বিষয় বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল।

প্রথমতঃ "খেলাফত আন্দোলন" ও অন্যান্য কয়েকটি আন্দোলনের সৃষ্ট "ইসলামী বিপ্লব" -এর আন্তরিক বাসনা এবং এর জন্য কিছু করার আন্তরিক উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা। যাকে ১৯৩৯ ইংরেজী থেকে শুরু হওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সৃষ্ট পরিস্থিতি এর কিছু কিছু সম্ভাবনা দেখিয়ে আরো অধিক তেজ ও সক্রিয় করে দিয়েছিল।

দ্বিতীয়তঃ 'তরজুমানুলকোরআন' এর প্রাথমিক পর্যায়ের সংখ্যাগুলোর অধ্যয়নের কারণে মাওলানা মাওদুদী সাহেব সম্পর্কে আমার মন-মস্তিষ্ক অসাধারণ প্রভাবান্বিত হওয়া এবং এর সাথে সাথে আমার সেই অতিরিক্ত সুধারণা, যা হয়ত আমার স্বভাবজাত দুর্বলতাসমূহের মধ্যে একটি।

আরবী ভাষায় একজন কবি খুব সুন্দর বলেন যে, "মুহাববতের দৃষ্টিতে মানুষের দোষ ধরা পড়ে না।" একটি হাদীছে বর্ণিত আছে যে, "কোন কিছুর প্রেম মানুষকে অন্ধ ও বধির বানিয়ে দেয়।" অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রেম যখন মানুষের মন-মস্তিষ্কে ছেয়ে যায়, তখন তার চোখ ও কান অন্তরের অনুগত হয়ে তার পছন্দনীয় ও প্রিয়বস্তুর মধ্যে কোন ধরনের দোষ-ক্রটি দেখতে পাওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে।

আজ থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে 'তরজুমানুল কোরআনের' মাধ্যমে মাওলানা মাওদুদী সাহেবের সাথে যেভাবে আমার প্রাথমিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, এর পরে মন-মস্তিষ্ক যে ভাবে তাঁর দ্বারা প্রভাবান্বিত হতে যাচ্ছিল এবং এর পরে ১৯৪১ সালে ইসলামের পুনরুজ্জীবিত করণ ও ইসলামী বিপ্লবের জন্য তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা করার সময় আমি যেভাবে সর্বপ্রথম এতে অংশগ্রহণ করে মাওলানা মাওদুদী সাহেবের সাহচর্য অবলম্বন করি, এবং এর পরে সৎকাজে আনুগত্য করার শপথ গ্রহণ করি, অতঃপর যে আগ্রহ ও সক্রিয়তার সাথে "আলফুরকান" ও অন্যান্য তৎপরতার মাধ্যমে অন্যদেরকে এর প্রতি দাওয়াত প্রদান করি, এ কাজকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করি, অতঃপর যে কারণে দুঃখ ও ব্যথিত মনে জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্নতা গ্রহণ করতে বাধ্য হই– এসব বিষয়ের বর্ণনা পূর্ববর্তী আলোচনাসমূহে উল্লেখ করেছি।

ঘটনা হলো এই যে, এ সুদীর্ঘ সময়ে বরং এরপরও অনেকদিন পর্যন্ত আমার মন-মস্তিষ্কে মাওলানা মাওদুদী সাহেব ও জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত সম্পর্কে 'সুধারণা' অথবা 'সুবোধ' এর এমন প্রাধান্য ও আধিক্য ছিল যে, এ সুদীর্ঘ সময়ে তাঁর লেখাসমূহে এমন কোন বিষয় আমার চোখে ধরা পড়েনি, যেটাকে উম্মতের জন্য গোমরাহীর কারণ ও দ্বীনের মধ্যে ফিৎনা বলে মনে করতাম অথচ-এর কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারতাম না। তবে একথা আমার স্মরণ আছে যে, তাঁর কোন কোন লেখাতে অসামঞ্জস্যতা ও 'খারেজী' সুলভ কঠোরতা পরিলক্ষিত হচ্ছিল। কিন্তু আমি এই বলে মনকে প্রবোধ দিতাম অথবা এগুলো উপেক্ষা করতাম যে, "এটা হচ্ছে দাওয়াত-এর ভাষা, ফতওয়ার ভাষা নয়।" মনে পড়ে, মাওলানা মাওদুদী সাহেব তাঁর এ ধরনের লেখাগুলো সম্পর্কে নিজেও এ ধরনের কথা লিখেছেন।

মাওলানা মাওদুদীর চারটি মারাত্মক ভুল

মাওলানা মাওদুদী সাহেবের যেসব মতবাদ মুসলিম জাতির জন্য ফিৎনার রূপ ধারণ করতে পারে

মাওলানা মাওদুদী সাহেবের লেখাগুলোর মধ্যে এমন কিছু বিষয় শুরু থেকেই ছিল, যা মুসলিম জাতির জন্য গোমরাহী ও ফিৎনার কারণ হতে পারে। তবে, "ইতিবৃত্তের" পর্যায়েও যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলামী বিপ্লবের দাওয়াতের মন্ত্রে মুগ্ধ ও মাওলানা মাওদুদী সাহেবের মুহাব্বত এবং তাঁর সম্পর্কে সুধারণার কারণে আমার পরাজিত হৃদয় তখন সেটা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি।

এখানে তাঁর এমন চারটি বিষয়ের পর্যালোচনা করা হবে, যেগুলো মুসলিম জাতির জন্য মারাত্মক গোমরাহী ও ফিৎনার কারণ হতে পারে।

প্রথম মারাত্মক ভুল
প্রসঙ্গ "কোরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা"

মাওলানা মাওদুদী সাহেবের মারাত্মক ভূলগুলোর মধ্যে আমার মতে, সব চেয়ে মারাত্মক ও ভয়ংকর হচ্ছে তার সে দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা যা তিনি কোরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা (ইলাহ, রব, ইবাদত ও দ্বীন) সম্পর্কে এবং তার উপর ভিত্তি করে সম্পূর্ণ কোরআন ও কোরআনের পয়গাম-এর মর্ম অনুধাবন সম্পর্কে "কোরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা" নামক স্বীয় গ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন। প্রথমে এ সম্পর্কেই কিছু বলার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা আমাকে তাওফীক দান করুন, যাতে এ বিষয়টিকে এমনভাবে তুলে ধরতে পারি, যার ফলে মধ্যম ধরনের বোধের অধিকারী ব্যক্তিগণও বুঝতে পারেন এবং 'ইত্মামে হুজ্জাতের' দায়িত্ব আদায় হয়।

মাওলানা মাওদুদী সাহেব তাঁর "কোরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা" নামক পুস্তকের একেবারে শুরুতেই লিখছেন–

"ইলাহ, রব, দ্বীন এবং ইবাদত কোরআনের পরিভাষায় এ চারটি শব্দ মৌলিক গুরুত্বের অধিকারী। কোরআনের সার্বিক দাওয়াত এই যে- একমাত্র আল্লাহ তাআলাই একক রব, ও ইলাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, নেই কোন রব। উলুহিয়্যাত এবং রুবুবিয়াত-এ কেউ তাঁর শরীকও নেই। সুতরাং তাঁকেই তোমরা ইলাহ এবং রব মেনে নাও, তিনি ব্যতীত অন্য সকলের রুবুবিয়াত-উলুহিয়্যাতকে অস্বীকার করো। তাঁর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া অপর কারো ইবাদত করো না। দ্বীনকে একান্ত তাঁর জন্য খালেছ করো, অন্য সব দ্বীনকে প্রত্যাখান করো।"

(কোরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা-৫)

উল্লেখিত উদ্ধৃতিতে মাওলানা মাওদুদী সাহেব যা কিছু বলেছেন, তা নিঃসন্দেহে সত্য ও সঠিক। কোরআনের মৌলিক দাওয়াত তা-ই, যা মাওলানা মাওদুদী সাহেব ব্যক্ত করেছেন এবং নিঃসন্দেহে এ চারটি পরিভাষা উল্লেখিত ব্যাখ্যার অনুরূপ মৌলিক গুরুত্ব বহন করে।

আরো একটু সামনে গিয়ে মাওলানা মাওদুদী সাহেব লিখেছেন–

"আরবে যখন কোরআন পেশ করা হয়, তখন প্রত্যেকেই জানতো, 'ইলাহ' অর্থ কি, 'রব' কাকে বলা হয়। কারণ, তাদের কথাবার্তায় এ শব্দদ্বয় পূর্ব হতে প্রচলিত ছিল। তাই তারা জানতো, এ শব্দগুলোর অর্থ কি, কি এর তাৎপর্য। তাই তাদেরকে যখন বলা হলো যে, আল্লাহ-ই একক রব ও ইলাহ, উলুহিয়্যাত এবং রুবুবিয়াত-এ আদৌ কারো হিস্সা নেই, তারা তখন ঠিক ঠিকই বুঝতে পেরেছিল। স্পষ্টতই তারা বুঝতে পেরেছিল, অন্যের জন্য কোন্ জিনিসটি নিষেধ করা হচ্ছে আর আল্লাহর জন্য কোন্ জিনিসটি করা হচ্ছে নির্দিষ্ট। যারা বিরোধিতা করেছিল গায়রুল্লাহর উলুহিয়্যাত-

রুবুবিয়াত, অস্বীকৃতির আঘাত কোথায় কোথায় লাগে, তা জেনে-শুনেই তারা বিরোধিতা করেছিল। এ মতবাদ-আক্বীদা গ্রহণ করে তাদেরকে কি বর্জন করতে হবে, আর কি গ্রহণ করতে হবে, তা তারা জেনে-শুনেই ঈমান এনেছিল।"

"অনুরূপভাবে 'ইবাদত' এবং 'দ্বীন' শব্দও তাদের ভাষায় প্রচলিত ছিল পূর্ব হতে। তারা জানতো 'আব্দ' কাকে বলে, উবুদিয়্যাত কোন্ অবস্থার নাম। ইবাদাতের উদ্দেশ্য কোন্ ধরনের আচরণ, দ্বীনের তাৎপর্য কি? তাই তাদের যখন বলা হলো, সকলের ইবাদত ত্যাগ করে আল্লাহর ইবাদত করো, সকল দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহর দ্বীনে দাখিল হও, তখন কোরআনের দাওয়াত বুঝতে তাদের ভুল হয়নি। এ শিক্ষা আমাদের জীবন ব্যবস্থার কোন্ ধরনের পরিবর্তন চায়, শোনামাত্রই তারা তা বুঝতে পেরেছিল।"-(কোরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা ঃ ৮)

মাওলানা মাওদুদী সাহেব পরবর্তী প্যারায় লিখছেন,

"কিন্তু কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় এ শব্দগুলোর যে মৌল অর্থ প্রচলিত ছিল, পরবর্তী শতকে (বরং শতাব্দীসমূহে) ধীরে ধীরে তা পরিবর্তিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এক একটি শব্দ তার সম্পূর্ণ ব্যাপকতা হারিয়ে একান্ত সীমিত বরং অস্পষ্ট অর্থের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে পড়ে। এর প্রথম কারণ ছিল আরবী ভাষার প্রতি সঠিক স্পৃহার অভাব। দ্বিতীয় কারণ ছিল, ইসলামী সমাজে যে সব ব্যক্তির উদ্ভব হয়েছে, তাদের কাছে ইলাহ, রব, দ্বীন, ইবাদাতের সে অর্থ অবশিষ্ট ছিল না, যা কোরআন নাযিল হওয়ার সময় মুসলিম সমাজে প্রচলিত ছিল। এ কারণে পরবর্তীকালের অভিধান এবং তাফসীর গ্রন্থে অধিকাংশ কোরআনিক শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে আভিধানিক অর্থের পরিবর্তে এমন সব অর্থে যা পরবর্তী কালের মুসলমানরা বুঝতো। যেমন ঃ

'ইলাহ' শব্দকে মূর্তি এবং দেবতার প্রায় সমার্থক করা হয়েছে। লালন-পালনকর্তা বা পরওয়ারদেগার -এর প্রতিশব্দ করা হয়েছে 'রবকে'। 'ইবাদাতের' অর্থ করা হয়েছে, পূজা-উপাসনা। ধর্ম, মযহাব এবং রিলিজিয়ান (RELIGION) -এর সমার্থজ্ঞাপক শব্দ করা হয়েছে 'দ্বীনকে'। 'তাগুত' এর তরজমা করা হয়েছে মূর্তি বা শয়তান। ফল দাঁড়ালো এই যে, কোরআনের মৌল উদ্দেশ্য অনুধাবন করাই লোকের পক্ষে কষ্ট সাধ্য হয়ে পড়লো।" (কোঃ চাঃ মৌঃ পরিভাষা-৯)

অতঃপর অবস্থার এই পরিবর্তনের ফল কি দাঁড়ালো, সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মাওলানা মাওদুদী সাহেব লিখেছেন, "এটা সত্য যে কেবল এ চারটি পরিভাষার তাৎপর্যে আবরণ পড়ে যাওয়ার কারণে কোরআনের তিন চতুর্থাংশের চেয়ে বেশী শিক্ষা এবং তার সত্যিকার স্প্রিটই দৃষ্টি থেকে প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়"। ✪

(কোরআনের চাঃ মৌঃ পরিভাষা-৯)

✪ উল্লেখিত উদ্ধৃতিসমূহের অনুবাদ জনাব গোলাম সোবহান সিদ্দীকী কর্তৃক অনুদিত ও আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃত প্রকাশিত "কোরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা" নামক গ্রন্থ হতে অবিকলভাবে উদ্ধৃত। -অনুবাদক।

আল্লাহ তায়ালা মাওলানা মাওদুদী সাহেবকে এমন পূর্ণতা ও যোগ্যতা প্রদান করেছেন যে, তাঁর লেখাগুলো অত্যন্ত সুখপাঠ্য এবং দ্বীনি সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নমুনা হওয়ার সাথে সাথে অত্যন্ত সরল ও সহজবোধ্য। তাতে কোন ধরনের জটিলতা ও দুর্বোধ্যতা মোটেই থাকে না। উপরোল্লিখিত উদ্ধৃতিসমূহ ঠিক এই ধরনের। তিনি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে এবং কলমের পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে এতে নিম্নবর্ণিত কয়েকটি ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক দাবী পেশ করেছেন।

প্রথমতঃ কোরআন নাযিল হওয়াকালীন সময়ে সমস্ত আরববাসী কোরআনের এ "চারটি মৌলিক পরিভাষার" (ইলাহ, রব, ইবাদত ও দ্বীন) অর্থ ও সারমর্ম সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারতো। তাই তারা কোরআনের 'দাওয়াতে তাওহীদ' বা একত্ববাদের দাওয়াতের দাবী এবং এর অবশ্য করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়াবলী কি ও তার ফলাফল কি হবে, তা সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছিল। তাদের মধ্যে যারা এ দাওয়াত কবুল করেছিলেন, তাঁরা বুঝে-শুনেই কবুল করেছিলেন (উদাহরণস্বরূপ সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম)। আর যারা অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করেছিল, তারা এটা বুঝে-শুনেই অস্বীকার করেছিল। (যেমন, আবু জেহেল, আবু লাহাব, ও অন্যান্য কাফেররা)

দ্বিতীয়তঃ কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পরবর্তী শতাব্দীসমূহে এ মৌলিক পরিভাষাসমূহের মর্মার্থ পরিবর্তিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এগুলোর মর্মার্থ অত্যন্ত সীমিত বরং অস্পষ্ট হয়ে যায়।

তৃতীয়তঃ যে সব ব্যক্তি ইসলামী সমাজে জন্মগ্রহণ করেন, (যাদের মধ্যে অধিকাংশ তাবেঈন এবং তাঁদের পরবর্তী সমস্ত আইম্মায়ে কেরাম ও আলেমগণই অন্তর্ভুক্ত), তাঁরা শব্দগুলোর সে মর্মার্থ বুঝতে পারেননি, যে মর্মার্থ কোরআন অবতরণকালীন সময়ে বুঝা যেতো এবং যা সঠিক ও সহীহ্ মর্মার্থ ছিল।

চতুর্থতঃ অবস্থার পরিবর্তনের কারণে কোরআনের তিন চতুর্থাংশ শিক্ষা বরং তার সত্যিকার স্প্রিটই দৃষ্টি থেকে প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়।

মাওলানা মাওদুদী সাহেবের উক্ত ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক দাবী ও দলীলসমূহ সম্পর্কে আমি এ মুহূর্তে কোন আলোচনা, সমালোচনা ও মন্তব্য করতে চাই না। পাঠক সমাজের নিকট শুধু এটাই আরজ করতে চাই যে, মাওলানা মাওদুদী সাহেব তাঁর উক্ত লেখা ও রচনার মাধ্যমে পাঠক সমাজকে একথাই জোর দিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন যে, কোরআনের সে সব মৌলিক পরিভাষার (ইলাহ, রব, দ্বীন, ইবাদত) অর্থ ও সারমর্ম কেবল কোরআন অবতরণকালীন (অর্থাৎ অতি জোরে সাহাবায়ে কেরামের যুগে) সময়ে তো সঠিক ও যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারা গিয়েছিল। তাই কোরআনের তাওহীদের পয়গাম তখন সঠিকভাবে বুঝতে পারা গিয়েছিল। এর পরবর্তী সময়ে আর সঠিক মর্মার্থ উপলব্ধি করা যায়নি, বরং ভুল অথবা অসম্পূর্ণ অর্থ বুঝা যাচ্ছিল। সময় ও

অবস্থার এ পরিবর্তনের কারণে পবিত্র কোরআনের তিন চতুর্থাংশের চেয়ে অধিক শিক্ষা এবং তার সত্যিকার স্প্রীট মুসলিম জাতির দৃষ্টির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়।

প্রকৃতপক্ষে মাওলানা মাওদুদী সাহেবের উক্ত কথা মানতে গেলে পবিত্র কোরআনের যাবতীয় শিক্ষা এবং দ্বীনের সব কিছু ভিত্তিহীন, সংশয়পূর্ণ ও অনির্ভরযোগ্য হয়ে যায়। যেহেতু ,"রব, ইলাহ, দ্বীন ও ইবাদত"-এর মত গুরুত্বপূর্ণ শব্দসমূহ, যেগুলো পবিত্র কোরআনের শত শত স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে, প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় যেগুলোর প্রয়োগ হয়েছে এবং কোরআনের শিক্ষা ও দাওয়াতে যেগুলোর সে মৌলিক গুরুত্ব রয়েছে যা নিঃসন্দেহে অন্য কোন শব্দে নেই, এগুলো সম্পর্কে যদি একথাই মেনে নেওয়া হয় যে, কোরআন অবতরণকালীন সময়ের পরবর্তী যুগে মুসলিম জাতি বহু শতাব্দী পর্যন্ত সে শব্দগুলোর যে অর্থ বুঝে আসছিল, তা সঠিক ছিল না বরং ভুল অথবা অসম্পূর্ণ ছিল এবং সে কারণে তাওহীদ সম্পর্কিত কোরআনের আয়াতসমূহ এবং কালেমায়ে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" -এর অর্থ ও দাবীও ভুল অথবা অসম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারা যাচ্ছিল, তা হলে, কোরআনের আর কোন আয়াত, কোন শব্দ ও কোন বাক্য সম্পর্কেই সংশয়হীন হওয়ার অবকাশ থাকে না যে, সেগুলোর মর্মার্থ সেটাই যা এতদিন পর্যন্ত মুসলিম জাতির বৃহৎ অংশ উপলব্ধি করে আসছে। এর ফলে নাস্তিক, ধর্মদ্রোহী, মুলহেদীন ও বাতিলপন্থীদের জন্য অভিধান প্রভৃতির আশ্রয় নিয়ে বর্ণনা ও লেখনীর জোরে গোটা দ্বীনকেই বিকৃত করে দেওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। আশা করি, নিম্নের কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে পাঠকগণ বিষয়টি সহজভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন।

(১) "রাসূল" শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে চকড়ালভীদের বক্তব্য :

"রাসূল" শব্দের অর্থ ও মর্মার্থ এবং অন্তর্নিহিত তাৎপর্য মুসলিম জাতির নিকট সুপরিচিত ও সুবিদিত। যে ব্যক্তি "কালেমায়ে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ" (সঃ)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, সে অবশ্যই তার জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেকানুযায়ী 'রাসূল' শব্দের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু চরমপন্থী 'মুনকেরীনে-হাদীছ' বা হাদীছ অস্বীকারকারীরা (যেমন : মওলবী আব্দুল্লাহ চকড়ালভী ও তাঁর অনুসারীরা) দাবী করেন যে, "আরবী ভাষায় 'রাসূল' বলতে শুধু সংবাদদাতা ও বাণীবাহক (কাসেদ)-কে বুঝায়। রাসূলের কাজ ও ভুমিকা হচ্ছে, আল্লাহর বাণী ও নির্দেশ তাঁর বান্দাদের নিকট পৌঁছানো। "রাসূল" সম্পর্কে মুসলিম সমাজ যে ধারণা ও আক্বীদা পোষণ করে যে, তাঁরা নিষ্পাপ (মাসুম) ও তাঁদের আনুগত্য করা ফরয ইত্যাদি, একেবারেই ভিত্তিহীন ও মোল্লাদের দ্বারা আবিষ্কৃত।"

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে অমৃতসর থেকে তাঁদের প্রকাশিত 'বালাগ' নামক সাময়িকীতে এ বিষয়ের উপর স্বতন্ত্রভাবে লেখা প্রকাশিত হতো। কোরআনের যেসব আয়াতে নবী-রসূলদের কোন কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি তথা পদস্খলনের কথা উল্লেখ

রয়েছে, সে সব আয়াতকেও দলীল হিসেবে পেশ করা হতো। (যেমন :"ওয়া আ'সা আদমু রব্বাহু ফা'গাওয়া; ফা-জন্না আল্লান নক্দিরা আলাইহে; ওয়াস্তাগফির লিযাম্বিকা প্রভৃতি)। কিন্তু, আমার ধারণা মতে মাওলানা মাওদুদী সাহেবের নজরেও 'বালাগ' ও সে সব লেখা অবশ্যই পড়েছিল। সম্ভবতঃ কোন লাইব্রেরীতে এর ফাইলও সংরক্ষিত আছে।

বাহ্যত ঃ এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, চকড়ালভীদের উক্ত মতবাদ ও দাবীসমূহের বুনিয়াদ তারই উপর যে "বহু শতাব্দী ধরে সর্বস্তরের মুসলিমগণ 'রাসূল' শব্দের যে মর্মার্থ ও তাৎপর্য বুঝে আসছিলেন, তা ভুল ছিল।" তাঁদের এ দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্য এবং মাওলানা মাওদুদী সাহেব ইলাহ, রব, দ্বীন ও ইবাদত সম্পর্কে যে দাবী ব্যক্ত করেছেন, উভয়ের মধ্যে তেমন বেশী পার্থক্য আছে কি?

(২) "সালাত"(নামায) -এর অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে বক্তব্য :

আজ থেকে প্রায় ৩৫/৪০ বৎসর পূর্বের ঘটনা। এক সময় আমি বেরেলীতে থাকতাম এবং আল্-ফুরকান পত্রিকা সেখান থেকেই প্রকাশিত হতো। একদিন পাঞ্জাবের এক ব্যক্তি আমার নিকট আগমন করেন। তিনি কোন কাজ-কারবারের জন্য বদায়ুন জেলায় অবস্থান করতেন। তিনি সুশিক্ষিত ছিলেন এবং আরবীর সাথেও তাঁর পরিচিতি ছিল। তাঁর বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। তিনি প্রথমে আমার সাথে নামায সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, "আপনারা যে নামায পড়ে থাকেন এ সম্পর্কে কোরআনে কোন নির্দেশ অথবা আলোচনা আছে কি?" তাঁর কথায় আমি ধরে নিতে পারলাম যে, নিশ্চয় তিনি চকড়ালভীদের সাথে সম্পর্ক রাখেন। তাই সে হিসেবেই আমি আলাপ-আলোচনা শেষ করি। অতঃপর তিনি তাঁর লেখা একখানা পুস্তিকা আমাকে প্রদান করলেন। বুক সাইজের ৬০/৭০ পৃষ্ঠার উক্ত পুস্তিকাটির নাম সম্ভবতঃ "কোরআনী নামায" অথবা প্রায় সমার্থক অন্য কোন নাম ছিল। যতটুকু মনে আছে, পুস্তিকাটির বিষয়বস্তুর সারমর্ম ছিল এই যে, মুসলমানরা যে নামায পড়ে থাকে তাঁর কোন নির্দেশ অথবা আলোচনা কোরআনের কোথাও নেই। তাই এটা হচ্ছে কোরআন-বহির্ভূত নামায, মোল্লাদের দ্বারা আবিষ্কৃত মাত্র। "সালাত" শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, দোয়া, মুনাজাত, ও 'তাওয়াজ্জুহ ইলাল্লাহ' বা আল্লাহর প্রতি ধাবিত হওয়া।

তাঁদের এ দাবীর সমর্থনে তিনি অভিধানের কয়েকটি উদ্ধৃতি এবং কোরআনের আয়াতও পেশ করেছিলেন। যতটুকু মনে পড়ে, কোরআনের এ আয়াতও তিনি পেশ করেছিলেন যে, "সল্লি-আলাইহিম, ইন্না সালাতকা সাকানুল লাহুম।"-২৩

২৩. উক্ত আয়াতে 'সালাত' শব্দের অর্থ হচ্ছে কল্যাণ কামনা বা দোয়া করা।

আমার স্মরণ আছে যে, আমি আল-ফুরকান পত্রিকায় উক্ত ব্যক্তি ও তাঁর কিতাব এবং তাঁর উদ্ভট ও কাল্পনিক দাবীসমূহের যথাযথভাবে আলোচনা করেছিলাম।

একথা সুবিদিত যে, এ ধরনের গোমরাহীর বুনিয়াদও এই যে "সর্বস্তরের মুসলমানগণ এতদিন পর্যন্ত 'সালাত' শব্দের যে অর্থ ও তাৎপর্য বুঝে আসছেন, তা সঠিক নয়, বরং কোরআন ও আরবী অভিধানের পরিপন্থী।"

(৩) "যাকাত" সম্পর্কে মুন্‌কেরীনে-হাদীছের দাবী :

সাপ্তাহিক এশিয়া-লাহোর জামায়াতে-ইসলামী পাকিস্তানের একটি দলীয় মুখপত্র। উক্ত পত্রিকায় ১৭ই জুন-৭৯ ইং সংখ্যায় "মুনকেরীনে হাদীছ ফিৎনার" (সম-সাময়িক কালের) সবচেয়ে বড় ও প্রধান অগ্রদুত গোলাম আহমদ পারভেজ -এর মাসিক 'তুলুওয়ে-ইসলাম' পত্রিকায় "যাকাত -এর কোরআনী মর্মার্থ" শিরোনামে প্রকাশিত একটি লেখা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছিল,

'মাসিক তুলুওয়ে-ইসলাম' যে সংখ্যায় যাকাত-এর কোরআনী মর্মার্থ বুঝানো হয়েছে এইভাবে যে-

"যাকাত" বলতে আরবী ভাষায় উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধিকেই বুঝানো হয়ে থাকে। সুতরাং 'ইতায়ে যাকাত' বা যাকাত প্রদান-এর অর্থ হবে, উন্নয়ন-সামগ্রী প্রদান করা বা ব্যবস্থা করা। আর ইসলামী সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে এটাই যে, সমাজের সর্বস্তরের লোকদের জন্য উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি সাধনের যাবতীয় সরঞ্জাম ও সামগ্রীর ব্যবস্থা করা। উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির সামগ্রী ও সরঞ্জাম বলতে কেবল অন্ন-বস্ত্র ও বাসস্থানকেই বুঝায় না; বরং যে সব সামগ্রী ও সরঞ্জামের মাধ্যমে মানবিক যোগ্যতাসমূহের উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি সাধিত হয় সবই এর মধ্যে শামিল। পবিত্র কোরআনের আয়াত, "আল্লাযীনা ইন মাক্কান্নাহুম ফিল্আরদে আক্কামুস সালাতা ওয়া আতউয্ যাকাত" -এর অর্থও এটাই। অর্থাৎ-এ আয়াতের অর্থ এ নয় যে, যখন তাঁদের হুকুমত (শাসন) কায়েম হবে, তখন তাঁরা (নামায কায়েম করবে ও) মানুষের নিকট হতে যাকাত উসুল করবে। বরং এটাই বলা হয়েছে যে, ইসলামী হুকুমত (শাসন) যাকাত (উন্নয়ন সামগ্রী) প্রদান করবে। সমাজের প্রত্যেক সদস্যকে উন্নয়ন সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেবে।" (সংক্ষেপিত)

সাপ্তাহিক 'এশিয়া' পত্রিকায় 'তুলুওয়ে-ইসলাম'-এর উল্লেখিত উদ্ধৃতিটা পেশ করার পর প্রায় তিন কলামব্যাপী আলোচনায় এর প্রতিবাদ করে এটাকে ভিত্তিহীন বলে প্রমাণ করা হয় এবং বলা হয় যে, "যাকাতের যে কোরআনী মর্মার্থ উক্ত লেখায় ব্যক্ত করা হয়, তা সরাসরিভাবে কোরআন বিকৃতি বৈ আর কিছুই নয়; বরং রাসূল (সঃ)-এর নির্দেশিত ব্যাখ্যা এবং উম্মতের 'ঐকমত্য' ও 'তাওয়াতুর' -এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী।" (আর একথা নিঃসন্দেহে সঠিক ও সহীহ।)

উল্লেখিত আলোচনার পর একথা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, রাসূল, সালাত ও যাকাত-এর মত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় পরিভাষাসমূহ সম্পর্কে মুনকেরীনে-হাদীছের এই

বানোয়াট ও চরম বিভ্রান্তিমুলক দাবীসমূহের বুনিয়াদ এটাই যে, "এ সমস্ত ধর্মীয় পরিভাষার যে অর্থ ও তাৎপর্য কোরআন নাযিল হওয়ার পরবর্তী যুগ হতে এ পর্যন্ত সর্বস্তরের মুসলিমগণ অনুধাবন করে আসছেন, তা সঠিক নয়; বরং সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য হচ্ছে, যা মওলবী আবদুল্লাহ চকড়ালভী ও পারভেজ সাহেবের মত নতুন গবেষকরা অভিধান ও কোরআনের আয়াতের মাধ্যমে বুঝতে পেরেছেন।"

মাওলানা মাওদুদী সাহেব এবং তাঁর ভক্ত ও অনুসারীগণ, একটু নিরপেক্ষ মনে চিন্তা করে দেখুন যে-

এ বিষয়টি মাওলানা মাওদুদী সাহেবের উক্ত দাবী অপেক্ষা কম ক্রুটিপূর্ণ ও আশ্চর্য জনক কি যে, কোরআন অবতরণকালীন সময়ের পরবর্তী শতাব্দীসমূহে দ্বীনে ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা, (ইলাহ, রব, দ্বীন ও ইবাদত)-এর যে মর্মার্থ মুসলিম উম্মাহ বুঝে আসছিলেন তা সঠিক ছিল না; ভুল অথবা অসম্পুর্ণ ছিল। সঠিক মর্মার্থ হলো তা-ই যা মাওলানা মাওদুদী সাহেব চতুর্দশ শতকের প্রায় মধ্যভাগে এসে কোরআনী আয়াত এবং অভিধানের সাহায্যে অনুধাবন করেছেন।

আল্লাহ তাআলা মাওলানা মাওদুদী সাহেবকে এ বিষয়টি বুঝার তাওফীক দান করুন যে, একথা লেখার মাধ্যমে কত বিরাট ফিৎনার দ্বার তিনি খুলে দিয়েছেন এবং মুলহেদীন ও ধর্মদ্রোহীদের জন্য কেমন সনদের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

পবিত্র কোরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা প্রসঙ্গে মাওলানা মাওদুদী সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে উপরে যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে, তা কেবল সাধারণ ও ধর্মীয় শিক্ষায় অশিক্ষিত লোকদেরকে সামনে রেখেই করা হয়েছে। যাদেরকে আল্লাহ তাআলা ইলমে দ্বীনের জ্ঞান দান করেছেন এবং যাদের জ্ঞানের বহর কেবল উর্দু (বা বাংলা) ভাষার কিতাবেই সীমাবদ্ধ নয় এবং যারা আলেম সমাজের পরিভাষাসমূহ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল, তারা এ বিষয়টি সম্পর্কে এভাবেই চিন্তা-ভাবনা করুন যে, মাওলানা মাওদুদী সাহেবের উক্ত গবেষণার অবশ্যম্ভাবী ও সুস্পষ্ট ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, 'ইলাহ' শব্দের অর্থ এবং "লা ইলাহা ইল্লালাহু" এ বাক্যের মর্মার্থ ও দাবী কি, তা মুসলিম জাতির নিকট সুত্রপরম্পরায় পৌঁছেনি; বরং বহু শতাব্দী পর্যন্ত এ কলেমার অর্থ ভূল অথবা অসম্পূর্ণভাবে বুঝে আসছিল। অর্থাৎ, বর্তমান মুসলিম জাতির নিকট 'কলেমায়ে তাওহীদের' সঠিক অর্থ অবিচ্ছিন্ন সূত্রের মাধ্যমে পৌঁছেনি বা সূত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষা পায়নি। উক্ত ফলাফল কত যে মারাত্মক তা সাধারণ লোকেরা হয়তো বুঝতে অক্ষম হবে, কিন্তু জ্ঞানী লোকেরা একথা বুঝতে পারবেন যে, শুধু এর সম্ভাব্যতা মেনে নিলেও দ্বীনের গোটা বুনিয়াদই টল-টলায়মান হয়ে পড়ে। একথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও সন্দেহমুক্ত যে, দ্বীনের কোন আকীদা এবং মূল বিষয়ের (হাকীকত) উপর ঈমান আনতে আমরা তখনই বাধ্য, যখন এটা রসূল করীম (সঃ)-এর নিকট থেকে সূত্রপরম্পরায় অবিচ্ছিন্নভাবে প্রমাণিত হয়ে আমাদের নিকট পৌছে।

সুতরাং আমরা যদি কিছুক্ষণের জন্যও একথা ধরে নিই যে, নবী-করীম (সঃ)-এর যুগ অথবা সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী কয়েক শতাব্দী অথবা কোন এক শতাব্দী কিংবা তার চেয়ে কিছু কম সময় এমন অতিবাহিত হয় যখন মুসলিম জাতি 'কলেমায়ে তাওহীদ' -এর সঠিক মর্মার্থ ও দাবী কি তা বুঝতে পারেনি, বরং ভুল অথবা অসম্পূর্ণভাবে বুঝতো তাহলে সুত্রের ধারাবাহিকতা বা 'তাওয়াতুর' আর বাকী থাকে না। কারণ 'তাওয়াতুর' হওয়ার জন্য অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিতা আবশ্যক। তাই-এর উপর ঈমান আনতেও মুসলিম জাতি বাধ্য হবে না।

প্রকৃতপক্ষে, 'কলেমায়ে লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ'-এর মর্মার্থ এবং অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, তদ্রুপ ঈমানের অন্যান্য মৌলিক বিষয়সমূহের সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য কি, তা সাহাবায়ে কেরামগণ রসূল (সঃ) থেকে ভালভাবে জেনে নিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে তাবেঈনরা সাহাবায়ে কেরাম থেকে এবং তাবে-তাবেঈনরা তাবেঈনদের থেকে এসব বিষয়ের জ্ঞান লাভ করেছিলেন। এভাবে ধারাবাহিক সনদের মাধ্যমে আজ পর্যন্ত সেসব বিষয়ের সঠিক মর্মার্থ ও জ্ঞান মুসলিম জাতি লাভ করে আসছে। কোরআন ও দ্বীনের সত্যিকার ধারক ও বাহকগণের মাধ্যমে এ পদ্ধতি চালু রয়েছে। শব্দ ও বর্ণনার তারতম্যের সহিত উক্ত মর্মার্থ ও ব্যাখ্যাই তাফসীর গ্রন্থ এবং মোহাক্কেক ওলামায়ে কেরামের কিতাবে এখনো বর্তমান রয়েছে। সারকথা এই যে, সাহাবায়ে কেরাম-এর পক্ষ থেকে আমাদের নিকট শুধু "কলেমায়ে লা-ইলাহার" শব্দই পৌঁছেনি; বরং এর সঠিক মর্মার্থ ও দাবী কি, তাও আমাদের নিকট ধারাবাহিক সুত্রের মাধ্যমে পৌঁছেছে। তদ্রুপ সালাত ও যাকাত-এর শুধু শব্দই আমাদের নিকট পৌঁছেনি, বরং উক্ত শব্দসমূহের তাৎপর্য ও মর্মার্থ কি, তা-ও অবিচ্ছিন্ন সুত্রের মাধ্যমে পৌঁছেছে।

মাওলানা মাওদুদী সাহেব যে বলেছেন, "ইলাহ, রব, দ্বীন ও ইবাদত"-এর অর্থ এবং "কলেমায়ে লা-ইলাহা"র সঠিক মর্মার্থ ও দাবী কি, তা কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পরবর্তী যুগে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারা যায় নি, একথা নিঃসন্দেহে ভূল। একথা বলার অর্থ হচ্ছে, দ্বীনকে অনির্ভরযোগ্য ও ভিত্তিহীন সাব্যস্ত করা এবং মুলহেদীনের জন্য দ্বীনের সুক্ষ্ম বিষয়াবলীর নতুন নতুন ব্যাখ্যা ও বিকৃতি করার পথ উম্মুক্ত করে দেওয়া। **"কিন্তু মাওলানা মাওদুদী সাহেব সম্পর্কে যতদুর আমি অবগত আছি, তার উপর ভিত্তি করে আমি একথা মনে করি যে, তিনি এ ধরনের মারাত্মক ও ভ্রান্তিপূর্ণ কথা কখনো সচেতনভাবে বলতে পারেন না; বরং তাঁর অজ্ঞাতসারে এ ধরনের কথা ব্যক্ত হয়ে গেছে"**।

আমার নিজের অবস্থাও এরকম ছিল যে, যখন মাওলানা মাওদুদী সাহেবের "চারটি মৌলিক পরিভাষা" সম্পর্কিত প্রবন্ধটি 'তরজুমানুল কোরআন' -এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল (যা পরবর্তীতে "কোরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়) (তখন জামায়াতে ইসলামীর প্রথম বর্ষ ছিল) তখন মাওলানা মাওদুদী সাহেবের উক্ত ব্যাখ্যা ও গবেষণা সম্পর্কে আমি ভিন্নমত পোষণ করেছিলাম।

পরবর্তী সময়ে মাওলানা মোহাম্মদ আলী কান্দলুভী সাহেবের অভিযোগ ও সংশয়-এর উত্তরে আমি যে নিবন্ধটি লিখেছিলাম, তাতেও আমি তাঁর উল্লেখ করেছিলাম। তার শিরোনাম ছিল, "জামায়াতে ইসলামীর স্বরূপ ও আমাদের কর্মনীতি : কতিপয় সংশয় -এর উত্তর।" (এ লেখাটির কথা পুর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে।) সর্বপ্রথম এটা আল্-ফুরকান পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং পরে ১৩৬১ হিঃ সালের শাবান অথবা রজব মাসের "তরজুমানুল কোরআনে' – ও প্রকাশিত হয়েছিল। সে সময় আমি মাওলানা মাওদুদী সাহেবের সাথে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্র "দারুল ইসলাম" -এ অবস্থান করছিলাম। তখনকার সময়ের এ সম্পর্কিত একটি কথা এখনও আমার ভালভাবে স্মরণ আছে যে, একদিন আমি মাওলানা মাওদুদী সাহেবের সাথে একত্রে বসা ছিলাম। তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আপনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন, সে ধরনের ব্যাখ্যা পূর্ববর্তী কোন আলেম অথবা কোন লেখক দিয়েছেন কি?" (তখন আমার উক্ত প্রশ্ন কোন অভিযোগ অথবা বিতর্কের উদ্দেশ্যে ছিল না; কেবল জানতেই চেয়েছিলাম।) মাওলানা মাওদুদী সাহেব বললেন, "হ্যাঁ কেবল শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া। তিনি বহুদূর পর্যন্ত সঠিক পথে চলেন, **কিন্তু, নিকটে গিয়েই দিক পরিবর্তন করেন**।"

মাওলানা মাওদুদী সাহেবের উক্ত জবাবের শেষ বাক্যটি আমার এমনভাবে স্মরণ আছে যে আমার জন্য তার উপর "কসম" করা জায়েয হবে যে, তিনি হুবহু এরকমই বলেছিলেন।

যাক, আমি একথাই বলতে চেয়েছিলাম যে, কোরআনের উক্ত চারটি মৌলিক পরিভাষা এবং কলেমায়ে "লা-ইলাহা'র মাওলানা মওদুদী সাহেব-প্রদত্ত ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমি একমত ছিলাম না। কিন্তু সে সময়, বরং এরপরও দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমি একথা অনুভব করতে পারিনি যে, এটা কেবল তত্ত্ব ও গবেষণাগত ভুলই নয় বরং এর মাধ্যমে মূলহেদীনদের জন্য কোরআনের নির্দেশাবলী এবং দ্বীনি পরিভাষাসমূহের অনৈসলামিক ব্যাখ্যা ও বিকৃতির পথ উম্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং তাদের জন্য একটা "সনদ" -এর ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে।

সার কথা হলো, তখন যেরূপ আমি সে কথা অনুভব করতে পারিনি তদ্রুপ, মাওলানা মাওদুদী সাহেব হয়তো সেটা অনুভব করতে পারেননি। কিন্তু, পরবর্তী সময়ে যখন এর মারাত্মক ও জঘন্য ভুলের কথা আমি অনূভব করতে পারি, তখন আমারই পরামর্শক্রমে এ প্রসঙ্গে মাসিক অল-ফুরকান পত্রিকায়ও লেখা প্রকাশিত হয় এবং আরো দু'এক ব্যক্তিও এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন। অতঃপর আজ থেকে কয়েক মাস আগে মোহতরম বন্ধুবর, মাওলানা আলী মিয়া সাহেবও স্বীয় রীতি অনুযায়ী অত্যন্ত মর্মাহত ও ব্যথিত মনে এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন। কিন্তু, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো, এরপর মাওলানা মাওদুদী সাহেব এ রকম মারাত্মক ভুলের সংশোধন ও নিরসনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারেননি। হয়তো এর পেছনে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশী সক্রিয় ছিল তা হলো তাঁর ভক্তদের মধ্যে এমন কিছু লেখক রয়েছেন, যাঁরা সম্ভবতঃ এটাকেই নিজেদের

দায়িত্ব বলে মনে করেন যে, যখনই কোন ব্যক্তি মাওলানা মাওদুদী সাহেবের কোন ভুলের প্রতি অংগুলি নির্দেশ করবেন, তখনই যথা সম্ভব জবাব প্রদান করে তাঁকে স্বস্তি প্রদান করা এবং নিজেদের লেখনীর দক্ষতার বলে উক্ত ব্যক্তি (সমালোচক)-কে অপরাধী সাব্যস্ত করে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো। অবশেষে, একটি মাত্র কথা আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরে "চারটি মৌলিক পরিভাষা" সম্পর্কিত আলোচনা এখানেই শেষ করবো।

আলীগড় ইউনিভার্সিটির সাথে সম্পর্ক রাখেন এমন একজন ডাক্তার সাহেব স্বীয় একটি গ্রন্থে সংস্কারক ও মোজাদ্দেদগণের আলোচনা করতে গিয়ে হযরত মোজাদ্দেদে আল্‌ফে-ছানী, শাহ ওয়ালি উল্লাহ, শাহ ইসমাঈল শহীদ, সৈয়দ আহমদ শহীদ (রাঃ) প্রমুখ -এর সাথে স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও মওলবী আবদুল্লাহ চকড়ালভীর নামও উল্লেখ করেছিলেন। তখন মাওলানা মওদুদী সাহেব কঠোরভাবে এর সমালোচনা করতে গিয়ে "তরজুমানুল কোরআন"-শাওয়াল-১৩৫৯হিঃ সংখ্যায় লিখেছিলেন–

"ডাক্তার সাহেব স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও মওলবী আবদুল্লাহ চকড়ালভী সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা পুনর্বিবেচনা সাপেক্ষ। প্রথমতঃ মোজাদ্দেদে আলফে-ছানী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ, শাহ ইসমাঈল শহীদ ও সৈয়দ আহমদ বেরলভী (রাঃ)-এর একই পর্যায়ে স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও আব্দুল্লাহ চকড়ালভীর নাম উল্লেখ করার কারণে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। মনে হয়, ঐ দু'ব্যক্তিও যেন তাঁদের একই পর্যায়ের লোক। অথচ "শত্তানা মা বায়না হাউলায়ে ওয়া হাউলায়ে"। অর্থাৎ তাঁদের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ স্যার সৈয়দ আহমদ খানের কাজকে 'ইসলাম' এবং 'উচ্চ পর্যায়ের সমালোচনা' ইত্যাদি শব্দে ব্যক্ত করা এবং একথা বলা যে, মুসলিম সমাজে তাঁর মৃত্যুর পরে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাহিত্যিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত যে সব গুরুত্বপূর্ণ তৎপরতা ও আন্দোলন গড়ে উঠেছে, সব কিছুর মূল উৎস হচ্ছেন তিনি (পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে), বাস্তবে একথা অতিরঞ্জিত থেকে অতিরঞ্জিততর। সত্য কথা হলো, ১৮৫৭ ইংরেজীর পর হতে এ পর্যন্ত মুসলিম সমাজে যত সব গোমরাহী ও ভ্রান্তির জন্ম হয়েছে, সব কিছুর মুলে রয়েছেন সেই স্যার সৈয়দ আহমদ খান। পরোক্ষ হোক বা প্রত্যক্ষ হোক, এগুলোর সুত্র-পরম্পরা তাঁর সাথে অবিচ্ছিন্ন। তিনি এ উপমহাদেশে আধুনিকায়নের প্রথম ইমাম ছিলেন। সমগ্র সুসলিম জাতির ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারার আমুল পরিবর্তন সাধন করে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। এদিকে, মওলবী আব্দুল্লাহ চকড়ালভী সাহেবকে কোরআনের একজন বড় আলেম বলে আখ্যায়িত করা স্বয়ং পবিত্র কোরআনের উপর জুলুম (অবিচার) করা।"

-(তরজুমানুল কোরআন ঃ শাওয়াল, ১৩৫৯হিঃ)

আমি এবার আরজ করছি যে, স্যার সৈয়দ আহমদ খানের অবস্থা, নীতি ও চিন্তাধারা সম্পর্কে যাঁরা অবগত আছেন এবং যাঁরা তাঁর 'তফসীরে কোরআন' অধ্যয়ন

করেছেন, তাঁরা অবশ্যই অবগত আছেন যে, তাঁর যে সব নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর উপর ভিত্তি করে মাওলানা মাওদুদী সাহেব তাঁর কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং '৫৭ ইংরেজীর পরে যে সব গোমরাহী জন্ম নিয়েছে তার সবগুলোর জন্য তাঁকে দায়ী করেছেন, তা ছিল এই যে,

"তিনি কোরআনের শব্দাবলী ও দ্বীনি পরিভাষাসমূহ, যেমন : জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদির এমন সব ব্যাখ্যা ও মর্মার্থ ব্যক্ত করেছেন, যা তাঁর পূর্ববর্তী কোন আলেম অথবা কোন ধর্মীয় ইমাম ব্যক্ত করেননি। মনে হয়, তিনিও কোরআনের শব্দাবলী ও পরিভাষাসমূহের নতুন নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করে এটাই দাবী করেছেন যে, সেগুলোর সঠিক মর্মার্থ বহু শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম জাতি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেননি। সঠিক মর্মার্থ ও তাৎপর্য তা-ই, যা আমি দলিল ও প্রমাণ সহকারে ব্যক্ত করেছি।

বস্তুতঃ ইলাহ, রব, দ্বীন ও ইবাদত প্রভৃতির মত দ্বীনের মৌলিক পরিভাষা এবং সালাত, যাকাত, মালায়েকা, জিন্নাত, জান্নাত ও জাহান্নাম ইত্যাদির মত কোরআনিক শব্দাবলী সম্পর্কে একথা বুঝা এবং অন্যদেরকে বুঝানোর চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া যে, বহু শতাব্দী পর্যন্ত ওলামায়ে কেরাম এগুলোর যে মর্মার্থ বুঝে আসছিলেন, তা ভুল অথবা অসম্পূর্ণ ছিল এবং এর নতুন নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করা হাজার গোমরাহী এবং দ্বীনি ফিৎনার মূল ভিত্তি স্থাপন করার শামিল।-২৪

এ রকম মারাত্মক ভুলের কারণ :

আমি এ নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছি যে, মাওলানা মাওদুদী সাহেবের এ রকম মারাত্মক ভুল কেন হলো? অতঃপর আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, তিনি এই বিংশ শতাব্দীতে যখন দেখতে পেলেন যে, রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, এমন কি, কেয়ামত, জান্নাত ও দোযখ ইত্যাদি বিষয়ের চেয়েও রাজনৈতিক ব্যাপারটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, ভারত উপমহাদেশে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পরস্পর বিপরীত ও প্রতিদ্বন্দ্বীমূলক রাজনৈতিক তৎপরতা জোরদার গতিতে চলছে, যেন একটি রাজনৈতিক বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে, সর্বস্তরের লোকজনের মন-মস্তিষ্কে ছেয়ে যায় রাজনৈতিক চিন্তাধারা, এমতাবস্থায় সেই রাজনীতি

২৪. এখানে উল্লেখ থাকে যে, কোরআনের কোন আয়াত অথবা শব্দ সম্পর্কিত কোন নতুন তত্ত্ব বা তথ্য উদঘাটিত করা অথবা গবেষণাপূর্বক নতুন কোন মাসয়ালা বের করা এক কথা, কারণ কোরআনের অলৌকিকতা ও ব্যাপকতা শেষ হবার নয়, আর ইলাহ, রব, দ্বীন ও ইবাদত ইত্যাদির মত মৌলিক পরিভাষাসমূহ এবং '*কলেমায়ে লা-ইলাহা*'র তাৎপর্য কিংবা কোরআনের দাওয়াতে তাওহীদ অথবা সালাত-যাকাত ইত্যাদি পরিভাষা সম্পর্কে এটা দাবী করা যে, কোরআন অবতীর্ণ হবার পরবর্তী শতাব্দীসমূহে এগুলোর মর্মার্থ সঠিকভাবে বুঝা যায় নি এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে যা বয়ান করা হচ্ছে তা-ই সঠিক মর্মার্থ, এটা সম্পূর্ণ অন্য কথা। এর দ্বারা ধর্মদ্রোহীদের জন্য কোরআনের বাতিল-সুলভ বিকৃতির পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

মুখর পরিস্থিতি ও পরিবেশে মাওলানা সাহেব নিজের আন্দোলন ও দাওয়াতকে বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য করে তুলে ধরার লক্ষ্যে 'কলেমায়ে তাওহীদ', 'আক্কীদায়ে তাওহীদ' ও 'ইসলামের' এক আধুনিক ও রাজনৈতিক ব্যাখ্যা প্রদান করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন, যাতে এটাকেই দাওয়াতের মুলভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তাই তিনি এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য আক্কীদায়ে-তাওহীদের সাথে সম্পর্কিত বিশেষ মৌলিক পরিভাষাসমূহের (ইলাহ, রব, দ্বীন ও ইবাদত) উপরোক্ত নতুন রাজনৈতিক ব্যাখ্যা প্রদান করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন।-২৫

এটা বাস্তব সত্য যে, মাওলানা মাওদুদী সাহেব অত্যন্ত মেধাবী ও পরিশ্রমী ছিলেন। তিনি বহু আরবী অভিধান খোঁজাখুঁজি করে এবং কোরআন থেকেও আয়াত বের করে এ সব মৌলিক পরিভাষার নুতন রাজনৈতিক ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক পূর্ণ একটি প্রবন্ধ রচনা করে নিজের নিকট নিজের দাবী প্রমাণিত করে দিয়েছেন। এর সাথে তাঁর একথাও স্মরণে আসে অথবা অন্য কেউ তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, উক্ত মৌলিক পরিভাষাসমূহের তিনি যে মর্মার্থ ব্যক্ত করেছেন, তা পূর্ববর্তী কোন মুফাসসির, কোন হাদীছ-বিশারদ, কোন মুহাক্কেক আলেম অথবা কোন লেখকই ব্যক্ত করেননি বিধায় এই একটি মাত্র কথা-ই আপামর মুসলিম জনতার জন্য মাওদুদী সাহেবের উক্ত দাবী ও ব্যাখ্যাকে অনির্ভরযোগ্য ও অগ্রাহ্য সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট। তাই তিনি তাঁর দাবী ও ব্যাখ্যাকে নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে উপরোক্ত প্রশ্নের সমাধান দেওয়ার জন্য উক্ত প্রবন্ধ অথবা পুস্তিকার শুরুতে একটি দীর্ঘ ভূমিকাও লিখেছেন। (এর বৃহৎ অংশ পূর্বেই উদ্ধৃত করা হয়েছে।) উক্ত ভূমিকার সার কথা হলো, কোরআনের উক্ত চারটি মৌলিক পরিভাষার মর্মার্থ এবং তার দাওয়াতে-তাওহীদের সঠিক অর্থ কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার যুগে সঠিকভাবে অনুধাবন করা গিয়েছিল। কিন্তু, পরবর্তী শতাব্দীসমূহে অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে ঐ সব পরিভাষার অর্থও পরিবর্তিত হতে থাকে। ফলে সেগুলোর মর্মার্থ অত্যন্ত সীমিত ও সংকীর্ণ বরং অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

২৫. উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে উপমহাদেশের জনসাধারণের মনমস্তিষ্কে বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য দর্শন ও ধ্যান-ধারণার প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল। তখন সৈয়দ আহমদ খান কোরআনের তফসীর এবং ইসলামের ব্যাখ্যাকে সে মোতাবেক ঢেলে সাজানোকে ইসলামের খেদমত বলে মনে করলো। তাই এর পেছনে তিনি তাঁর মেধা ও যোগ্যতাকে যথাযথভাবে ব্যয় করেন। যার উৎকৃষ্ট নমুনা হচ্ছে তাঁর 'তফসীরে কোরআন'। মাওলানা মাওদুদী সাহেবও একই দুর্ঘটনার সম্মুখীন হন। ফলে, তিনিও ইসলামের আধুনিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে ছাড়লেন।

এভাবে মাওলানা মাওদুদী সাহেব যেন পাঠকসমাজ ও তাঁর ভক্তদের নিশ্চিত ও আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেন যে, তিনি যে মর্মার্থ ব্যক্ত করেছেন তা-ই সঠিক এবং অন্যান্য তফসীর ও হাদীছ -এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ইত্যাদিতে যে মর্মার্থ ব্যক্ত করা হয়েছে, তা ভুল ও অসম্পূর্ণ অথবা অস্পষ্ট ও সংকীর্ণ। কারণ, উক্ত কিতাবগুলো পরবর্তী শতাব্দীসমূহেই লিখিত হয়েছিল, সে সময় উক্ত পরিভাষাসমূহের মর্মার্থ সঠিকভাবে অনুধাবন করা যেতোনা বরং সংকীর্ণ ও অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

নিঃসন্দেহে এটা একটি ঐতিহাসিক সত্য যে, কোরআনের তাফসীর এবং হাদীছের ব্যাখ্যা ইত্যাদির যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত কিতাব পরবর্তী সে শতাব্দীসমূহেই লেখা হয়েছিল, যে শতাব্দীসমূহে মাওলানা মাওদুদী সাহেবের মতে, ইলাহ, রব, দ্বীন ও ইবাদত-এর মত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক পরিভাষাসমূহের মর্মার্থও সঠিকভাবে অনুধাবন করা যাচ্ছিল না। তফসীরের প্রাচীনতম যে কিতাবটি মুদ্রিত ও প্রচলিত আছে, তা হচ্ছে হাফেজ ইবনে জরীর তাবারীর 'তফসীরে-তাবারী'। এটা হিজরী তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে লিখিত। এ ছাড়া অন্যান্য যে সব তাফসীর-গ্রন্থ নির্ভরযোগ্য বলে ধরা যায়, তা সবগুলোই পরবর্তী শতাব্দীসমূহে লিখিত। যথাঃ ইমাম মুহিউসসুন্নাহ বগভী (রাঃ)-এর 'মাআলেমুত-তানযীল'; আল্লামা আলী ইবনে মুহাম্মদ বাগদাদী (রাঃ)-এর 'লুবাবুত-তাবীল'; ইমাম ইবনে তাইমিয়া'র তফসীর সংক্রান্ত রসায়েলসমূহ (বিশেষ করে তফসীরে সুরায়ে-ইখলাস); হাফেজ ইবনে কাছীর দামেশকী এর 'তাফসীরে ইবনে কাছীর'; ইমাম কুরতুবী, ইমাম রাযী, আবু সাউদ, আল্লামা বয়যাভী ও আল্লামা নসফী প্রমুখের তাফসীরসমূহ ও খতীব শরবীনি (রাঃ)-এর 'আস্সিরাজুল মুনীর' ও পরবর্তী যুগের তফসীরসমূহের মধ্যে রয়েছে, তফসীরে মজহারী, রুহুলমাআনী এবং কাযী শওক্বানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে ফতহুল ক্বদীর'।

তদ্রুপ, হাদীছ শরীফ এর প্রাচীন ব্যাখ্যাগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে, আল্লামা ইবনে আব্দুল বর ও খত্তাবী (রাঃ)-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ এবং পরের যুগের রয়েছে হাফেজ ইবনে হাজর আসকালনী, আল্লামা আইনী ও কুসতুলানী (রাঃ)-এর বোখারী শরীফ এর বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ, ইমাম নববী (রাঃ)-এর মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা ও আল্লামা তীবি (রাঃ)-এর শরহে-মিশকাত। পরবর্তী যুগের আল্লামা আলী কারী (রাঃ)-এর 'মিরকাত', শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দিছে দেহলভী (রাঃ)-এর 'লুমআত' প্রভৃতি সবই সেই পরবর্তী শতাব্দীসমূহেই লিখিত হয়েছে।

এভাবে মুসলিম জাতির বিশিষ্ট ও মোহাক্কেক লেখকগণ প্রায় সবাই পরবর্তী যুগের। যেমন, ইমাম গাজ্জালী (রাঃ), শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, হাফেজ ইবনুল কাইয়ুম ও হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (রাঃ) প্রমুখ বহু পরবর্তী শতাব্দীসমূহেরই ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা তাদের গ্রন্থ ও রচনায় 'তাওহীদের তাৎপর্য' এবং এ পর্যায়ে 'ইলাহ' ও

উলুহিয়্যাত, রব ও রুবুবিয়্যত, ইবাদত ও উবুদিয়্যত' প্রভৃতির অর্থ ও মর্মার্থ সম্পর্কে বিশেষ ও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। কিন্তু উপরোল্লিখিত মুফাসসেরীনে কেরাম ও মুহাদ্দেছীনে-এজাম এর ন্যায় তাঁদের কেউ উক্ত মৌলিক পরিভাষাসমূহের সে ব্যাখ্যা প্রদান করেননি এবং 'তাওহীদের' সে তাৎপর্য বর্ণনা করেননি, যে ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য মাওলানা মাওদুদী সাহেব "কোরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা" নামক স্বীয় পুস্তিকায় ব্যক্ত করেছেন।

সুতরাং, আমার ধারণা মতে, মাওলানা মাওদুদী সাহেব উক্ত মৌলিক পরিভাষাসমূহের এ নতুন রাজনৈতিক অর্থ এবং কোরআনের 'দাওয়াতে তাওহীদের' নুতন রাজনৈতিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, সম-সাময়িক কালের রাজনীতি-আক্রান্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে। বিশেষ করে, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদেরকে সামনে রেখেই তিনি উক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। যেহেতু এ ধরনের ব্যাখ্যা পূর্ববর্তী কোন মুহাদ্দিছ, কোন নির্ভরযোগ্য আলেম বা কোন লেখকই প্রদান করেননি, তাই "কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পরবর্তী শতাব্দীসমূহে উক্ত মৌলিক পরিভাষাসমূহের মর্মার্থ এবং দাওয়াতে তাওহীদের সঠিক দাবী কি, তা সঠিকভাবে বুঝা যায়নি এবং ইসলামী সমাজে যারা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরা সে শব্দসমূহের মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারেননি", একথা বলে সমস্ত মুহাদ্দিছ, মুফাস্সির, আলেম ও লেখকগণকে (বিশেষ করে উক্ত মৌলিক পরিভাষাসমূহ এবং 'দাওয়াতে তাওহীদ' -এর মর্মার্থ অনুধাবন করার ব্যাপারে) অনির্ভরযোগ্য ও অবিশ্বস্ত বলে সাব্যস্ত করলেন। এভাবে, তিনি নিজের জন্য উক্ত পরিভাষাসমূহ এবং কোরআনের 'দাওয়াতে তাওহীদের' উক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করার বৈধতাও আবিষ্কার করে নেন, যা পূর্বে কেউ করেননি।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, মাওলনা মাওদুদী সাহেবকে আমি যতটুকু জানি, তার উপর ভিত্তি করে একথা আমি মনে করি যে, উক্ত বিষয়গুলো লেখার সময় তিনি একথা অনুভব করতে পারেননি, "আমি এই কথাগুলো লিখে ভ্রান্ত ও মুলহেদীনের জন্য দ্বীনকে বিকৃত করার মাধ্যমে ফিৎনা সৃষ্টি করার কেমন দ্বার উন্মুক্ত করে দিচ্ছি এবং স্যার সৈয়দ আহমদ, মওলবী আবদুল্লাহ চকড়ালভী, আল্লামা এনায়েতুল্লাহ মাশরেকী ও গোলাম আহমদ পারভেজ সাহেবদের মত মুলহেদীনদের জন্য (ধর্মদ্রোহিতামূলক) ধর্ম বিকৃতির কত বড় 'বৈধতা-সনদ' এর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

আমার সু-ধারণা যদি সঠিক হয়, তাহলে, পুরানো সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে মাওলানা মাওদুদী সাহেবের নিকট আমার একান্ত আরজ, তিনি যেন তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করার কথা ঘোষণা করে নিজেই সে ফিৎনার দ্বার বন্ধ করে দেন। (আল্লাহই তাওফীক দানকারী)

একটি জরুরী ঘোষণা :

এখানে উল্লেখ থাকে যে, দ্বীনে-ইসলামের উক্ত মৌলিক পরিভাষাসমূহে এবং আক্বীদায়ে তাওহীদের এই আধুনিক রাজনৈতিক ব্যাখ্যা প্রদানের কারণে দ্বীনের মধ্যে যে গভীর ও সুদূরপ্রসারী তত্ত্বগত বিকৃতি এবং এর রূহ ও মুলতত্ত্ব এবং দর্শনের মধ্যে যে অসাধারণ পরিবর্তন সাধিত হয় এবং এর মুল লক্ষ্যও বদলে যায়, সে প্রসঙ্গে কোন আলোচনাই এখানে করা হয়নি। কারণ, এ বিষয়ে অন্যান্য লেখকেরা যথেষ্ট পরিমাণ লিখেছেন। বিশেষ করে, মাওলানা ওহীদুদ্দীন খান সাহেব 'দ্বীন কি সিয়াসী তা'বীর' বা 'ধর্মের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা' নামক গ্রন্থে এর উপর যে আলোকপাত করেছেন, সুষ্ঠু বিবেক সম্পন্ন লোকদের জন্য তা-ই যথেষ্ট। যদি কখনো প্রয়োজন পড়ে, তখন সবিস্তারে লিখবো, ইনশাআল্লাহ।

ربنالاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنامن لدنك رحمة

انك انت الوهاب، (القران)

দ্বিতীয় মারাত্মক ভুল

ধর্মীয় কাজে "হিকমতে আমলীর" দর্শন

এ বিষয়টি যথাযথভাবে অনুধাবন করার জন্য অন্ততঃপক্ষে প্রয়োজনীয় পটভূমি উল্লেখ করা আবশ্যক বলে মনে করি।

জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠিত হবার সময় বরং তারও আগে থেকেই মাওলানা মাওদুদী সাহেবের লেখাসমূহে শরীয়তের পাবন্দীর ব্যাপারে এমন কঠোরতা পরিলক্ষিত হয়ে আসছিল, যার কারণে কোন কোন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি তাঁকে "খারেজী মতবাদের" অনুসারী বলেও অভিযোগ করতেন।-২৬

কিন্তু স্বয়ং মাওলানা মাওদুদী সাহেব এবং আমরাও এই 'কঠোরতার' কারণ ব্যাখ্যা করতাম এ ভাবে যে, "এটা হচ্ছে দাওয়াতের ভাষা, ফেকাহ্ বা ফত্ওয়ার ভাষা নয়"। শরীয়ত ও সুন্নাহর অনুসরণের ব্যাপারে তাঁর চরমপ্রিয়তার (অথবা চরম কঠোরতা প্রদর্শনের) অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি হযরত মুজাদ্দিদে আলফে-ছানী ও হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রাঃ)-এর সংস্কার ও নবায়নমূলক (তাজদীদী ও ইসলাহী) কার্যাবলীর মধ্যেও নিজস্ব দৃষ্টিকোণে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভুল-ভ্রান্তি দেখতে পেতেন আর তা প্রকাশ্যভাবে ব্যক্তও করতেন। আগেও যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে, জামায়াতে ইসলামীর সংবিধানের ৮নং ধারায় 'প্রথম শ্রেণীর' সদস্যদের সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে লেখা হয়েছিল, "শরীয়তের বিধি-বিধানের পাবন্দীর ব্যাপারে তাঁদের জন্য কোন প্রকারের প্রশ্রয় থাকবে না। তাঁদেরকে মুসলমানদের জিন্দেগীর পূর্ণ নমুনা পেশ করতে হবে। তাদের জন্য 'রুখসত' -এর স্থলে 'আযীমত'-এর নীতিই আইন বলে গণ্য হবে।"

আর একথাও বার বার লেখা ও বলা হতো যে, আমরা যে কাজ নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছি, আসলে তা আম্বিয়ায়ে-কেরামের কাজ। তাই এর পন্থা ও পদ্ধতিও তা-ই হবে, যা আম্বিয়ায়ে কেরাম অবলম্বন করেছিলেন। সুতরাং এর কর্ম-পদ্ধতিতে আম্বিয়ায়ে কেরামের নীতিই অবলম্বন করতে হবে এবং (এর কর্মীদের) শরীয়তের বিধি-বিধানের সম্পূর্ণ পাবন্দী করতে হবে।

জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা হওয়ার অল্পদিন পরেই মাওলানা মাওদুদী সাহেব আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে "ইসলামী হুকুমত কিভাবে কায়েম হয়" শিরোনামের একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। উক্ত প্রবন্ধেও একথা অত্যন্ত স্পষ্ট ও দৃঢ়তার সাথে ব্যক্ত করা হয়েছিল। (তখন মাওলানা মাওদুদী সাহেবের আহবানে আমি মাওলানা আলী মিয়া ও মাওলানা সিবগতুল্লাহ বখতিয়ারী সাহেবসহ আলীগড় গিয়েছিলাম এবং আমরা তাঁর সাথে অবস্থান করছিলাম।)

---

২৬. খারেজীদের মতবাদ ছিল এই যে, কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তি মুসলমান থাকে না। বরং সে ইসলাম ধর্ম থেকে বহির্ভুত হয়ে অকাট্যভাবে কাফির ও জাহান্নামী হয়ে যায়।

সারকথা, এ সময় তাঁর লেখাসমূহে এ কথার উপর অত্যন্ত জোর দেওয়া হতো এবং তা বার বার উল্লেখ করা হতো। এর দ্বারা তৎকালীন মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলন বিশেষভাবে আক্রান্ত হতো, যা মূলতঃ ইসলামের নামেই চলছিল, কিন্তু ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধানের পাবন্দী করার কথা তাদের কেউ চিন্তাও করতো না।

(কেউ যদি মাওলানা মাওদুদী সাহেবের এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় লেখা একত্রিতভাবে দেখতে আগ্রহী হন, তবে তিনি ডক্টর এসরার আহমদ সাহেব লিখিত "জামায়াতে ইসলামী আন্দোলন" নামক বইটা দেখতে পারেন। সামনে গিয়ে আমিও দু' একটা উদ্ধৃতি পেশ করবো।)

সম-সাময়িক কালে ভারতীয় মুসলমানগণ সাধারণতঃ দু'টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রথম গ্রুপ মনে করতো, ভারতীয় মুসলমানদের সমষ্টিগত স্বার্থ রক্ষার খাতিরে এটাই ভাল হবে যে, স্বাধীনতা অর্জনের পরও ভারত একটি (অখন্ড) রাষ্ট্রই থাকবে। প্রদেশসমূহ স্বায়ত্তশাসিত সরকার দ্বারা পরিচালিত হবে। কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হবে গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে। রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার জন্য পররাষ্ট্রনীতি ও যোগাযোগ-বিষয়ক ৩/৪টি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। উক্ত গ্রুপে 'জমিয়াতে ওলামায়ে-হিন্দ' ও 'মজলিসে আহরার'-এর মত রাজনৈতিক দলসমূহ অন্তর্ভূক্ত ছিল। উভয় দলের নেতৃত্ব ছিল ওলামায়ে-কেরাম ও দ্বীনদার ব্যক্তিদের হাতে। তাঁদের ধারণা ছিল যে, এমতাবস্থায় ভারতের যে পাঁচটি প্রদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলোতে মুসলমানরাই হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক ক্ষমতা থাকবে তাদের হাতে। আর অন্যান্য যে সব প্রদেশে মুসলমানগণ সংখ্যায় কম, (যেমন : উত্তর প্রদেশ, বিহার ইত্যাদি) সেখানেও মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের দয়া ও করুণার উপর ভরসা করে থাকবে না; বরং তাদের জন্য আইনগত নিরাপত্তা থাকবে। এ গ্রুপের সাথে যারা জড়িত ছিলেন তাঁরা 'খেলাফত আন্দোলনের' যুগ থেকে অবিচ্ছিন্নভাবে আযাদী আন্দোলনে শরীক ছিলেন এবং তাঁদের ইতিহাস ছিল কোরবানী ও আত্মত্যাগের ইতিহাস। তাই এ বিষয়ে তাঁরা পূর্ণ আশাবাদী ও আত্মবিশ্বাসী ছিলেন।

অপরদিকে দ্বিতীয় গ্রুপে ছিল মুসলিম লীগ। তাদের দাবী ও কাম্য ছিল ভারত বিভক্ত হয়ে যাক। অর্থাৎ যেসব অঞ্চলে মুসলমানরাই সংখ্যায় বেশী সেসব অঞ্চল ভারত থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র (পাকিস্তান) গঠিত হবে এবং সেখানে 'ইসলামী হুকুমত' চালু হবে।

মুসলিম লীগের নেতৃত্ব যদিও ওলামায়ে কেরাম ও দ্বীনদার লোকদের হাতে ছিল না (বরং এর প্রধান নেতার কর্মজীবনের সাথেও ধর্ম ও শরীয়তের কোন সম্পর্কই ছিল না।)

তবুও 'মুসলমানদের হুকুমত' ও 'ইসলামী হুকুমত'-এর শ্লোগানে সর্বশ্রেণীর মুসলমানদের জন্য ছিল বিশেষ আকর্ষণ। ফলে, মুসলমানদের অধিকাংশ লোকই 'পাকিস্তান দাবীর' পক্ষে সার্বিক সমর্থন দান ও সহযোগিতা করেছিল। আসলে এর পেছনে হিন্দুদের 'সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির' তিক্ত অভিজ্ঞতাই অধিক সক্রিয় ছিল।

মাওলানা মাওদুদী সাহেব এবং জামায়াতে ইসলামী তখন যে ভুমিকা পালন করেছিল, তা উভয় গ্রুপের সাথে কেবল বিচ্ছিন্নতামূলকই ছিল না, বরং তা ছিল কঠোর বিরোধিতামূলক। মাওলানা মাওদুদী সাহেব উভয় গ্রুপের বিরুদ্ধে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে সমালোচনা করে একথা দেখিয়েছিলেন যে, উক্ত গ্রুপ দু'টি যে পথে অগ্রসর হচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে ইসলাম বিরোধী। বরং ইসলামের মহৎ লক্ষ্য ও আদর্শের জন্য ধ্বংসাত্মক। মাওলানা মাওদুদী সাহেব প্রথম গ্রুপ ('জমিয়াতে ওলামায়ে হিন্দ' প্রভৃতি)-এর সমালোচনা-কার্য জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা করার আগেই শেষ করে নিয়েছিলেন। জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠার পর তাঁর সমালোচনার প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয়েছিল মুসলিম লীগ ও তার নেতৃত্ব। তিনি এ পর্যায়ে যে সব বিষয়ের উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন, তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, 'ইসলামী হুকুমত' ইসলামী পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। মুসলিম লীগের আন্দোলনের গাড়ীও অনৈসলামী পথে পরিচালিত হচ্ছে, তার ফলে যদি মুসলমানদের কোন হুকুমত প্রতিষ্ঠাও হয়ে যায়, তবুও সেটা কখনো "ইসলামী হুকুমত" হবে না। বরং "ইসলামী হুকুমত" ও "ইসলামী বিপ্লব" বাস্তবায়নে উক্ত হুকুমত অমুসলিম হুকুমত-এর চেয়ে অধিক বাধা ও সমস্যার সৃষ্টি করবে।

এ পর্যায়ে তাঁর অন্ততঃ দু'তিনটা উদ্ধৃতি এখানে পেশ করা প্রয়োজন মনে করছি। এই উদ্ধৃতিসমূহ ভালভাবে অধ্যয়ন করার পর 'ধর্মীয় কর্ম-কৌশলের' (দ্বীনি হিকমতে আমলী) তাঁর প্রদত্ত দর্শন (ফলসফা)-এর পটভূমি সঠিকভাবে অনুধাবন করা যাবে।

১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে টুংক (রাজস্থান) নামক স্থানে জামায়াতে ইসলামীর এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত সম্মেলনে জনৈক ব্যক্তির পক্ষ থেকে দু'টি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছিল। প্রশ্নকারী একথা মেনে নিয়েই প্রশ্ন করেছিলেন যে, মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলন এবং তাদের কর্মসূচী অনৈসলামী। তন্মধ্যে তাঁর দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল এই যে, "বর্তমানে বৃটিশ সরকার ভারতের শাসনভার ভারতীয়দের হাতে অর্পণ করছেন। এর দু'টি পদ্ধতি রয়েছে : প্রথমটি হলো, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলো হিন্দুদের হাতে সোপর্দ করা এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলো মুসলমানদের হাতে সোপর্দ করা। দ্বিতীয়টি হলো, সমগ্র ভারতের শাসনভার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের হাতে সোপর্দ করা। সুতরাং এমতাবস্থায় আপনি যদি মুসলিম লীগের সহযোগিতা না করেন, তবে এ কথা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠরাই সমগ্র ভারত এবং সমস্ত মুসলমানের উপর প্রভাব-প্রতিপত্তি ও আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হবে।"

জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মাওদুদী সাহেবের পক্ষ থেকে এর উত্তরে বলা হয়েছিল যে, "উক্ত প্রশ্নদ্বয়ের যে সুস্পষ্ট সারমর্ম বুঝা যাচ্ছে, তা হলো এই যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে মুসলমানদের উক্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সহযোগিতা করা এবং এ পরিস্থিতির অবসান ঘটলে পুনরায় তাদের সাথে সহযোগিতার বন্ধন ছিন্ন করা। কারণ, প্রশ্নকারী নিজেই মেনে নিয়েছেন যে, এই আন্দোলন অনৈসলামী।........

অপনি যখন নিজেই একটা আন্দোলনকে অনৈসলামী বলে মেনে নিয়েছেন, তখন কোন্ মুখে একজন মুসলমানের নিকট দাবী করছেন, উক্ত আন্দোলনের সাথে সহযোগিতা করার?................."

উত্তরের শেষভাগে বলা হয়েছিল যে–

"ইসলামী আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন উভয়টি একই সাথে করা যায় না। কোন লোক যদি ইসলাম ও ইসলামী কর্মপদ্ধতিকে নিজ প্রবৃত্তির পরিপন্থী পেয়ে সেগুলো পরিহার করে চলতে চায় তবে বাঁকা পথে আসার পরিবর্তে পরিষ্কার ভাষায় সে বলে দেয়না কেন যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের কাজ-কর্ম বাদ দিয়ে আমার মনগড়া কাজে অংশগ্রহণ করুন।" ("জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী")

মাওলানা মাওদুদী সাহেব কর্তৃক লিখিত "ইসলামী হুকুমত কিভাবে কায়েম হয়" নামক একটি প্রবন্ধের কথা একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন–

"কোন কোন ব্যক্তি এ ধারণা ব্যক্ত করে যে, প্রথমে অনৈসলামিক পদ্ধতিতে মুসলমানদের জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলে পরে আস্তে আস্তে শিক্ষা-দীক্ষা ও চারিত্রিক বিষয়াবলীর সংশোধনের মাধ্যমে সেটাকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করা যায়। কিন্তু, আমি ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে যতটুকু অধ্যয়ন করেছি, তার উপর ভিত্তি করে বলতে পারি যে, তা কখনো সম্ভব হতে পারে না।........ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রাঃ)-এর মত একজন প্রভাবশালী শাসক, যাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈনদের এক বিরাট জামাত ছিলেন, তিনিও এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহে ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ তৎকালীন সামাজিক পরিবেশ তাঁর সেই সংস্কারকে সামগ্রিকভাবে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। ...... তাই বর্তমানে আমি একথা বুঝে উঠতে পারছিনা, যে জাতীয় রাষ্ট্রটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত হবে, সে রাষ্ট্রটি এই মৌলিক সংস্কারের জন্য শেষ পর্যন্ত কিভাবে সহায়ক হবে।"

"গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় নেতৃত্ব তারাই লাভ করতে পারে, যারা ভোটারদের সমর্থন লাভ করে। ভোটারদের মধ্যে যদি ইসলামী মন-মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনা না থাকে, তারা যদি সঠিক ইসলামী চরিত্রের প্রেমিক না হয়, তারা যদি সে কঠোর ন্যায়-

পরায়ণতা ও চাকচিক্যহীন মুলনীতিসমূহকে মাথা পেতে মেনে নিতে প্রস্তুত না হয়, যে সবের উপর ভিত্তি করেই ইসলামী হুকুমত পরিচালিত হয়, তবে তাদের ভোটে কখনো 'মুসলমান' ধরনের লোক নির্বাচিত হয়ে সংসদে আসতে পারে না। উক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে নেতৃত্ব একমাত্র তারাই লাভ করতে পারে, যারা 'আদম শুমারীর তালিকা' মতে মুসলমান হলেও চিন্তা-চেতনা ও কর্মের দিক দিয়ে যাদের গায়ে ইসলামের হাওয়াও লাগেনি। এ ধরনের ব্যক্তিদের হাতে ক্ষমতা চলে যাবার অর্থ এই যে, আমরা সে অবস্থানেই রয়ে গেলাম যেখানে অমুসলিমদের শাসনামলে ছিলাম। বরং অধিক নিকৃষ্ট অবস্থানে নেমে গেলাম। কেননা, যে জাতীয় সরকারের হুকুমতের গায়ে ইসলামের লেবেল লাগানো থাকে, সে হুকুমত 'ইসলামী বিপ্লব'-এর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে অমুসলিম হুকুমতের তুলনায় অধিক দৌরাত্ম্য প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়।"

–(ইসলামী হুকুমত কিভাবে কায়েম হয়)

(পাঠকগণের নিকট অনুরোধ করছি, আপনারা মাওলানা মাওদুদী সাহেবের উল্লেখিত উদ্ধৃতিটা আরেকবার পাঠ করে নিন।)

এ পর্যায়ের আরেকটি উদ্ধৃতি পাঠ করলে ভাল হবে মনে করি। ১৯৪৭ সালে পাটনায় জামায়াতে ইসলামীর একটি সম্মেলন হয়েছিল। উক্ত সম্মেলনে জামায়াতে ইসলামীর প্রভাবশালী সদস্য ও মুখপাত্র জনাব মালেক নসরুল্লাহ খাঁ আজীজ সাহেব জামায়াতে ইসলামীর দৃষ্টিভঙ্গী, ভূমিকা ও কর্মনীতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছিলেন–

"আপনি যদি সত্যিই ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হন তা হলে, প্রথমে নিজকে এবং নিজের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মন-মানসিকতাকে পরিবর্তন করুন। তাদের মন-মানসিকতা তাদের দৈহিক আচরণসমূহকে পরিবর্তন করবে। অতঃপর তারা তাদের বসবাসরত পরিবার, ঘর-বাড়ী, গ্রাম ও শহরকে পরিবর্তন করবেন। তাদের আকার-আকৃতি, চাল-চলন, লেন-দেন, পারস্পরিক সম্পর্ক, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সাংসারিক জীবন, সংস্কৃতি সব কিছুতে পরিবর্তন সাধিত হবে। ফলে, এমন একটা সমাজ এবং এমন একটা দল তৈরী হবে, যেখানে অন্য কোন মতাদর্শ বাস্তবায়ন করা অসম্ভব ও দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে এবং সেই ইসলামী শাসন বাস্তবায়িত হবে, যার সব কিছু হবে 'ইসলামী' এবং যার আপাদমস্তক হবে 'ইসলাম'। আবহমানকাল থেকে ইসলামী হুকুমত এভাবেই কায়েম হয়ে আসছে এবং আগামীতে কখনো কায়েম হলে এভাবেই কায়েম হবে। যারা উক্ত পদ্ধতি ভিন্ন অন্য কোন পদ্ধতিকে ইসলামী হুকুমত বাস্তবায়নের মাধ্যম বলে মনে করে, তারা একান্ত ধোকায় রয়েছে। আমরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, যাতে তাদের সেই ধোকা সমূলে উৎখাত করা যায়।" (জামায়াতে ইসলামীর কার্য-বিবরণী) –(জামায়াতে ইসলামী আন্দোলন -ডাঃ এসরার আহমদ)

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত স্থির হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মাওলানা মাওদুদী সাহেব ও জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা তা-ই ছিল, যা উপরোল্লিখিত উদ্ধৃতিসমূহের মাধ্যমে জানা যায়। এতে তিনি সম্পূর্ণ অটল ও অবিচল ছিলেন। পরে যখন দেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত স্থির হয় এবং পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন স্বয়ং মাওলানা

মাওদুদী সাহেব ও তাঁর সহযোগী বন্ধু-বান্ধবগণ এবং জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় দফতর (যেটা গুরুদাসপুর জেলায় অবস্থিত ছিল) পাকিস্তানে (লাহোর) স্থানান্তরিত হয়ে যায়।

অতঃপর সমকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মাওলানা মাওদুদী সাহেবের চিন্তাধারা ও রীতি-নীতি পরিবর্তন হতে থাকে। পূর্ববর্তী বছরসমূহে শত শত পৃষ্ঠায় তিনি যা কিছু লিখেছিলেন, তা সবই জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে ভুলে গিয়ে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন যে, 'ইসলাম' এবং 'ইসলামী হুকুমত' -এর শ্লোগানের জোরে মুসলিম লীগ যেমন নির্বাচনী যুদ্ধে জমিয়তে ওলামা ও মজলিসে ইহরার-এর মত রাজনৈতিক দলের মোকাবেলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করে 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠা করে; তেমনিভাবে আমরাও 'ইসলামী শাসন ব্যবস্থা', ইক্বামতে দ্বীন' ও 'হুকুমতে ইলাহীয়্যার' নামে নির্বাচনে মুসলমানদের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করতে পারি। এভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আমাদের হাতে চলে আসার পর আমরা সঠিক অর্থে সেটাকে 'ইসলামী হুকুমত' হিসেবে গড়ে তুলবো। অতএব, সে আশায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই প্রাথমিক পর্যায়ে এটাও ঠিক করা হয় যে, আমরা ইসলামী বিধি-বিধান ও কর্ম-পদ্ধতির অনুসরণপূর্বকই নির্বাচনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হবো এবং আমরা এটাও দেখাবো যে, নির্বাচনী যুদ্ধে ইসলামী আহকামের পাবন্দীপূর্বক কিভাবে অবতীর্ণ হওয়া যায়।-২৭

আমরা জানতে পেরেছিলাম, এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম এ সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়েছিল যে, যেহেতু হুকুমত তথা প্রশাসনিক দায়িত্ব ও পদমর্যাদা সম্পর্কে রসূল-করীম (সঃ)-এর নির্দেশ এবং শরীয়তের মূলনীতি হচ্ছে, "তালিবুল ওয়ালায়তে লা য়্যুওয়াল্লা"। অর্থাৎ–যে ব্যক্তি প্রশাসনিক দায়িত্ব বা পদের জন্য আবেদন ও আকাংখা প্রকাশ করবে তাকে সে দায়িত্ব বা পদ কখনো দেওয়া যাবে না। সুতরাং সর্বসাধারণকে বলা হবে যে, তারা যেন এমন কোন ব্যক্তিকে ভোট না দেন, যে পার্লামেন্ট বা সংসদের সদস্য পদ লাভ করার জন্য নিজেই প্রার্থী বা আবেদনকারী হয়। বরং প্রত্যেক এলাকায় জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ এলাকার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য একজন যোগ্য এবং দ্বীনদার ব্যক্তিকে নিজেরাই মনোনীত করবেন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য তাঁর কাছে আবেদন করবেন এবং তাঁকে বিজয়ী করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

---

২৭. আশ্চর্যের ব্যাপার যে, এই প্রকাশ্য বাস্তবকে (যা অন্ধদেরও দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভব) উপেক্ষা করার জন্য কিভাবে তিনি নিজকে প্রস্তুত করেছিলেন যে, পাকিস্তানের যে সমস্ত জনসাধারণের ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচনে জয়-পরাজয়ের ফয়সালা হওয়ার কথা, তাদের অধিকাংশই ছিল সে সব লোক, যারা মাওলানা মাওদুদীর বিশেষ পরিভাষায় বংশগত এবং আদম শুমারীর তালিকা মতে মুসলমান। তাদের প্রায় লোক নামায ও যাকাতের মত বুনিয়াদী ফরজ অনাদায়কারী, ফাসেক-ফাজের ছিল এবং তাদের মধ্যে মুলহেদ ও কাদীয়ানীরাও ছিল বেশ কিছু সংখ্যক। তাদের প্রত্যেকের ভোট এবং একজন সৎ আলেম ও মুত্তাকী এবং স্বয়ং মাওলানা মাওদুদীর ভোটের মধ্যে কোন ব্যবধান ছিল না। হায়! কোথায় মাপকাঠি ও আদর্শের সেই উন্নতি এবং কোথায় এই অবনতি! "এতে নিশ্চয় চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের জন্য বিরাট শিক্ষা রয়েছে।"

এ বিষয়েও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল যে, এমন কোন দলের সাথে নির্বাচনী সমঝোতাও করা যাবে না, যে দল নির্বাচনী ময়দানে এসব মূলনীতি এবং শরীয়তের অন্যান্য বিধি-বিধান ও নির্দেশাবলীর পাবন্দী করবে না।

অতঃপর উল্লেখিত নীলনক্শা ও পরিকল্পনা মোতাবেক কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে নির্বাচনে দাঁড় করানো হয় এবং এটাকে 'ইক্বামতে দ্বীন' ও 'ইসলামী নেজাম' প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' আখ্যায়িত করে নিজের যাবতীয় মাধ্যম, মেধা, বক্তৃতা ও লেখনীর পূর্ণ যোগ্যতা ও শক্তি এর পেছনে ব্যয় করা হয়। কিন্তু ফলাফলে আশ্চর্যজনকভাবে ব্যর্থ হয়। যা ছিল একেবারেই কল্পনাতীত। বলতে পারেন, ফলাফলে 'শুন্যই' তাদের ভাগে পড়েছিল।

পরবর্তীতে দ্বিতীয়বার যখন নির্বাচনের সময় আসে, (সম্ভবতঃ সেটা সামরিক শাসন জারী হওয়ার ফলে অনুষ্ঠিত হতে পারেনি) তখন মাওলানা মাওদুদী সাহেব এবং তাঁর দল পূর্ববর্তী নির্বাচনে পরাজয়মূলক অভিজ্ঞতার দাবী ও চাহিদানুযায়ী নিজেদের নীতি ও কর্মপদ্ধতিতে (যে সব নীতি দ্বীন ও শরীয়তের আলোকে গ্রহণ করা হয়েছিল।) পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ফলে অন্যান্য রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে 'নির্বাচনী সমঝোতা'র ব্যাপারে পূর্ববর্তী নির্বাচনের সময় যে কঠোর নীতি অবলম্বন করা হয়েছিল এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে আবশ্যক বলে সাব্যস্ত করা হয়েছিল, তা পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

নির্বাচনের মাধ্যমে প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব লাভ করার এ নীতির পর্যায়ে আরো এমন সব সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, যেগুলো শরীয়তের মূলনীতি ও আহকাম এবং ভারত বিভাগের আগে থেকে স্বয়ং মাওলানা মাওদুদী সাহেব এবং তাঁর দল যে নীতি গ্রহণ করে তাকেই 'দ্বীন' বলে সাব্যস্ত করেছিল; তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল।

নীতির এই পরিবর্তন এবং নির্বাচনী যুদ্ধের একটি ফল এটাও হয়েছিল যে, জামায়াতে ইসলামীর প্রকৃতি ও ভাবধারা দ্বীনের ধারক–বাহক ও আহবায়ক জামাতের পরিবর্তে সাধারণ রাজনৈতিক দলের রূপ ধারণ করে এবং এই দলে সেসব লোকই ভীড় জমাতে থাকে, যাদের জন্য উক্ত প্রকৃতিতে বিশেষ আকর্ষণ ছিল।

জামায়াতে ইসলামীর সেসব নিষ্ঠাবান সদস্য, যাদেরকে জামায়াতের প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক কালের দ্বীনি দাওয়াতই আকৃষ্ট করেছিল এবং যারা এ আশায় জামায়াতে যোগ দিয়েছিলেন যে, জামায়াতে ইসলামীর মাধ্যমে দ্বীনের পুনর্জাগরণ ও ইকামতে দ্বীনের চেষ্টা-প্রচেষ্টা অবিকল আম্বিয়ায়ে কেরামের নীতিতেই সম্পাদিত হবে, তাঁরাও কিছুদূর পর্যন্ত (সম্ভবতঃ সুধারণার ভিত্তিতে) নীতির এই পরিবর্তন সাধনের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছিলেন। কিন্তু, যখন নীতি, মত ও প্রকৃতির পরিবর্তন পরিষ্কারভাবে তাঁদের

কাছে ধরা পড়ে, তখন তারা সেই নীতি ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তখন থেকেই জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে সে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়, যার আলোচনা পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাসমূহে "আমার সাহচর্যের ইতিবৃত্তের" পর্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে। এ পর্যায়ে এসেই মাওলানা মাওদুদী সাহেব জামায়াতে ইসলামীর সামনে 'ধর্মীয় কাজে হিকমতে আমলীর দর্শন' পেশ করেন। এর সার কথা ছিল, 'ইকামতে দ্বীন' বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার মত বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা-প্রচেষ্টার পর্যায়ে, যদি শরীয়ত-পরিপন্থী কোন কাজ করতে হয়, তবে স্বয়ং শরীয়তেই এর অবকাশ রয়েছে।

একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, এ বিষয়টি কত ভয়ংকর ছিল এবং উচ্চাভিলাষী রাজনৈতিক নেতাদের জন্য এর কারণে ধর্মের মধ্যে ফিৎনার কত বড় দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছিল! কিন্তু মাওলানা মাওদুদী সাহেব স্বীয় মেধা ও কলমের জোরে তাঁর প্রদত্ত দর্শনকে শরীয়তের দলীল দ্বারা প্রমাণিত করার প্রয়াস চালান।

মাওলানা মাওদুদী সাহেব "দ্বীনি হিকমতে আমলীর" (বা ধর্মীয় কর্মকৌশলের) উক্ত দর্শনের বিরুদ্ধে (যতটুকু আমার জানা আছে) সর্বপ্রথম কলম ধরেন, তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু ও জামায়াতে ইসলামীর মজলিসে শুরার বিশিষ্ট সদস্য জনাব মাওলানা হাকীম আবদুর রহীম আশরাফ সাহেব। তিনি স্বীয় সম্পাদিত লায়েলপুর থেকে প্রকাশিত "সাপ্তাহিক আল-মুনীর" পত্রিকায় "দ্বীন কো তাহরীক সমঝনে কি হালাকত আফরিনীয়া" (ধর্মকে আন্দোলন মনে করার ধ্বংসত্মাক পরিণতি) শিরোনামে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে এর সুবিস্তৃত সমালোচনা পেশ করেন। পরবর্তী সময়ে উক্ত প্রবন্ধটি মাওলবী আতিকুর রহমান সাহেব লিখিত একটি বিস্তারিত ভুমিকা এবং শেষের দিকে ৬/৭ পৃষ্ঠার টীকা সহকারে "আল-ফুরকান' পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছিল এবং আল-ফুরকানের ২৪ পৃষ্ঠাব্যাপী এটা বিস্তৃত ছিল (রমজান,৭৭হিঃ সংখ্যা)। তখন মাসিক আল-ফুরকান পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব কার্যতঃ মাওলবী আতীকুর রহমান সাহেবের হাতেই ছিল।

এর পরে মাওলানা মাওদুদী সাহেব "আল-ফুরকান" ও "আল-মুনীর" পত্রিকা-দ্বয়ের উক্ত প্রবন্ধের (বলতে পারেন) জওয়াব দিতে গিয়ে আরো একটি লেখা মাসিক 'তরজুমান' মে-৫৮ইং সংখ্যায় প্রকাশ করেছিলেন। উক্ত লেখায় তিনি "হিকমতে আমলীর" স্বীয় দর্শনকে প্রমাণিত করতে গিয়ে কোরআন, হাদীছ ও সাহাবায়ে কেরামের কার্যাবলী থেকে গণনা করে ৯/১০ টি দলীল পেশ করেন। উদাহরণস্বরূপ পবিত্র কোরআনে 'ইকরাহ' বা বাধ্য করার কারণে মুখে কলেমায়ে কুফর বা কুফরী শব্দ উচ্চারণ করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে তদ্রুপ অপারগ অবস্থায় মৃত জন্তুর গোশত ভক্ষন করার (বরং শুকরের গোশত ভক্ষণ করারও) অনুমতি দেওয়া হয়েছে, ইত্যাদি।

মেধা, ভাষা ও কলমের শক্তি মহান আল্লাহর বড় নেয়ামত। কিন্তু, আল্লাহ তাআলার হেফাজত বা অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণ না থাকলে এগুলো বিরাট ফিৎনা ও লাখ-লাখ

মানুষের গোমরাহীরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মাওলানা মাওদুদী সাহেবের এ লেখাটি তার একটি বিরাট শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। বিশেষ করে রাজনৈতিক দলসমূহ 'ইসলাম' ও 'ইসলামী হুকুমতের' নাম ব্যবহার করে মাওলানা মাওদুদী সাহেবের উক্ত দলীলসমূহের আলোকে নিজ নিজ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা-প্রচেষ্টার পথে যে কোন হারামকে হালাল সাব্যস্ত করে ব্যবহার করতে পারতো।

মওলবী আতিকুর রহমান সাহেব মাওলানা মাওদুদী সাহেবের উক্ত লেখাটি চুল চেরা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করার পর মাওলানা মাওদুদী সাহেবের দলীল কিংবা ভুল ধারণাসমূহের স্বরূপ উদ্ঘাটন করার প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি করেন। তাই তিনি "দ্বীন মে হিকমতে আমলী কা মকাম" (বা ধর্মে কর্ম-কৌশলের স্থান) শিরোনামে সমালোচনামূলক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে মাসিক আল-ফুরকানে পর পর চারটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। (জিল্‌হজ্জ, মুহররম, সফর ও রবিউল আউয়াল-৭৭ হিঃ সংখ্যা) লেখাটি আল-ফুরকানের (৪ সংখ্যায়) সর্বমোট ৮৪ পৃষ্ঠাব্যাপী বিস্তৃত ছিল।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, উক্ত লেখায় মাওলানা মাওদুদী সাহেবের দলীলসমূহের বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও উত্তর প্রদান ব্যতীত তাঁর দাবীর অসারতা ও ধর্মবিরোধী হওয়ার বিষয়টি কোরআন-হাদীছ ও 'তাআমুলে সাহাবা' (বা সাহাবায়ে কেরামের কার্য পদ্ধতি) দ্বারা প্রমাণিত করা হয়েছিল।

মাওলানা মাওদুদী সাহেব একটি প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ মৌলভী আতিকুর রহমান সাহেবের উক্ত লেখার জওয়াব মাসিক 'তরজুমানুল কোরআনে" প্রকাশ করেন। (এর শিরোনামও ছিল "দ্বীন মে হিকমত আমলী কা মকাম"। মওলভী আতিকুর রহমান সাহেব এই জওয়াবী লেখাটিও স্বীয় 'প্রত্যুত্তর' -এর সাথে আল-ফুরকান পত্রিকায় হুবহু প্রকাশ করেছিলেন। (জুমাদাল উখরা-৭৮ হিঃ সংখ্যা) এরপর এ সংক্রান্ত মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী সাহেবের একটি লেখাও মাসিক আল-ফুরকানে প্রকাশিত হয়েছিল। এটা ছিল প্রায় ৪০/৫০ পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধ।

তখনকার সময়ে এতদ্‌সংক্রান্ত যেসব লেখা মাসিক আল-ফুরকানে প্রকাশিত হয়েছিল, সবগুলো যদি একত্রিত করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয়, তবে আনুমানিক ২৫০/৩০০ (আড়াইশ/তিনশো) পৃষ্ঠার একটি পুস্তক হবে।

মাওলানা হাকীম আব্দুর রহীম আশরফ সাহেব ও মওলবী আতিকুর রহমান সাহেবের এতদসংক্রান্ত লেখাসমূহে মৌলিকভাবে এ আশংকাই প্রকাশ করা হয়েছিল যে, যদি মাওলানা মাওদুদী সাহেবের "হিকমতে আমলীর" উক্ত দর্শন এবং তাঁর দলীলসমূহ মেনে নেওয়া হয়, তবে "ইক্কামতে দ্বীন"-এর চেষ্টা-প্রচেষ্টার নামে শরীয়তের সর্বসম্মত বিধি-বিধান ও সীমা-পরিসীমাকে ধুলিস্মাৎ করে দেওয়ার দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে। যে সব কাজ আল্লাহ ও তাঁর রসূল হারাম করে দিয়েছেন,

সেগুলোকে 'ইক্কামতে দ্বীনের' আন্দোলন সফল করার জন্য অপরিহার্য সাব্যস্ত করে নিজেদের জন্য হালাল মনে করবে। বরং ছওয়াব রয়েছে মনে করে উক্ত কাজে লিপ্ত হবে। কিন্তু মহান আল্লাহর অপার মহিমা, মাওলানা মাওদুদী সাহেব 'হিকমতে আমলীর' উক্ত দর্শনের ভিত্তিতে নিজেই সে সব কাজ করে দেখিয়েছেন, যে সব বিষয়ে তাঁর সমালোচক ও অভিযোগকারীগণ আশংকা প্রকাশ করতেন এবং মাওলানা মাওদুদী সাহেবের সহযোগী ও ভক্তগণ বলতেন, "এটা হতে পারে না"।

উক্ত "হিকমতে আমলীর দর্শন" সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগে মাওলানা মাওদুদী সাহেবের একটি লেখা আপনারা পাঠ করে নিন, যেটা মাসিক 'তরজুমানুল কোরআন' সেপ্টেম্বর-৫২ইং সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। যেহেতু উক্ত লেখাটি সম-সাময়িক কালের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা (বা বিষয়) সম্পর্কে অত্যন্ত উত্তম ও সন্তোষজনক লেখা ছিল, তাই মাসিক আল-ফুরকানের আক্টোবর-৫২ইং সংখ্যায়ও সেটা প্রকাশ করা হয়েছিল। এখানে উক্ত লেখাটি আল-ফুরকান থেকেই তার পরিচিতিমূলক সম্পাদকীয় নোটসহ উদ্ধৃত করা হচ্ছে। আপনারা সত্বর বুঝতে পারবেন যে বক্ষমান আলোচ্য বিষয় "ধর্মীয় কাজে হিকমতে আমলীর দর্শন" এর সাথে উক্ত লেখাটির কি সম্পর্ক রয়েছে।

"নারী ও আইন পরিষদ"

মাওলানা সৈয়দ আবুল-আলা মাওদুদী

[মাওলানা মাওদুদী সাহেব মাসিক তরজুমানুল কোরআন-আগষ্ট সংখ্যায় পাকিস্তানের জন্য কতিপয় সাংবিধানিক প্রস্তাব পেশ করেন। উক্ত প্রস্তাবগুলোর বিরুদ্ধে কোন কোন মহল থেকে যে সব অভিযোগ উত্থাপিত হয়, তার উত্তর তিনি তরজুমানুল- কোরআনের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রদান করেন। তন্মধ্যে একটি অভিযোগ ছিল, "কোন নারীর আইন-পরিষদ সদস্যা হওয়া উচিত নয়" তার এই প্রস্তাবের উপর। এর উত্তরে মাওলানা মাওদুদী সাহেব যা কিছু লিখেছেন, তা আল-ফুরকানেও লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজনবোধ করি। কারণ লেখাটি আমাদের বর্তমান সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালার (বিষয়) সাথে সম্পর্কিত।]

"একটি অভিযোগ আমার এই প্রস্তাবের উপর উত্থাপন করা হয় যে, "কোন নারীর আইন-পরিষদ সদস্যা হওয়া উচিত নয়"। এ প্রসঙ্গে আমার নিকট প্রশ্ন করা হয় যে, সেটা কোন্ ইসলামী নীতি, যেটা নারীদেরকে সদস্য হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে? কোরআন-হাদীছের সেই নির্দেশ কোন্‌টি, যেটা আইন-পরিষদের সদস্যপদ পুরুষদের জন্য রিজার্ভ বলে সাব্যস্ত করে? উক্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদানের আগে এটা জরুরী মনে করি যে, যে আইন পরিষদের সদস্য পদের জন্য নারীদের নিয়ে আলেচনা চলছে, তার সঠিক ধরন ও স্বরূপ পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা।

উক্ত পরিষদসমূহের নাম 'আইন পরিষদ' রাখার কারণে এ ভুল ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে যে, উক্ত পরিষদসমূহের কাজ কেবল আইন তৈরী করা। এ ভুল ধারণা পোষণ করে

মানুষ যখন দেখতে পায় যে, সাহাবায়ে কেরামের যুগে মুসলিম নারীগণও আইন-বিষয়ক মাসয়ালায় আলাপ-আলোচনা, গবেষণা, মত প্রকাশ সবকিছু করতেন এবং অনেক সময় স্বয়ং 'খলীফা' তাঁদের মতামত জেনে নিয়ে সে অনুসারে কাজও করতেন তখন তারা আশ্চর্যান্বিত হয় যে, বর্তমানে ইসলামী নীতিমালার নাম নিয়ে এ ধরনের 'পরিষদে' নারীদের অংশ গ্রহণকে কিভাবে গলদ বলা যেতে পারে। কিন্তু, আসল ঘটনা হলো এই যে, বর্তমান যুগে যে সব পরিষদ উক্ত নামে আখ্যায়িত হয়, সে সবের কাজ কেবল আইন তৈরী করা নয়; বরং বাস্তব ক্ষেত্রে উক্ত পরিষদই সমগ্র দেশের প্রশাসন ও রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে, মন্ত্রী পরিষদ গঠন করে, মন্ত্রী পরিষদ ভেঙ্গে দেয়, আইন-শৃংখলার যাবতীয় নীতি নির্ধারণ করে, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক বিষয়াদি নির্ধারণ করে এবং যুদ্ধ-শান্তি, চুক্তি-সন্ধি সব কিছুর চাবিকাঠি তারই হাতে থাকে। এ হিসেবে উক্ত পরিষদের স্থান কেবল একজন আইনজ্ঞ ও মুফতির স্থান বিশেষ নয়; বরং সমগ্র দেশের নেতৃত্বেরই বিশেষ স্থান। কোরআন মানুষের জীবনে এ বিশেষ স্থান ও দায়িত্ব কাকে দিয়ে থাকে এবং কাকে দেয় না, তা একবার পাঠ করে দেখুন। মহান আল্লাহ তায়ালা 'সূরা নিসা'– তে বলেন,

"পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সে মতে নেক্কার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ তার জন্য যা রক্ষণীয় করেছেন, লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে।" (নিসা : ৩৪)

মহান আল্লাহ উক্ত আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় "কওয়ামিয়্যত" বা 'কর্তৃত্বের' গুরু দায়িত্ব ও জিম্মাদারী পুরুষকেই প্রদান করেছেন এবং নেক্কার নারীদের দু'টি বৈশিষ্ট্যের বিষয় বর্ণনা করেছেন : (১) তারা যেন আনুগত্যপরায়ণা হয় এবং (২) পুরুষদের অনুপস্থিতিতে সে সব বস্তুকে হেফাযত করে যেগুলোকে মহান আল্লাহ হেফাযত করাতে চান।

আপনি হয়তো বলবেন যে, এটা তো পারিবারিক জীবনের জন্য বলা হয়েছে, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন প্রসঙ্গে তো বলা হয়নি। কিন্তু, এখানে জেনে রাখা দরকার যে, প্রথমতঃ "পুরুষগণ নারীদের সরদার বা নেতা" এটা সাধারণভাবে বলা হয়েছে; "ফিলবুয়ূত" বা "গৃহভ্যন্তরে" এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। তাই এ হুকুমকে কেবল পারিবারিক জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ আপনার একথা যদি মেনেও নেয়া হয়, তবুও আমি জিজ্ঞেস করছি, যাকে পরিবার বা গৃহে নেতৃত্বের স্থান বা জিম্মাদারী প্রদান করা হয়নি; বরং "অধীনস্থ" (অনুগত)-এর স্থানে রাখা হয়েছে, আপনি তাকে সমস্ত গৃহের একত্রিত রূপ অর্থাৎ সমগ্র রাষ্ট্রের অধীনস্থার পর্যায় থেকে তুলে নিয়ে নেতৃত্বের স্থানে নিয়ে যেতে চান? গৃহের নেতৃত্বের চেয়ে রাষ্ট্রের নেতৃত্ব তো অনেক বড় এবং উচ্চ পর্যায়ের জিম্মাদারী। এখন আল্লাহ সম্পর্কে আপনার কি এই ধারণা যে, তিনি নারীকে তো একটি গৃহের নেতা বা সরদার করছেন না, কিন্তু লাখ-লাখ ঘরের একত্রিত রূপ রাষ্ট্রের উপর তাকে নেতা করবেন?

পবিত্র কোরআন পরিষ্কার ভাষায় নারীদের কর্মপরিধি নির্ধারিত করে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা গৃহভ্যন্তরে অবস্থান করবে, মুর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না।" (সূরা আহযাব-৪)

তারপর আপনি বলবেন যে, এ আদেশ তো নবী (সঃ)-এর পরিবারের সম্মানিতা নারীদেরকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো যে, আপনার পবিত্র ধারণায় নবী পরিবারের নারীদের মধ্যে কি কোন বিশেষ দোষ-ত্রুটি ছিল, যার কারণে পরিবারের বাইরে কোন দায়িত্ব পালনে তাঁরা অযোগ্য ছিলেন? এ দিক দিয়ে অন্যান্য নারীরা কি তাঁদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল? কোরআনের এ পর্যায়ের যাবতীয় আয়াত যদি কেবল নবী পরিবারে জন্যই অবতীর্ণ হয়, তবে কি অন্যান্য মুসলিম নারীদের 'তবাররুজে-জাহেলীয়্যত' বা জাহেলীয়্যত যুগের সাজে বের হওয়ার অনুমতি রয়েছে? তাদের জন্য কি বেগানা পুরুষদের সাথে এমনভাবে কথা বলার অনুমতি রয়েছে, যাতে তাদের অন্তরে লোভ-লালসার সৃষ্টি হয়? মহান আল্লাহ্ কি নবী পরিবার ব্যতীত অন্যান্য মুসলিম পরিবারকে 'রিজস' বা 'অপবিত্রতায়' লিপ্তাবস্থায় দেখতে চান?

এবার আসুন হাদীছের দিকে। নবী করীম (সঃ) বলেন, "যখন তোমাদের ধনিক শ্রেণী কৃপণ হবে, যখন তোমাদের যাবতীয় কাজের কর্তৃত্ব তোমাদের নারীদের হাতে চলে যাবে, তখন তোমাদের জন্য পৃথিবীর উপরিভাগের চেয়ে অভ্যন্তর-ভাগ অধিক কল্যাণকর হবে।" (তিরমিযী)

হযরত আবু বকরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত : যখন নবী করীম (সঃ)-এর নিকট এ সংবাদ পৌছলো যে, (ইরানী) পারস্যের জনগণ কিসরার কন্যাকে (মেয়ে) তাদের বাদশাহ মনোনীত করেছে, তখন তিনি বললেন, "সে জাতি কখনো সাফল্য অর্জন করতে পারে না, যে জাতি স্বীয় কাজ-কর্মের কর্তৃত্ব ও দায়িত্বভার একজন নারীর হাতে সোপর্দ করে।" (বোখারী ও তিরমিযী)

উপরোক্ত হাদীছ দু'টি মহান আল্লাহর বাণী "পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল" -এর প্রকৃত ব্যাখ্যা বর্ণনা করে। এর দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনা নারী জাতির কর্ম-পরিধির বহির্ভূত বিষয়। একটা প্রশ্ন অবশ্য থেকে যায়, তা হলো, নারীদের কর্ম পরিধি কি? এ প্রশ্নের উত্তরে নবী করীম (সঃ)-এর এ হাদীছটি পরিষ্কার ব্যক্ত করে যে–

"............ এবং নারী তার স্বামীর গৃহ এবং তার সন্তানদের হেফাজতকারীনী। তাদের সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসিত হবে।" (আবু দাউদ)

পবিত্র কোরআনের বাণী "এবং তোমরা তোমাদের গৃহসমূহেই অবস্থান করবে" -এর সঠিক ব্যাখ্যা এটাই যা উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা বুঝা গেলো। এর অতিরিক্ত ব্যাখ্যায় রয়েছে সে সব হাদীছ, যেগুলোতে নারীদেরকে রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের কাজ গৃহ বহির্ভূত ফরয ও ওয়াজিব থেকেও নিষ্কৃতি দেওয়া হয়েছে।

"জুমার নামায জামাতের সাথে আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের অধিকার ও দায়িত্ব। কিন্তু, চার ব্যক্তি ব্যতীতঃ গোলাম, নারী, ছেলে-মেয়ে ও অসুস্থ ব্যক্তি।" (আবু দাউদ)

"হযরত উম্মে আতীয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, "আমাদেরকে জানাযার সাথে চলতে নিষেধ করা হয়েছে।" (বোখারী)

যদিও আমাদের মত ও দৃষ্টিভঙ্গীর পক্ষে আমাদের নিকট শক্তিশালী যৌক্তিক প্রমাণাদিও রয়েছে এবং কেউ চ্যালেঞ্জ করলে সেগুলো পেশও করতে পারি, কিন্তু প্রথমতঃ এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা হয়নি। দ্বিতীয়তঃ আমরা কোন মুসলমানের এ হক বা অধিকার স্বীকারও করি না যে, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের (সঃ) সুস্পষ্ট আহকাম শুনার পর সেমতে আমল করার আগে এবং আমল করার জন্য শর্ত হিসেবে যুক্তি সংক্রান্ত প্রমাণাদির দাবী করবে। কোন মুসলমান যদি সত্যিকার অর্থে সে মুসলমান হয়, তবে প্রথমে হুকুম মোতাবেক আমল করা তার দরকার এবং পরে স্বীয় মন-মস্তিষ্ককে আশ্বস্ত করার জন্য যুক্তি-প্রমাণ তালাশ করতে পারে। কিন্তু, সে যদি বলে, আমাকে আগে যুক্তি প্রমাণ দিয়ে মানসিকভাবে আশ্বস্ত করো, অন্যথায় আমি আল্লাহ ও রসূলের (সঃ) হুকুম মানবোনা, তা হলে আমি তাকে মুসলমান বলেও গণ্য করবো না। তাকে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য সংবিধান তৈরীর অধিকারী হিসেবে গণ্য করা তো অনেক দূরের কথা। শরীয়তের হুকুম মতে আমল করার জন্য যে ব্যক্তি যুক্তি-প্রমাণ তলব করে, তার স্থান শরীয়তের গন্ডি বহির্ভূত; অন্তর্ভুক্ত নয়।"

মাওলানা মাওদুদী সাহেব আরো সামনে অগ্রসর হয়ে উল্লেখিত প্রবন্ধেই এ মসয়ালা সম্পর্কে উত্থাপিত অথবা সৃষ্ট কোন কোন সংশয়ের যাবতীয় উত্তর প্রদান করেন। আর উক্ত উত্তরগুলোও একান্ত সঠিক ও সন্তোষজনক। কিন্তু, যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে উক্ত প্রবন্ধটি আমরা এখানে উদ্ধৃত করেছি, তার জন্য এ অংশটুকুই যথেষ্ট, যেখানে মাওদুদী সাহেব পরিষ্কার ভাবে প্রমাণিত করেছেন যে, ইসলাম এবং ইসলামী শরীয়তে কোন নারীর জন্য আইন-পরিষদের সদস্য হওয়ার অবকাশ নেই, আর এটা ইজতেহাদী (তথা অনুমানভিত্তিক) মসয়ালাও নয়, বরং এ সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সুস্পষ্ট বিধান ও নির্দেশাবলী রয়েছে এবং কোন মুসলমান (সত্যিকার) মুসলমান হওয়ার জন্য এটা শর্ত যে, এ হুকুমকে নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া।

এবার শুনুন! উপরে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাওলানা মাওদুদী সাহেব এ প্রবন্ধটি ১৯৫২ সালেই লিখেছিলেন, যখন পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। এর ৬/৭ বছর পর সে সময় আগত হয় যখন পাকিস্তানের তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রশাসনিক ক্ষমতা হস্তগত করেন এবং পরে রাষ্ট্রপ্রধানও হয়ে যান। এর কয়েক বছর পর তিনি

নিয়মতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে পাকিস্তানের 'রাষ্ট্রপ্রধান' হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। তখন তাঁর বিরুদ্ধে পাকিস্তানের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে একটি সম্মিলিত জোট গঠিত হয়। মাওলানা মাওদুদী সাহেবের জামায়াতে ইসলামীও তাঁর নির্দেশ ও নেতৃত্বে উক্ত জোটের অর্ন্তভুক্ত হয়েছিল। বরং তার প্রতিষ্ঠা ও রূপরেখা প্রণয়নে তাঁর ভূমিকা অন্যান্য দলসমূহের তুলনায় অধিকই ছিল।

[এখানে এ বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত 'সম্মিলিত জোটে' সে সব রাজনৈতিক দলও অন্তর্ভূক্ত ছিল, দ্বীন বরং আল্লাহর সাথেও যাদের রাজনীতির কোন সম্পর্ক ছিল না। যেমন : (তৎকালীন) পূর্ব পাকিস্তানের প্রখ্যাত নেতা ভাসানী সাহেবের সে দলও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল, যে দলটি খোলাখুলিভাবে কমিউনিষ্ট ও কমিউনিজমের সক্রিয় প্রচারক ও পতাকাবাহী ছিল। মাওলানা মাওদুদী সাহেবের "ধর্মীয় কাজে হিকমতে আমলীর" দর্শন জামায়াতে ইসলামীর জন্য উক্ত সব দলের সাথে সহযোগিতামূলক কাজ ও সাহচর্যকে কেবল বৈধই করেনি, বরং 'ইক্কামতে দ্বীনের' সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে ছওয়াবের কাজ হিসেবেও সাব্যস্ত করে দিয়েছিল।]

উক্ত 'সম্মিলিত জোটের' একান্ত প্রয়োজন ছিল প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একজন শক্তিশালী প্রার্থীকে দাঁড় করানো। এ পরিপ্রেক্ষিতে 'সম্মিলিত জোটের' অন্তর্ভুক্ত সকল রাজনৈতিক দল এ সিদ্ধান্তে একমত হয় যে, দেশে মিস ফাতেমা জিন্নাহই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যাকে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের বিরুদ্ধে নির্বাচনে দাঁড় করালে বিজয় লাভ করার আশা করা যায়। সুতরাং তাঁকেই নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করার ব্যাপারে সবাই সিদ্ধান্ত পাকাপোক্ত করেন। এদিকে, এ ব্যাপারে জামায়াতে ইসলামী একটি সমস্যার সম্মুখীন হয় যে, তারা এ পর্যন্ত এ কথাই বলে আসছিল এবং মাওলানা মাওদুদী সাহেব কোরআন-হাদীছের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছিলেন যে, ইসলাম এবং ইসলামী শরীয়তে কোন নারীর জন্য আইন পরিষদের একজন সাধারণ সদস্য হওয়ার অবকাশও নেই, গোটা রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বা প্রধান হিসেবে নির্বাচিত ও মনোনীত করা তো দূরের কথা। (বলতে গেলে যিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন।) কিন্তু, মাওলানা মাওদুদী সাহেব "ধর্মীয় কাজে হিকমতে আমলী"র যে দর্শন পেশ করেছিলেন, এবং এর পক্ষে যে সব দলীল-প্রমাণ খাড়া করেছিলেন, সে সবের আলোকে উক্ত সমস্যারও সমাধান বের করা হয়। যেমন : 'ইকরাহ' বা বাধ্য করার কারণে মুখে কলেমায়ে কুফর বা কুফরী শব্দ উচ্চারণ করা বৈধ এবং অপারগ অবস্থায় হারাম ও মৃত জন্তুর গোশ্‌ত ভক্ষণ করারও অনুমতি রয়েছে, ইত্যাদি।)

জামায়াতে ইসলামীর মজলিসে শুরার পক্ষ থেকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদের জন্য মিস্ ফাতেমা জিন্নাহকে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করার ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির ঘোষণা দিতে গিয়ে যে বিবৃতি প্রচার করা হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল যে,-

"শরীয়তের যে সব বিষয়কে হারাম হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়, তন্মধ্যে কতকগুলোর 'হুরমত' বা অবৈধতা পরিবর্তিত হতে পারে না। আবার কতকগুলোর 'হুরমত' বা অবৈধতা এমন ধরনের যে, একান্ত প্রয়োজনের সময় প্রয়োজন পরিমাণে যেগুলো জায়েয বা বৈধতায় পরিবর্তিত হতে পারে। বর্তমানে একথা সুস্পষ্ট যে, কোন নারীকে নেতা হিসেবে নির্বাচিত বা মনোনীত করার নিষিদ্ধতা সে সব 'হুরমত' বা অবৈধতামূলক কাজের অন্তর্ভুক্ত নয়, যেগুলোর অবৈধতা চিরস্থায়ী ও অকাট্য; বরং দ্বিতীয় প্রকারের অবৈধতামূলক কাজগুলোর মধ্যেই তাকে গণ্য করা যায়। এ কারণে সে সকল অবস্থা ও পরিস্থিতির রিপোর্ট পর্যালোচনা করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে যে পরিস্থিতিতে আমাদের সম্মুখে এ মাসয়ালা (সমস্যা) উপস্থিত হয়েছে।"

(এরপর দেশের পরিস্থিতি ও অবস্থার উপর আলোকপাত করা হয়েছিল এবং সবশেষে নিম্নবর্ণিত বক্তব্যের মধ্য দিয়েই মজলিসে শুরার এ প্রস্তাবের শেষ সিদ্ধান্ত হচ্ছিল-)

"উপরোল্লিখিত আলোচনার আলোকে এ বৈঠকের পক্ষ থেকে দেশে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য বর্তমান প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে মোহতরমা ফাতেমা জিন্নাহর সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং এ বৈঠকের পক্ষ থেকে সর্বসাধারণের নিকট আবেদন জানানো হচ্ছে এবং জামায়াতে ইসলামীর দায়িত্বশীল কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, তারা যেন এই স্বৈরাচার ও নির্যাতনের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এই শেষ সুযোগ থেকে পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে এ (নির্বাচনী) যুদ্ধকে সফল করতে ধন, মন ও প্রাণ পণে প্রচেষ্টা চালায়।"

অতঃপর অবস্থা এমন হয় যে, পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর "ইলেকশানী মোজাহেদীন" বা নির্বাচনী-যোদ্ধারা এটাকে "জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ" হিসেবে অভিহিত করে মিস্ ফাতেমা জিন্নাহকে বিজয়ী করার জন্য অর্থ, শ্রম ও প্রাণের রাজী রেখে ময়দানে অবতীর্ণ হয়। আর তারা যেহেতু "শরয়ী" এ নির্দেশ-প্রাপ্ত হয় যে, এটা এমন গুরুত্বপূর্ণ ও মহান কাজ যে, এতে সফলতা লাভ করার জন্য প্রয়োজন হলে প্রয়োজন পরিমাণ হারাম বা অবৈধ কাজেও লিপ্ত হওয়া যায়, তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই অনুমান করতে পারে যে, নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য কোন্ কাজটাই করা হয়নি।

এখানে এটাও উল্লেখযোগ্য যে, মিস্ ফাতেমা জিন্নাহ কেবল একজন 'নারীই' ছিলেন, তা নয়। যে কোন সচেতন ব্যক্তি এবং জামায়াতে ইসলামীর তো প্রত্যেক ব্যক্তিই জানতো যে, মাওলানা মাওদুদীর বিশেষ পরিভাষায় তিনি বড় জোর কেবল "জন্মসুত্রেই মুসলমান" এবং "আদম শুমারীর তালিকা মতেই মুসলমান" ছিলেন। ইসলামের সাথে তাঁর যে ধরনের সম্পর্ক ছিল তা কারো অজানা ছিল না এবং তাঁর এ বিষয়টি প্রশংসাযোগ্য যে তিনি নির্বাচনের বিভিন্ন স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতেও নিজকে

পরিবর্তন করা জরুরী মনে করেননি। পরিবর্তন যা হয়েছে, তা তো "ইকামতে-দ্বীনের" ঝান্ডাধারীরই হয়েছে। কবির ভাষায়-

"গিলায়ে জফায়ে ওয়াফা-নুমা হারম কো জো আহ্‌লে হারম সে হে,
জু মাঁই বুতকদে মেঁ বয়াঁ করোঁ তো কাহে সনম ভি 'হরি হরি'।"

অর্থাৎ- বিশ্বস্ততার মুর্ত প্রতীক হারাম শরীফে তথকথিত হারামবাসীদের এমন সব জঘন্য অত্যাচারের অভিযোগ করছি, যেগুলো বুতখানায় গিয়ে করা হলে, তথাকার মুর্তিগুলোও আশ্চর্যান্বিত হয়ে নিশ্চয় "হরি হরি" রবে উত্তেজিত হয়ে যেত।

হে মহান সৃষ্টিকর্তা! হয়তো মাপকাঠির এটা উন্নতি যে, জামায়াতে ইসলামীর সংবিধানে জামায়াতের প্রথম শ্রেণীর সদস্যদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল,-

"শরীয়তের বিধি-বিধানের পাবন্দীর ব্যাপারে তাঁদের জন্য কোন প্রকারের প্রশয় থাকবে না। তাঁদেরকে মুসলমানদের জিন্দেগীর পুরা নমুনা পেশ করতে হবে। **তাদের জন্য 'রুখসত'-এর স্থলে 'আযীমত'-এর নীতিই আইন বলে গণ্য হবে**।"

অথবা এটা অধঃপতন ও অবনতি যে, জেনে-শুনেই একটি হারাম কাজে লিপ্ত করানো হচ্ছে এবং গোটা দেশের মুসলমানদের নিকট উক্ত হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার আবেদন জানানো হচ্ছে। আর এজন্য শরীয়তের হারাম কাজসমূহকে স্থায়ী ও অস্থায়ী এবং কাট্য ও অকাট্য হিসেবে দু'ভাগে বিভক্ত করা হচ্ছে।

আমার মতে, "ধর্মীয় কাজে হিকমতে আমলীর দর্শনের" এটা কার্যগত প্রদর্শনী ছিল এবং এতেও আশ্চর্যের কিছুই নেই যে, এটা আল্লাহ তাআলা এজন্য করিয়েছেন, যাতে উক্ত দর্শনের হাকীকত ও মূল রহস্য এবং এর ভয়াবহতার দৃশ্য সবাই প্রত্যক্ষ করতে পারে। (যাতে, "যাকে ধ্বংস করার আছে তিনি দলীলের ভিত্তিতেই ধ্বংস করবেন এবং একইভাবে যাকে "জিন্দা রাখার আছে জিন্দা রাখবেন"।) (আলকোরআন)

যে সময়ে এসব কিছু সংঘটিত হয়, তখন জুমাদালউখরা, ১৩৮৪ সালের মাসিক আল-ফুরকানে (নভেম্বর-৬৪ইং) এ বিষয়ে আরো অধিক বিস্তারিতভাবে লেখা হয়েছিল এবং উপরের আলোচনায় মিস্ ফাতেমা জিন্নাহর নির্বাচন সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামীর মজলিসে শুরার প্রস্তাবের যে এবারত এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে, তা সেখানে থেকেই গৃহীত হয়েছে।

কেবল সাময়িক ভুল নয়, বরং ফিৎনার দ্বার উম্মোচন :

"ধর্মীয় কাজে হিকমতে আমলীর" এ দর্শন, যাকে মাওলানা মাওদুদী সাহেব ১৯৫৮ইং সালে লিখিতভাবে উথাপন করেছিলেন (যে সম্বন্ধে পূর্ববর্তী আলোচনায় বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে) এবং ১৯৬৫ ইংরেজীর মিস্ ফাতেমা জিন্নাহর নির্বাচনে যার পূর্ণ কার্যগত (আমলী) অভিজ্ঞতা ও প্রদর্শনী হয়,-এটা সুস্পষ্ট যে, এটা কেবল মাত্র এমন একটি সাময়িক ভুল নয়, যা হয়েই গেছে। বরং এর মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্তের জন্য ধর্মের মধ্যে অসংখ্য ফিৎনার এক প্রশস্ত দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেছে। (মহান আল্লাহ রক্ষা করুন)

যারা জামায়াতে ইসলামীর অবস্থা সম্পর্কে অবগত তাঁরা জানেন যে, জামায়াতে ইমলামীর মূল কর্মকর্তাগণ সে সব সম্মানিত ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজ যারা ধর্মীয় জ্ঞান মৌলিকভাবে কেবল মাওলানা মাওদুদীর রচিত গ্রন্থাবলী থেকেই লাভ করেছেন এবং তাদের যাবতীয় মানসিক দীক্ষা মাওলানা মাওদুদী সাহেবেরই বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছে।-২৮

তাঁর লেখাসমূহ তাঁদের মানসপটে একথা প্রোথিত করে দিয়েছে যে, মুসলিম জাতির মধ্যে প্রথম শতাব্দীর পরে কোরআন এবং দ্বীনের মৌলিক পরিভাষাসমূহের (ইলাহ, রব, দ্বীন ও ইবাদত প্রভৃতি) মর্মার্থ এবং 'দাওয়াতে তাওহীদের' দাবী পর্যন্তও সঠিকভাবে অনুধাবন করা যাচ্ছিল না। বর্তমানে চতুর্দশ শতাব্দীতে মাওলানা মাওদুদী সাহেবই সঠিকভাবে অনুধাবন করেছেন আর অপরকে অনুধাবন করিয়েছেন এবং ধর্মের হাকীকত ও প্রাণও তা-ই যা মাওলানা মাওদুদী সাহেব অনুধাবন করেছেন

২৮.উক্ত অবস্থার সঠিক আন্দাজ এ ঘটনা দ্বারাই করা যেতে পারে যে, স্বয়ং মাওলানা মাওদুদী সাহেব অথবা তাঁর নির্দেশে"জামায়াতের" পক্ষ থেকে "পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর" (যেটা প্রকৃত জামায়াতে ইসলামী। ভারত ও কাশ্মীরে যা রয়েছে তা সবই তার শাখা-প্রশাখা। মাওলানা মাওদুদী-ই হচ্ছেন, সবার প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা) আমীর ও জেনারেল সেক্রেটারী পদে যথাক্রমে আমার বন্ধুবর মিয়া তোফাইল মোহাম্মদ সাহেব (যিনি সম্ভবতঃ বি, এ, এল, এল, বি) ও প্রফেসর গফুর আহমদ সাহেবকে মনোনীত করা হয়। আমি উভয় সম্পর্কে অবগত আছি এবং তাঁদের সম্পর্কে সুধারণা ও ভাল মত পোষণ করি। কিন্তু, যতদুর আমার জানা আছে তাঁদের নিকট ধর্মীয় জ্ঞান বলতে যতটুকু আছে, তা কেবল মাওলানা মওদুদী সাহেব এবং তাঁর মত অন্যান্য লেখকের পুস্তকাদি থেকেই অর্জিত বরং এর মাধ্যমেই তাঁদের মানসিক দীক্ষাও সম্পাদিত হয়েছে। সতর্কতার সাথে বলতে গেলে বলা যায় যে, জামায়াতে ইসলামীর যত লোক আছে তাদের মধ্যে শতকরা ৯৮/৯৯জনের জ্ঞানের উৎস হচ্ছে মাওলানা মাওদুদী ও তাঁর লিখিত পুস্তকসমূহ এবং শতকরা ২/১জন রোকন এমন ও থাকতে পারেন যারা প্রয়োজনের সময় কোরআন- হাদীছ এবং গ্রন্থভান্ডার থেকেও জ্ঞান আহরণ করতে পারবে। তাদের সম্বন্ধে আমার সুধারণা রয়েছে যে, সম্ভবতঃ তারা সে অবস্থায় রয়েছে যে অবস্থায় অনেক দিন পর্যন্ত স্বয়ং আমিও ছিলাম।

(বিঃ দ্রঃ উপরের রেখাগুলো কম্পোজ হয়ে যাওয়ার পর এক ব্যক্তির মাধ্যমে জানা যায় যে, প্রফেসর গফুর আহমদ সাহেব জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসাবে "সংযুক্ত ঐক্য ফ্রন্টের" জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। জামায়াতে ইসলামীর জেনারেল সেক্রেটারী অপর এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনিও একজন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন।

আর অপরের নিকট বিবৃত করেছেন। তা না হলে, পূর্ববর্তী যুগের মুজাদ্দেদীনেরও তো (মুজাদ্দেদে আলফে-ছানী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ, সৈয়দ আহমদ শহীদ প্রমুখ) ধর্মীয় ব্যাপারে বিরাট ভুল হয়েছে (?) এবং তাঁরা প্রকৃত ইসলাম ও জাহেলিয়্যাতের প্রভাব ও কার্যাবলীর মধ্যে পুরোপুরি পার্থক্য করতে পারেননি।

তাঁদের (যারা জামায়াতে ইসলামীর মূল কর্মকর্তা) অবস্থা এ রকম নয় যে, সরাসরি কোরআন-হাদীছ এবং পূর্ববর্তী আইম্মায়ে কেরাম ও মোহাক্কেক ওলামায়ে কেরামের রচিত গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে হিদায়ত ও জ্ঞান লাভ করতে পারে। তাদের নিকট দ্বীনের যাবতীয় পুঁজি হচ্ছে, কেবল মাওলানা মাওদুদী সাহেবের গ্রন্থাবলী এবং জামায়াতে ইসলামীর সাহিত্য ও রচনাসমূহ । অতঃপর মাওলানা মাওদুদী সাহেব তাঁদেরকে "ধর্মীয় কাজে হিকমতে আমলীর দর্শন" শিরোনামে এ মূলনীতিও শিক্ষা দিয়েছেন এবং এর উপর নিজে আমল করে এবং অপরের দ্বারা করিয়েও দেখিয়েছেন যে, ইকামতে দ্বীনের চেষ্টা-প্রচেষ্টার পর্যায়ে (যার কার্যগত রূপ হচ্ছে নির্বাচনী যুদ্ধ) প্রয়োজন হলে প্রয়োজন পরিমাণ অবৈধ ও হারাম কাজেও লিপ্ত হওয়া যায়। তা হলে ভেবে দেখা যেতে পারে যে, নির্বাচনের ময়দানে জামায়াতে ইসলামীর 'নির্বাচনী যোদ্ধারা' (মুজাহেদীন) নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য এ ফতওয়ার আলোকে কোন্ কাজটা করবে না?

পাকিস্তানে (তদ্রূপ ভারত-বাংলাদেশেও) কোন সচেতন ব্যক্তি হয়তো এমন নেই, যিনি এ বাস্তব ঘটনা সম্পর্কে অবগত নন যে, নির্বাচনে বিশেষ করে নিম্নস্তরে কি হয়ে থাকে এবং নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য কি কি কাজ করা আবশ্যক বলে মনে করা হয় এবং কি কি করা হয়। দলের প্রচারকার্য চালাতে গিয়ে মিথ্যা বলা এবং নির্ভয়ে মিথ্যা বলা, জেনে-শুনে জনসাধারণকে মিথ্যা আশা-ভরসা দেওয়া, প্রতিদ্বন্দ্বী দল অথবা প্রার্থীর বাস্তব-অবাস্তব অসংখ্য দোষ প্রচার করে বেড়ানো এবং এ পর্যায়ে অপবাদ ও কুৎসা রটনা করতেও সংকোচ না করা, ভোটারদেরকে নানা ধরনের লোভ-লালসা প্রদান করা আর সম্ভব হলে ঘুষও দেওয়া, জাল ভোট প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি কোন্ বেঈমানী আর বেদ্বীনি কাজটা বাকী থাকে, যা নির্বাচনের ময়দানে করা হয়না এবং আবশ্যক বলে মনে করা হয় না।

যখন জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনী যোদ্ধাদের সামনে মাওলানা মাওদুদী সাহেবের কোরআন ও হাদীছের বিভিন্ন দলীল দ্বারা সুসজ্জিত এই ফতওয়া রয়েছে যে–'ইকামতে দ্বীনের' চেষ্টা-প্রচেষ্টার পর্যায়ে যদি প্রয়োজন পড়ে তবে প্রয়োজন পরিমাণ কোন অবৈধ ও হারাম কাজেও লিপ্ত হওয়া যায়, তবে কি কারণ হতে পারে যে, এ সব নির্বাচনী যোদ্ধারা নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য সে সব কাজ করবে না, যা আবশ্যক মনে করা হয় এবং যে সব কাজ পরকাল সম্পর্কে চিন্তাহীন এবং বৈধ-অবৈধ ও আযাব-ছওয়াব প্রভৃতি বিষয়ে উদাসীন ও খোদাভীতিহীন নির্বাচনবাজ ব্যক্তিবর্গ অহরহভাবে করে থাকে। পার্থক্য শুধু

এতটুকু হবে যে, অন্যান্যরা তা করবে অবৈধ ও হারাম মনে করে এবং জামায়াতে ইসলামীর মোজাহেদীনরা এসব কাজ করবে জায়েয বা বৈধ মনে করে, বরং ছওয়াবের কাজ এবং 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' মনে করে।

এদিকে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এ বিষয়টি কেবল নির্বাচনের ময়দান পর্যন্ত সীমিত থাকে না। মাওলানা মাওদুদী সাহেব তো তাঁর ভক্তদের সেই শ্রেণীর হাতে, যারা কলেজ থেকে বের হওয়ার পর তাঁর কিতাবসমূহ এবং জামায়াতে ইসলামীর পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্র-পত্রিকা থেকেই দ্বীনি জ্ঞান লাভ করেছেন এবং তারা কেবল তাঁকেই দ্বীনের বিশেষজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য মুখপাত্র বলে বিশ্বাস পোষণ করেন এ ভয়ংকর মূলনীতি প্রদান করেছেন যে, 'ইকামতে দ্বীনের' লক্ষ্যে প্রশাসনিক নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব হস্তগত করার জন্য যদি এমন কোন কাজ করার প্রয়োজন হয়, যে সম্পর্কে কোরআন-হাদীছে নিষিদ্ধতা রয়েছে, তবে 'প্রয়োজন পরিমাণে' সে কাজ করা যেতে পারে। আমি বার বার ভেবে দেখার পরও বুঝতে পারিনি যে, এই মূলনীতির অনুসরণ করে 'ইকামতে দ্বীনের' উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে কোন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে পথ থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য যদি তাকে খতম করে দেওয়ার অথবা তার বিরুদ্ধে কোন মিথ্যা মামলা দায়ের করে জেলে প্রেরণ করার প্রয়োজন উপলব্ধি করা হয়, তবে মাওলানা মাওদুদী সাহেবের অনুসারীদের নিকট উক্ত কাজটা বৈধ বরং ছওয়াবের কাজ হওয়াতে কোন্ ধরনের সন্দেহ ও সংশয়ের সৃষ্টি হবে? ভেবে দেখা দরকার যে, মাওলানা মাওদুদী সাহেবের এ মতবাদ তো যুগের প্রত্যেক ইয়াজীদ ও হাজ্জাজের জন্য সনদ ও দস্তাবিজ হতে পারে। নিয়্যাতের অবস্থা তো আল্লাহরই জানা আছে।

আমি এ ধারণা কখনো পোষণ করি না যে, মাওলানা মওদুদী সাহেব জেনে–শুনেই সচেতনভাবে ধর্মের মধ্যে ফিৎনার এত বিরাট দ্বার খুলে দিয়েছেন। আমি মনে করি, তিনি যে রকম ধর্মের মধ্যে 'মৌলিক পরিভাষা' সম্পর্কে নিজের দাবীর সুদূরপ্রসারী ফলাফল এবং ভয়ানক পরিণতির কথা (আমার ধারণা মতে) অনুধাবন করতে পারেননি, তদ্রূপ, "ধর্মীয় কাজে হিকমতে আমলীর" তত্ত্ব ও দর্শনের ভয়ংকর পরিণতির দিকেও তাঁর দৃষ্টি যায় নি। (আল্লাহই বেশী জানেন)

আমার এ ধারণা যদি সঠিক হয়, তবে নিজের পুরোনো সম্পর্কের ভিত্তিতে তাঁর সমীপে আমি আরয করছি যে, তিনি আমার এ সব আবেদন-নিবেদন ও আলোচনাকে সামনে রেখে এই উভয় মাসয়ালার উপর চিন্তা-ভাবনা করে দেখবেন এবং এর থেকে প্রত্যাবর্তন করে ফিৎনার এই প্রশস্ত দ্বারকে নিজেই বন্ধ করে দেবেন, যা এ উভয় মাসয়ালা সম্পর্কে তাঁর লেখাগুলোর কারণেই উন্মুক্ত হয়ে গেছে। (আল্লাহ তাওবাকারীর তাওবা কবুল করেন।)

তৃতীয় মারাত্মক ভুল
'গিলাফে–কাবার' ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী

নবীগণের পদ্ধতিতে কাজ সম্পাদনের দাবী : ভিন্ন রকম পদ্ধতির অনুসরণ

এ সিদ্ধান্ত যখন চূড়ান্ত করা হয় যে, পাকিস্তানে 'ইক্বামতে দ্বীনের' অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার একমাত্র উপায় হচ্ছে, নির্বাচনের মাধ্যমে যে কোন প্রকারে প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা হস্তগত করা এবং এতে সফল হবার জন্যে বৈধ-অবৈধ যা-ই করা জরুরী বলে মনে হবে, তা সব করা হবে, তখন এরই পরিপ্রেক্ষিতে "গিলাফে-কাবার ভ্রম্যমান প্রদর্শনীর" মত নিতান্ত দুঃখজনক ও খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী কাজে স্বয়ং মাওলানা মাওদুদী সাহেব আত্মনিয়োগ করেন। অথচ যারা মাসিক তরজুমানুল কোরআনের প্রাথমিক সংখ্যাগুলো থেকে প্রায় ২০ বছর পর্যন্ত প্রকাশিত মাওলানা মাওদুদী সাহেবের লেখাসমূহ পড়ে আসছিলেন, তাঁরা কল্পনাও করতে পারতেন না যে, মাওলানা মাওদুদী সাহেব এ ধরনের কাজে এমনভাবে নিজকে জড়িত করতে পারবেন।

মাওলানা মাওদুদী সাহেব তাঁর রচনাসমূহে, 'ওহাবী মতবাদের' পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রচারণায় এমন কঠোর ও অগ্রগামী ছিলেন যে, তাঁর মতে 'সিলসিলায়ে সুলূক ও তাসাউফের' সে সব 'ওজিফা', 'জিকির-আজকার' ও দৈনিক করণীয় বিষয়াবলীরও কোন রকম অবকাশ ছিলনা, যেগুলো হযরত মোজাদ্দেদে আলফে-ছানী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ, সৈয়দ আহমদ শহীদ, শাহ ঈসমাঈল শহীদ (রাঃ) এবং তাঁদের ভক্ত-অনুসারী দেওবন্দী-জামাত ও জামাতে আহলে হাদীছের পীর-মাশায়েখ ও আকাবেরদের দৈনিক ওজিফার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই, মাওলানা মাওদুদী সাহেবের ওহাবী মতবাদ স্বয়ং তাঁর এবং তাঁর ভক্তদের দৃষ্টিতে অকৃত্রিম ও খাঁটি ছিল এবং এটা নিশ্চয় তাদের গর্বের বস্তু ছিল। কিন্তু নির্বাচনের ময়দানে এসে তারা তাদের এই প্রিয়বস্তুটিকেও বিসর্জন দেয়।

১৯৬৩ সালে (১৩৮২ হিঃ) এমন কিছু অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, (যা এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।) সউদী সরকার (যখন তার প্রধান ছিলেন শাহ সউদ বিন আব্দুল আজীজ) নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী এবং নিজেদের তত্ত্বাবধানেই কাবা শরীফের গিলাফ তৈরী করানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন– (এর আগে পবিত্র কাবার গিলাফ প্রতি বছর মিসর থেকেই তৈরী হয়ে আসার নিয়ম ছিল)। এ পরিপ্রেক্ষিতে সউদী সরকার 'গিলাফ' (অথবা তার কিছু অংশ) পাকিস্তানেই তৈরী করানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং মাওদুদী সাহেবকেই এর জিম্মাদার ঠিক করা হয়।–২৯

২৯. তখনই শুনতে পেয়েছিলাম যে, সউদী সরকারই 'গিলাফে কাবার' কিছু অংশ বেনারসে তৈরী করিয়েছেন। কিন্তু, আমি কখনো তা যাচাই করে দেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিনি। তাই আমার জানা নেই যে, আসল ঘটনা কি ছিল।

তখন পাকিস্তানে আইয়ুব খানের সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল এবং নির্বাচনের আলাপ-আলোচনা ও প্রাথমিক প্রস্তুতি আরম্ভ হয়েছিল। মাওলানা মাওদুদী সাহেব এবং তাঁর সহযোগীরা পাকিস্তানী মুসলমানদের অধিকাংশের দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং এ বিকৃত মানসিকতার ব্যাপারে একান্তভাবে অবগত ছিলেন যে, যদি ঘোষণা করে দেওয়া হয় যে, অমুক তারিখে, অমুক স্থানে বাগদাদ শরীফের বড় পীর সাহেবের 'জুব্বা' দেখানো হবে, তখন এরা নির্দ্বিধায় ছুটে আসবে। এতদসত্ত্বেও তাঁরা কাবা শরীফের গিলাফের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামীর প্রচারণা চালানো এবং এর দ্বারা নির্বাচনী সুযোগ-সুবিধা লাভ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রথমে 'গিলাফ' তৈরী করার সংবাদ তাঁদের পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয় এবং পরে এর উদ্বোধন উপলক্ষে একটি বিরাট অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। অতঃপর যখন 'গিলাফ' তৈরীর কাজ সমাপ্ত হয় তখন কর্মসূচী প্রদান করা হয় যে, পাকিস্তানের বিভিন্ন রেলপথে গিলাফ শরীফের ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীর জন্য বিশেষ ট্রেন চালু করা হবে। প্রথম থেকেই এর সময় সূচীর ব্যাপকভিত্তিক প্রচারণা চালাতে হবে এবং সর্বসাধারণকে দাওয়াত দিতে হবে যেন নির্দিষ্ট সময়ে স্টেশনে এসে মাওলানা মাওদুদী সাহেব ও তাঁর জামায়াতে ইসলামী কর্তৃক তৈরী 'কাবা শরীফের গিলাফের' জিয়ারত করেন।

অতঃপর উক্ত পরিকল্পনা সেভাবেই বাস্তবায়িত করা হয়। লাখ লাখ টাকা খরচ করে বিশেষ ট্রেন চালানো হয়। (জানা যায় যে, উক্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রধান জিম্মাদার ও জামায়াতের আমীর হিসেবে স্বয়ং মাওলানা মাওদুদী সাহেবও ট্রেনের একটি বিশেষ বগিতে সফর করেছিলেন।) জামায়াতে ইসলামীর পত্রিকাসমূহে এ সব ট্রেনের সফরসূচীর রিপোর্ট ছাপানোর সাথে সাথে দর্শনার্থীদের উৎসাহ ও আনন্দপূর্ণ চিত্রও সুনিপুণ ও বিস্ময়করভাবে তুলে ধরা হতো। এ পর্যায়ে এ বিষয়টিকে গোপন করারও প্রচেষ্টা সম্ভবতঃ চালানো হয় নি যে, এ সব কাজ কেবল জামায়াতের প্রচারণা এবং নির্বাচনের ক্ষেত্র সুগম করার জন্যই করা হচ্ছে।

জামায়াতে ইসলামীর পত্রিকাসমূহে উক্ত 'ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীর' পর্যায়ে সম-সাময়িক কালে যা কিছু এবং যেভাবে লেখা হচ্ছিল তার কিছু নমুনা পাঠকরা এখানেও দেখে নিতে পারেন।

জামায়াতে ইসলামীর মুখপত্র এশিয়া-লাহোর পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল–

"বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তানের রেলস্টেশনসমূহে দু'টি বিশেষ ট্রেন 'কাবার গিলাফ' দেখানোর কাজে নিয়োজিত রয়েছে। একটি ট্রেন লাহোর থেকে পেশোয়ারের দিকে একের পর এক স্টেশন অতিক্রম করে চলছে এবং দ্বিতীয় একটি ট্রেন উকাড়া মন্টগিরীর দিকে গিলাফ দর্শনের জন্য পিপাসাকাতরদের পিপাসা নিবারণ করছে। প্রতিটি

স্টেশনে সর্ব-সাধারণের উৎসাহ, আবেগ এবং ভক্তি ও প্রেমের বিস্ময়কর দৃশ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। ছোট ছোট স্টেশনে লাখো জনতার ভীড় হচ্ছে। নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা যাকেই দেখা যায়, সবাই এক নজর দেখার সৌভাগ্য লাভ করার জন্য উদগ্রীব।....... **মহিলারা গিলাফে কাবার উপর ফুল ও পয়সা অর্পণ করছেন। বড় বড় অফিসার ও সুধীরা শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শনার্থে এর সম্মুখে করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকেন**। যেহেতু, 'গিলাফে কাবা'কে স্পর্শ করা ও চুমো দেওয়ার অনুমতি নেই, তাই কোন কোন স্থানে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় আবেগ-আপ্লুত হয়ে সর্বসাধারণেরা **ট্রেনকেই চুমো দেওয়া শুরু করে দিয়েছে**।"

তখনকার দিনেই 'জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান'-এর 'শিহাব' নামক অন্য একটি পত্রিকার "গিলাফে-কাবা বিশেষ সংখ্যা" প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত সংখ্যার সুদীর্ঘ রিপোর্টের কয়েকটি ছত্র পড়ে নিন।

" ১২ই মার্চ সোয়া নয়-ঘটিকায় কাবা-শরীফের পবিত্র গিলাফ ও তার নগণ্য খাদেমদেরকে নিয়ে "গিলাফে-কাবা, বিশেষ ট্রেন" দর্শনার্থীদের তাকবীর ধ্বনির মধ্য দিয়ে রওয়ানা হয়ে যায়। 'সাধুকে-মুরীদ' প্রভৃতি যে সব স্টেশনে গাড়ী থামানোর কথা ছিল না, সেখানেও হাজার হাজার জনতার বিস্ময়কর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি গাড়ীকে থামিয়ে দেয়। রেলপথ মেরামত করার কারণে কয়েক মিনিটের জন্য এ সব তৃষ্ণার্ত চক্ষুকে প্রশান্তি দেবার ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলাই করে দেন। 'কামুনকে' নামক স্থানে গাড়ীর উভয় পাশে নারী ও পুরুষ দর্শনার্থীদের এক বিরাট দল অপেক্ষমান ছিল। তদ্রুপ গুজরানওয়ালা, উজির আবাদ, শিয়ালকোর্ট প্রভৃতি স্টেশনে ক্রমান্বয়ে অন্ততঃ পক্ষে প্রায় দশ লাখ দর্শনার্থী গিলাফ জিয়ারতের সৌভাগ্য লাভে ধন্য হন। বিভিন্ন গ্রাম ও দূর-দূরান্ত থেকে আগত এবং ভক্তিপূর্ণ অন্তর, প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি ও মুখমন্ডল মিলানো দর্শনার্থীদের মধ্য থেকে ট্রেন চলে যাবার পথ করে নেয়া অসম্ভব হয়ে পড়তো।............

মহিলারা তাদের ওড়না ও তাস্‌বীহ এবং পুরুষরা তাদের রুমাল, টুপি ও পাগড়ী সমূহকে গিলাফে-কাবার সাথে স্পর্শ করিয়ে চুমো দেওয়ার জন্য অস্থির ছিল। ফুলের তোড়া, ফুলের মালা ও আতরের শিশি গিলাফের জন্য আনা হতো।" (শিহাব-লাহোর : গিলাফে-কাবা সংখ্যা-৬৩ ইং)

আসল ঘটনা হলো, যদি এ সব কিছু 'জামায়াতে ইসলামীর' পত্রিকাসমূহ ব্যতীত অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হতো, তা হলে আমাদের মত লোকেরা এ কথা-ই মনে করতো যে, "এটা মাওলানা মাওদুদী সাহেব এবং তাঁর জামায়াতে ইসলামীর বিরোধীরা তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে তাকে উপহাসের পাত্র বানিয়েছে। কোথায় মাওলানা মাওদুদী আর কোথায় এসব আজেবাজে কান্ড-কারখানা!" আমরা সবাই এ সব কিছু জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের সে সব নির্ভরযোগ্য পত্রিকাসমূহে দেখতাম ও পড়তাম এবং মুখে অথবা অন্তরে বলতাম,

(কবির ভাষায়)"হে আল্লাহ! এ সব যা দেখতে পাচ্ছি, তা স্বপ্ন, না বাস্তব?"

তখনকার সময়ে মওলবী আতীকুর রহমান সাহেব আল্‌ফুরকানের একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে উল্লেখিত উদ্ধৃতিসমূহ 'এশিয়া' ও 'শিহাব' পত্রিকাদ্বয় থেকে উদ্ধৃত করেছিলেন। উক্ত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল-"আমাকে দেখুন, যার শিক্ষা গ্রহণ করার মত দৃষ্টি আছে"।

আমার ভালভাবে স্মরণ আছে যে, আমার ছোট অবস্থায় আমাদের পাড়ায় অবস্থাপন্ন বাড়ীসমূহে, (যার মধ্যে আমাদের বাড়ীটিও অন্তর্ভুক্ত) কখনো কখনো "বড় বিবি" নামে এক মহিলা আসতো। যার শরীরের সমস্ত পোশাক ছিলো সাদা বর্ণের। এমনকি বোরকাটিও হতো সাদা। তার সাথে আরো একজন মহিলা থাকতো, যার মাথায় থাকতো একটি ছোট বাক্স। উক্ত বাক্সে থাকতো একটি সাদা পাথর। প্রায় এক বর্গফুট আয়তনের উক্ত পাথরটিতে একটি মানুষের পদচিহ্নও বিদ্যমান ছিল। যা ছিল চার ভাগের তিন ইঞ্চি পরিমাণ গভীর। উক্ত পদচিহ্ন সম্পর্কে "বড় বিবি" বলতো যে, এটা হুজুর আকরাম (সঃ)-এর পা মোবারকের চিহ্ন। উক্ত পাথরের উপর হুজুর আকরাম (সঃ) স্বীয় পা মোবারক রাখার ফলেই উক্ত চিহ্ন অংকিত হয়েছে। এটা রসূল আকরাম (সঃ)-এর মোজিযা ছিল। সাদা পাথরটা ব্যতীত উক্ত বাক্সে একটি কালো বর্ণের বস্ত্র খণ্ডও থাকতো। এ সম্পর্কে সে বলতো, এটা কাবা শরীফের গিলাফের টুকরো।

তৎকালীন সময়ে আমাদের বাড়ীর সরল প্রকৃতির বয়স্কা মহিলারা সম্ভবতঃ উক্ত কথাগুলো একান্ত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতো। তারা 'গিলাফ শরীফ' ও 'কদম শরীফ'কে চুম্বন করতো আর চোখে লাগাতো এবং "বড় বিবির" খেদমতে সাধ্যমত হাদীয়া ও নজরানা পেশ করতো। "বড় বিবি" আমাদের গ্রাম চাম্বলেরই বাসিন্দা ছিল, না অন্য কোথাও থেকে আসতো তা আমার জানা নেই। "গিলাফে-কাবার ভ্রম্যমান প্রদর্শনী" দেখে প্রায় সত্তুর বছর পূর্বেকার এ ঘটনাটি আমার স্মৃতিপটে ভেসে উঠেছে। অথচ এটা আমি সম্পূর্ণভাবে ভুলে গিয়েছিলাম।-৩০

এ পর্যায়ে আমার অত্যন্ত দুঃখ ও অস্বস্তি অনুভব হয়েছে এ কারণেই যে, জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান -এর কোন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি সম্পর্কে আমার জানা নেই, যিনি সে সময় এ 'দ্বীনী-তামাশার' বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন এবং এর প্রতিবাদ করেছিলেন। অথচ, এর ক্ষতিকর ও মন্দ দিক এবং দ্বীন ও শরীয়তের প্রাণের জন্য এর মারাত্মক ক্ষতিকর দিকটা উপলব্ধি করার জন্য কোন বিশেষ মানের জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল না। যে কোন বিবেকবান ব্যক্তিই তা উপলব্ধি করতে পারতেন।

হ্যাঁ, আমাদের এখানে জামায়াতে ইসলামী ভারতের গণ্ডির মধ্যে একজন ('রজুলে রশীদ বা) সত্যপন্থি ব্যক্তি বের হয়েছিলেন। ইনি ছিলেন বোম্বাই-এর শামস পীরজাদা সাহেব। তিনি একজন জ্ঞানী ব্যক্তি এবং মযহাবে আহলে-হাদীছের অনুসারী ছিলেন। আমি যখন থেকে তাঁর সম্পর্কে অবগত হই, তখন থেকেই তাঁর অকৃত্রিমতা,

৩০. আমি এখানে এ ঘটনাটি কেবল হাস্যরস সৃষ্টির জন্য উল্লেখ করিনি; বরং যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করার পরেই এটা উল্লেখ করা ভাল হবে মনে করেছি যে, এর আলোকে "গিলাফে-কাবার ভ্রম্যমান প্রদর্শনীর" ধরন অনুধাবন করতে এবং এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে সহজ হবে।

একনিষ্ঠ ও ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁর অটলতার কথা বলে আসছি। তিনি 'গিলাফে কাবার' এই ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীর বিরুদ্ধে খোলাখুলিভাবে কলম চালিয়েছিলেন, এবং "অন্যায় কাজের প্রতিবাদ" -এর দায়িত্ব আদায় করেছিলেন। যদিও তিনি তাঁর লেখায় এ কথার চেষ্টা চালিয়েছেন যে, পাঠকরা যাতে একথা মনে না করে যে, এর জন্য মাওলানা মাওদুদী সাহেবই একমাত্র দায়ী। শরীয়তের বিধি-বিধানকে তুলে ধরার ব্যাপারে তিনি কোন ধরনের রাখ-ঢাক এর আশ্রয় নেননি। তিনি স্বীয় লেখায় এ দিকটির উপরও আলোকপাত করেছিলেন যে, "যে কাপড়টা এখনো "খানায়ে কাবার" ধারে-কাছেও যায়নি, (লাহোরে তৈরী করা হয়েছে এবং মক্কা নগরী থেকে প্রায় আড়াই হাজার মাইল দূরত্বে রয়েছে,) সেটা কাবা-শরীফের 'গিলাফ' হওয়ার মর্যাদা কিভাবে লাভ করে ফেললো?" এ পর্যায়ে তিনি 'ফতহুলবারী' (বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ) নামক গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে দলিল হিসেবে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর একটি সুস্পষ্ট বাণী -ও (ফতওয়া- নকল করেছিলেন। তাঁর এ লেখাটি জামায়াতে ইসলামী ভারতের মুখপত্র 'দাওয়াতে দিল্লী' (২৫, এপ্রিল, ৬৩ইং) নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং তারই সৌজন্যে উক্ত লেখাটা মাসিক আলফুরকানেও (জিলহজ্জ : ১৩৮২ হিঃ সংখ্যা) প্রকাশ করা হয়েছিল। বর্তমানে সেটাই আমার সামনে রয়েছে।

শামস পীরজাদা সাহেব উক্ত বিষয়ে মৌলিক আলোচনা করার পর নিম্নবর্ণিত উপসংহারের মাধ্যমেই তাঁর লেখার ইতি টেনেছিলেন–

"যদি গিলাফে-কাবার ব্যাপারে মিছিল অনুষ্ঠান ইত্যাদি করার জন্য উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা হয়ে থাকে, তাহলে এটা স্বয়ং বিদআত হবে। তদুপরি আরো অন্যান্য বহু বিদআত ও শিরক-এর দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে এবং আশংকা রয়েছে যে, কাবা-শরীফের গিলাফ নতুন 'তাজিয়া' প্রমাণিত হবে না-তো? এ সব কারণে আমি মাওলানা মাওদুদী সাহেবের নিয়্যতের উপর সন্দেহ পোষণ না করেই এটা বলতে পারি যে, তাঁর ইজতেহাদ সম্পূর্ণ ভুল এবং এর থেকে প্রত্যাবর্তন করাই তার জন্য উত্তম।" (মাসিক আল-ফুরকান : জিলহজ্ব ১৩৮২ হিঃ সংখ্যা, সূত্র-দাওয়াতে দিল্লী : ২৫ এপ্রিল' ৬৩ ইং সংখ্যা)

আমার জানা মতে এ কথা জানা নেই যে, মাওলানা মাওদুদী সাহেব তাঁর একজন অকৃত্রিম ভক্ত এবং নিজ দল জামায়াতে ইসলামী ভারতের একজন সদস্য শামস্ পীরজাদা সাহেবের উক্ত আবেদন মঞ্জুর করতঃ নিজের সে বিরাট ভুল থেকে মত পরিবর্তন করেছিলেন কি-না। যদি মত পরিবর্তন না করে থাকেন, তাহলে আমার মত অক্ষম ব্যক্তিও নিজের পুরানো সম্পর্কের ভিত্তিতে আবেদন করছি যে, তিনি যেন তাঁর এ মত পরিবর্তন করেন ও তার ঘোষণা দেন। অন্যথায় এ আশংকা রয়েছে যে, কাল যখন তিনি ইহজগতে থাকবেন না, তখন তাঁর অনুসারীরা এটাকে সনদ বানিয়ে ইকামতে দ্বীনের চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করার নামে ভবিষ্যতেও একই ধরনের অথবা তার চেয়ে মন্দ ও অনিষ্টকর কান্ড-কারখান করে বসবে।

চতুর্থ মারাত্মক ভুল

একটি মারাত্মক ও বিভ্রান্তিকর দাবী

"মাওলানা মাওদুদী ও জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারী মুসলমানদের 'পজিশন্' বা মর্যাদা তা-ই যা ইহুদী জাতির ছিল"

সম্প্রতি, মাত্র কিছুদিন আগে একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণীতে (২য় খন্ড) প্রকাশিত মাওলানা মাওদুদী সাহেবের একটি বয়ানের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বয়ানটি ছিল এই যে,

"এ সুযোগে আমি একটি কথা পরিষ্কারভাবে বলে দিতে চাই। তা হলো এই যে, আমাদের এ দাওয়াতের মত কোন দাওয়াত কোন মুসলিম জাতির মধ্যে জেগে উঠলে তাদেরকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করে দেয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সত্যের কোন বিক্ষিপ্ত অংশ বাতিলের সংমিশ্রণে আত্মপ্রকাশ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম জাতির জন্য তা গ্রহণ না করা এবং তার সহযোগিতা না করার একটা সংগত কারণ বিদ্যমান থাকে আর তাদের ওজর গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কিন্তু, সত্য যখন পূর্ণাঙ্গভাবে নিজের খাঁটি রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং ইসলামের দাবীদার জাতিকে তার প্রতি দাওয়াত দেওয়া হয়, তখন তার জন্য আবশ্যক হয়ে পড়ে যে, হয় সে উক্ত দাওয়াতে সাড়া দিয়ে সে খেদমত আঞ্জাম দেয়ার জন্য প্রস্তুত হবে, যা মুসলিম জাতি সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য, (অথবা) না হয় সে তাকে প্রত্যাখ্যান বা অগ্রাহ্য করে সে 'পজিশন' বা মর্যাদাই গ্রহণ করবে, যা ইতিপূর্বে ইহুদীরা গ্রহণ করেছিল। এমতাবস্থায়, এ দু'টি পন্থা ব্যতীত তৃতীয় কোন পন্থার অবকাশ উক্ত জাতির জন্য বাকী থাকেনা।"

এ পর্যায়ে মাওলানা মাওদুদী সাহেব সামনে অগ্রসর হয়ে আরো বলেন,

"বর্তমানে যেহেতু এই দাওয়াত ভারতে জেগে উঠেছে, তাই অন্ততঃ ভারতীয় মুসলমানদের জন্য তো পরীক্ষার সেই ভয়ংকর মুহুর্ত এসে গেছে। তবে বাকী থাকলো অন্যান্য রাষ্ট্রের মুসলমানদের কথা। আমরা তাদের নিকটও আমাদের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করছি। যদি সে প্রচেষ্টায় আমাদের সাফল্য অর্জিত হয়ে যায়, তবে যেখানে যেখানে আমাদের এ দাওয়াত পৌঁছে যাবে, সেখানকার মুসলমানরা একই পরীক্ষার সম্মুখীন হবে।" (জামায়াতে ইসলামীর কার্য-বিবরণী : ২য় খন্ড, ১৭, ১৮ পৃঃ)

মাওলানা মাওদুদী সাহেবের এ বয়ানটি ১৯৪৪ সালের। এর আগে কোন সময় এটা আমার দৃষ্টিগোচর অথবা কর্ণগোচর হয়েছিল কি–না, তা স্মরণ নেই। উপরে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাম্প্রতিককালে এক ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করার ফলেই আমার তা দেখার সুযোগ হয়েছে। আমার জানা ছিল না যে, মাওলানা মাওদুদী সাহেব

কখনো এ কথাও বলেছেন যে, মুসলিম জাতির যে সব লোকের নিকট তাঁর দাওয়াত পৌঁছে গেছে অথবা ভবিষ্যতে পৌঁছবে আর তারা তা গ্রহণ করবে না, তা হলে তাদের 'পজিশন' ও মার্যাদা তা-ই হবে, যা ইহুদীরা গ্রহণ করেছিল।

গরম-প্রকৃতি ও ক্রোধ-প্রভাবান্বিত ধরনের কোন লোক যখন কারো বিরুদ্ধে কঠোর বাক্য বা শব্দ (গালি হিসেবে) ব্যবহার করে, তখন তার আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য হয় না। বরং তার উদ্দেশ্য কেবল রাগ ও ক্রোধের প্রকাশই বুঝায়। কিন্তু, এটা পরিষ্কার যে, মাওলানা মাওদুদী সাহেবের উক্ত বয়ান এ ধরনের নয় এবং আমি যতটুকু জানি, তিনি গরম-প্রকৃতি ও ক্রোধ-প্রভাবান্বিত ধরনের লোকও নন। তদ্রূপ, তিনি পরিপার্শ্বিকতার দ্বারা প্রভাবান্বিত ধরনের লোকও নন যে, তাঁর উক্ত কথাকে "পরিপার্শ্বিকতার দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ার ফল" হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। বরং তাঁর বয়ানের শব্দাবলী থেকে প্রকাশ হচ্ছে যে তিনি পূর্ণ গুরুত্ব ও দায়িত্ব-সচেতনতার সাথে জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও নেতা হিসেবে সর্বস্তরের মুসলমানদেরকে এ সতর্ক বাণী প্রদান করেছেন যে, তারা যদি তাঁর দাওয়াত কবুল না করে, তা হলে তাদের 'পজিশন' ও মর্যাদা তা-ই হবে, যা ইহুদীদের ছিল।

দ্বীন ও শরীয়ত সম্পর্কে যার সামান্য জ্ঞানও রয়েছে তার কাছে এটা সংশয়মুক্ত যে, এ মর্যাদা কেবল আল্লাহ তাআলার প্রেরিত নবী-রসূলগণেরই হয়ে থাকে যে, তাদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান ও অগ্রাহ্যকারীদের 'পজিশন' ও মর্যাদা তা-ই হয়ে যায় যা ইহুদীদের ছিল। যারা পূর্বে হযরত ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তার পরবর্তী কালে শেষ নবী ও রসূল হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছে।

নবী-রসূল ব্যতীত উম্মতের কোন সংস্কারক, কোন ধর্ম-প্রচারক বা কোন মুজাদ্দেদও এ মর্যাদা প্রাপ্ত হয় না যে, তাঁদের দাওয়াত অগ্রাহ্যকারীদের সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, তারা সেই 'পজিশন' ও মর্যাদা গ্রহণ করেছে, যা ইহুদীরা গ্রহণ করেছিল।

আমার যতদূর জানা আছে, ইসলামের চৌদ্দশ' বছরের ইতিহাসে কোন সংস্কারক বা কোন মুজাদ্দেদ স্বীয় দাওয়াত সম্পর্কে এ ধরনের কথা বলেননি।-৩১

---

৩১. আমার স্বরণ আছে যে, জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠার একেবারে প্রাথমিক সময়ে যখন মাওলানা সৈয়দ সোলায়মান নদভী, মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী ও মাওলানা মানাজের আহসান গিলানী সাহেব প্রমূখ মাওলানা মাওদূদী সাহেবের ধর্মীয় চিন্তাধারা এবং তার উপর প্রতিষ্ঠিত দ্বীনী দাওয়াত সম্পর্কে কঠোরভাবে ভিন্নমত প্রকাশ করেছিলেন, তখন মাওলানা গিলানী স্বীয় একটি লেখায় অথবা পত্রে লিখেছিলেন যে, মাওদুদী সাহেব যে পদ্ধতি ও ভঙ্গীতে দাওয়াতের কাজ করছেন, এটা উম্মতের কোন মুজাদ্দেদ ও সংস্কারকের পদ্ধতি নয়। এটা আল্লাহর প্রেরিত নবীগণের দাওয়াতেই হয়ে থাকে। মাওদুদী সাহেব নবীদের অনুকরণ করতে চেষ্টা করেছেন। -মাওলানা মাওদুদী সাহেবের ১৯৪৪ইং সালের এ বয়ান তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও অকাট্য সাক্ষ্য।

মাওলানা মাওদুদী সাহেব সম্ভবতঃ এ কারণেই উক্ত বয়ানে এ কথা বিশ্বাস করানোর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন যে, তাঁর দাওয়াত ব্যতীত মুসলমানদেরকে দ্বীনের যে সব দাওয়াত প্রদান করা হয়ে আসছে এবং ইসলাম ও তাজদীদ (সংস্কার ও নবায়ন) এর যে সব প্রচেষ্টা চলে আসছে অথবা বর্তমানে চলছে, সে সবের মধ্যে সত্যের বিক্ষিপ্ত উপাদানসমূহের সাথে বাতিলেরও সংমিশ্রণ রয়েছে। কিন্তু তাঁর এবং তাঁর জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াতে পূর্ণাঙ্গ সত্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে নিজের খাঁটি রূপ সহকারে সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। তাই মুসলিম জাতির সর্বস্তরের লোকদের মধ্যে যার কাছে এ দাওয়াত পৌঁছে যাবে আর সে তা গ্রহণ করবেনা, তবে তার পজিশন ও মর্যাদা তা-ই হবে, যা ইহুদী জাতির হয়েছিল।-৩২

মাওলানা মাওদুদী সাহেবের উক্ত বয়ানের ভিত্তিতে আমি তাঁকে এ অভিযোগে অভিযুক্ত করছিনা যে, তিনি নিজের জন্য সে মর্যাদা ও স্থান প্রমাণিত করেছেন, যা নবী-রসূলগণেরই হয়ে থাকে। কিন্তু, এতে তো কোন সন্দেহ, সংশয় ও বিতর্কের অবকাশ নেই যে, উক্ত বয়ানে তিনি পরিষ্কার ভাষায় নিজের এই দৃষ্টিভঙ্গির ঘোষণা দিয়েছেন যে, "ভারতীয় মুসলিম জাতির সর্বসাধারণের মধ্যে যাদের নিকট তাঁর দাওয়াত পৌঁছে গেছে আর তারা তা গ্রহণ করেনি, বরং প্রত্যাখ্যান করেছে এবং অনুরূপভাবে আগামীতে ভারতে কিংবা অন্য কোন দেশে যাদের নিকট এ দাওয়াত পৌঁছবে আর তারা তা গ্রহণ করবে না, তা হলে তাদের মর্যাদা ও স্থান তা-ই হবে যা ইহুদীদের ছিল।"

এ কথা গোপনীয় বা অস্পষ্ট বিষয় নয় যে, স্বয়ং মাওলানা মাওদুদী সাহেবের প্রকাশিত পত্রিকা তরজুমানুল কোরআন এবং তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ আর বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত সেগুলোর অনুবাদ এবং জামায়াতে ইসলামীর প্রচার-প্রকাশনা ও প্রোপাগান্ডার ব্যাপক ও বিস্তৃত মাধ্যমসমূহের বদৌলতে যে লাখ লাখ কিংবা কোটি কোটি ব্যক্তির নিকট, বিশেষ করে কিতাব ও সুন্নাহর জ্ঞানের অধিকারী যে সব আকাবের ওলামার নিকট তাঁর দাওয়াত পৌঁছে গেছে, তাঁদের মধ্যে শতকরা পঁচানব্বই জন ব্যক্তিই তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করেননি। মাওলানা মাওদুদী সাহেবের উক্ত বয়ানের আলোকে তাঁরা সবাই সেই মর্যাদা ও স্থান গ্রহণ করেছেন, যা ইহুদীরা গ্রহণ করেছিল। আর তাঁদের 'পজিশন' বা মর্যাদা তা-ই, যা ইহুদীদের ছিল। হায়, এটা কত ভয়ংকর ও কত বিভ্রান্তিকর কথা!

---

৩২. ইমামে-রব্বানী হযরত মুজাদ্দেদে-আলফে-সানী, হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ, হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ ও শাহ ইসমাঈল শহীদ (রাঃ)-এর ইসলাহী ও তাজদীদী কাজ প্রসঙ্গে মাওলানা মাওদুদী সাহেব দ্ব্যর্থহীনভাবে নিজের এই মত প্রকাশ করেছেন যে, এ সবের মধ্যে খাঁটি সত্য ছিল না। অসত্যেরও সংমিশ্রণ ছিল। ('ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন' দ্রষ্টব্য)

আমি এ সম্পর্কে অনবহিত নই যে, মাওলানা মাওদুদী সাহেব তাঁর লেখায় ও বক্তৃতায় এ কথা বার বার প্রকাশ করেছিলেন যে- আমার দাওয়াত জামায়াতে ইসলামীর সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার প্রতি নয়, বরং সেই আকীদা, দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার প্রতি; যা আমি পেশ করেছি। কিন্তু, মাওদুদী সাহেব এবং তাঁর দলের প্রত্যেকটি শিক্ষিত ও সচেতন ব্যক্তির সম্ভবতঃ জানা থাকবে যে, কিতাব ও সুন্নাহর জ্ঞানের অধিকারী পাক-ভারত ও বাংলাদেশ) এর অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম 'আকীদায়ে তাওহীদ ও রেসালাত'-এর সে ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেননি, যা জামায়াতে ইসলামীর সংবিধানে পেশ করা হয়েছিল এবং যার উপর দাওয়াতের ভিত্তি। বরং মাওলানা মাওদুদী সাহেবের সেই চিন্তাধারার সাথেই মতবিরোধ পোষণ করেছেন, যার উপর উক্ত ব্যাখ্যা ও তাঁর পেশকৃত দৃষ্টিভঙ্গির বুনিয়াদ।

যারা জামায়াতে ইসলামীর প্রাথমিক যুগের অবস্থাদি সম্পর্কে কিছু অবগত আছেন, তাঁরা অবশ্যই জানেন যে, জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই যারা সর্বপ্রথম কঠোরভাবে ভিন্নমত পোষণ করেন, তারা ছিলেন মাওলানা সৈয়দ সোলায়মান নদভী, মাওলনা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী ও মাওলানা মানাজের আহসান গিলানী। তাঁরা তরজুমানুল কোরআন-এর প্রাথমিক কালের বিভিন্ন লেখায় আকৃষ্ট হয়ে মাওলানা মাওদুদীর বিশেষ ভক্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর সম্পর্কে অত্যন্ত ভাল ধারণা পোষণ করেছিলেন। বিশেষ করে মাওলানা দরিয়াবাদী সাহেব তো একেবারে মুগ্ধ ছিলেন। আমার ন্যায় তিনিও মাওদুদী সাহেবকে 'মুতাকাল্লিমে ইসলাম' বা ইসলামী দার্শনিক হিসেবে আখ্যায়িত করতেন। তখনকার সময়ে তাঁর সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সিদ্‌ক' পত্রিকার প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় অত্যন্ত সুন্দর প্রশংসার সাথে মাওলানা মাওদুদী এবং তরজুমানুল কোরআনের আলোচনা বর্তমান থাকতো। সে যাই হোক, তাঁরা নিয়মিতভাবে তরজুমানুল কোরআন অধ্যয়ন করতেন। তাঁর 'দাওয়াত' পৌঁছে যাবার পর এবং সে সম্পর্কে অবগত হওয়ার পরই তাঁরা মতবিরোধ শুরু করেন এবং দ্বীন সম্পর্কে মাওদুদী সাহেবের সেই চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথেই মত-বিরোধ করেন, যার উপরই তাঁর দাওয়াতের ভিত্তি রচিত হয়েছিল।

মাওলানা সৈয়দ সোলায়মান নদভী সাহেব স্বীয় পত্রিকা মাসিক 'মাআরেফে আজমগড়'-এ নিজের বিশেষ ভঙ্গী ও পদ্ধতিতে এর সমালোচনা করেন। মাওলানা দরিয়াবাদী সাহেব স্বীয় সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সিদ্‌ক' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এ বিষয়ে লিখতেন। কিছুকাল পর্যন্ত 'সিদক' পত্রিকার প্রায় প্রত্যেকটি সংখ্যায় এ বিষয়ের উপর কিছু না কিছু লেখা অবশ্যই ছাপা হতো আর তা নিজের বিশেষ ভঙ্গীতেই হতো। যাকে মাওলানা মাওদুদী সাহেব সে সময় "গেরিলা যুদ্ধ" হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। মাওলানা গিলানী সাহেব নিজের একটি দীর্ঘ পত্রে নিজের ভিন্নমত ব্যক্ত করেছিলেন। আমার মনে পড়ে, উক্ত পত্রটি গিলানী সাহেবের নাম প্রকাশ না করেই 'তরজুমানুল কোরআনে' ছাপা হয়েছিল। তাছাড়া তিনি এ পর্যায়ে মাওলানা দরিয়াবাদী সাহেবের নিকটও পত্র লিখতেন এবং এগুলোর নির্বাচিত অংশ 'সিদ্‌ক' পত্রিকায় ছাপানো হতো।

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাবর্ষ '৬০-৬১ হিজরীর ('৪১-৪২ ইং) তরজুমানুল কোরআনের সংখ্যাসমূহ অধ্যয়ন করেও উপরোক্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গের মতবিরোধের ধরন ও কঠোরতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

সে যা-ই হোক, আমার যতদুর জানা আছে, বড় বড় ওলামায়ে কেরামের মধ্যে সর্বপ্রথম এ তিন ব্যক্তিই নিজেদের মতবিরোধের কথা প্রকাশ করেন। তাঁরা সবাই জগত ও জগতের যাবতীয় বস্তু ও বিষয় সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ধরনের নিরেট "মাওলানা" ছিলেন না; বরং কয়েক জগতের অবস্থা, ধ্যান-ধারণা, চিন্তাধারা ও মতবাদ এবং অধুনা জাগ্রত আন্দোলন সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিলেন। আমার ধারণা মতে উপরোক্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণ তাঁদের সেই বিশেষ গুণের কারণে মাওলানা মাওদুদী সাহেবের চিন্তাধারা এবং তাঁর দাওয়াতের মধ্যে শুরু থেকেই সে আশংকা অনুভব করতে পেরেছিলেন, যা ভারতের অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম অনুভব করতে পারেন নি, যারা আধুনিক বিষয়াবলী সম্পর্কে তাঁদের মত অভিজ্ঞ ছিলেন না।

এরপর বিভিন্ন সময়ে উপমহাদেশের আকাবের ওলামায়ে কেরাম, যারা কিতাব ও সুন্নাহ জ্ঞানের উত্তরাধিকারী ও ধারক-বাহক ছিলেন, তারা মাওলানা মাওদুদী সাহেবের সাথে মতবিরোধ ব্যক্ত করেন এবং তাঁর দাওয়াতকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। এখানে উদাহরণস্বরূপ হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মদনী, মাওলানা মুফতি কেফায়াতুল্লাহ সাহেব দেহলভী, মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী, মাওলানা মোঃ ইউসুফ বিন্নোরী, শায়খুল হাদীছ মাওলনা মোঃ যাকারিয়া ও মাওলানা শাহ আব্দুল গনী ফুলপুরী (রাঃ) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। "জামায়াতে আহলে হাদীছ"-এর কোন কোন আকাবের ওলামাও অনুরূপ কঠোরতার সহিত তাঁদের মতবিরোধের কথা ব্যক্ত করেন।

কিছু সংখ্যক ওলামায়ে আকাবের এমনও আছেন, যারা যদিও মাওলানা মাওদুদী সাহেব ও তাঁর দলের দাওয়াতের সাথে নিজেদের মতবিরোধের কথা এ রকম কঠোরভাবে ব্যক্ত করেননি, তবুও তাঁর দাওয়াত কবুল করেননি। আমার জানা মতে, উদাহরণ স্বরূপ হাকীমুলউম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী এবং তাঁর সাথে সম্পর্কিত অধিকাংশ আকাবের ওলামা, হযরত মাওলানা শাব্বির আহমদ ওছমানী, মাওলান মুফতি মোহাম্মদ শফি দেওবন্দী, মাওলানা জাফর আহমদ ওছমানী, মাওলানা শামসুল হক আফগানী, মাওলানা ওযাইর গুল সরহদী ও মাওলানা আব্দুল হক (আকুড়া খটক) (রাঃ) সাহেব প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়।-৩৩

৩৩. এখানে হযরত থানভী (রাঃ)-এর একটা ঘটনা উল্লেখ করা ভাল বলে মনে করি। এ ঘটনাটির সম্পর্ক আমারই সাথে এবং এটা আগে কখনো লিপিবদ্ধ হয়নি।

জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানা মাওদুদী সাহেবের সাথে আমার যেরূপ সম্পর্ক ছিল এবং যেরূপ আমি তাঁর দাওয়াতের ঝান্ডাবাহী ছিলাম তার আলোচনা "ইতিবৃত্তের" পর্যায়ে করা হয়েছে। জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠার অল্প দিন পরে আমি "প্রতিষ্ঠা সম্মেলনের কার্য-বিবরণী" ও "সংবিধানের" এক একটি কপি হযরত থানভী (রাঃ)-এর নিকট প্রেরণ করি আর দরখাস্তের মাধ্যমে আরজ করি, তিনি যেন সেগুলো পড়ে দেখেন এবং তিনি যে স্থানে

(এরপর পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

উপমহাদেশের জামাতে-আহ্‌লে হাদীছের আকাবেরে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, মাওলানা ইবরাহীম শিয়ালকোটী, মাওলানা আবুল কাসেম সাইফ বেনারসী, মাওলানা দাউদ গয্‌নভী ও মাওলানা মোহাম্মদ ইসমাঈল গুজরানওয়ালাবী (রাঃ) প্রমুখ এবং সম-সাময়িক কালের প্রায় সব আকাবের ওলামায়ে আহ্‌লে-হাদীছের অবস্থাও (যতদুর জানা আছে) এটাই ছিল যে, তাঁরা মাওলানা মাওদুদী সাহেব ও তাঁর দলের দাওয়াত কবুল করেন নি।

এর বিপরীত, সমগ্র উপমহাদেশের নির্ভরযোগ্য ওলামাদের মধ্যে (না ওলামায়ে 'আহ্‌লে হাদীছের' মধ্যে, আর না ওলামায়ে-আহনাফ এর মধ্যে) কারো সম্পর্কে আমার জানা নেই যে, যারা তাঁর দাওয়াত গ্রহণপূর্বক নিজের সাবেক দ্বীনি দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার মধ্যে কোন ধরনের সংস্কার ও পরিবর্তন করেছেন। একই অবস্থা সাধারণ দ্বীনদার মুসলমানদের অধিকাংশেরও। তাঁরাও মাওলানা মাওদুদী সাহেব ও তাঁর দলের দাওয়াত কবুল করেন নি। তাঁরাও মাওলানা মাওদুদী সাহেব ও জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াতের কারণে তাঁদের যে আক্বীদা, যে মসলক ও যে দ্বীনি কর্ম-পদ্ধতি আগে ছিল, তম্মধ্যে কোন পরিবর্তন সাধন করেন নি। তাঁদের এ কাজ নিজেদের প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার কারণে হোক, কিংবা নিজেদের নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে কেরামের অনুসরণের কারণেই হোক। তা হলে মাওলানা মাওদুদী সাহেবের উপরোক্ত বয়ান মোতাবেক মুসলিম উম্মাহর উপরোক্ত সাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গ সবাই কি সেই 'পজিশন' ও মর্যাদা গ্রহণ করে নিয়েছেন, যা ইহুদীরা গ্রহণ করেছিল? (ইন্না লিল্লাহ!)

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)

আমদের এ কাজের বিশেষ করে 'সংবিধানে' কোন ভুল ত্রুটি লক্ষ্য করবেন, তা যেন আমাদের ধরিয়ে দেন। আমি চেষ্টা করবো, যাতে তা সংশোধন ও সঠিক করা যায়। আমি আরো লিখি, আপনি যদি নির্দেশ প্রদান করেন তাহলে এ উদ্দেশ্যে আমি আপনার খেদমতে উপস্থিত হবো। (আসলে, এ পত্র প্রেরণের পেছনে আমার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যদি হযরত থানভী (রাঃ) 'সঠিক' বলে সত্যায়িত করেন, তা হলে আমার জন্য একটা সনদ হয়ে যাবে।)

হযরত থানভী (রঃ)-এর সাথে আমার ভক্তি ও মুখাপেক্ষীর সম্পর্ক ছিল এবং তিনি আমাকে খুবই স্নেহ, দয়া ও সাহায্য করতেন। তাঁর স্বীয় নিয়ম মতে আমার পত্রের মধ্যেই তিনি সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখেছিলেন। এর সার কথা ছিল এই যে, "আমি কপি দু'টি পড়ে দেখেছি। আপনাদের নিকট লিখার মত কোন বিশেষ ভুল ধরা পড়েনি, কিন্তু অন্তর গ্রহণ করে না। আপনি যে কোনও সময় আসেন, আপনার আগমন আমার জন্য আনন্দের কারন হবে। কিন্তু এ উদ্দেশ্যে সফরের কষ্ট স্বীকার না করা হোক।" (লাইন টানা বাক্যটি,"কিন্তু অন্তর গ্রহণ করেনা" হুবহু তাঁরই উচ্চারিত।)

অতঃপর কিছুদিন পর আমি মাওলানা জমীল আহমদ থানভী (রাঃ)-এর একটি পত্র পাই। (তিনি থানভী (রাঃ)-এর নিকটজন ও বিশেষ খাদেমের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।) তিনি লিখেছেন, আপনি জামায়াতে ইসলামীর সম্মেলনের যে 'কার্য-বিবরণী' ও 'সংবিধান থানভী (রাঃ)-এর নিকট প্রেরণ করেছিলেন, সেগুলো ভাল ভাবে দেখা ও মতামত প্রকাশের জন্য তিনি আমাকে অর্পণ করেছিলেন। আমি গভীরভাবে সেগুলো পড়ে দেখেছি। এতে অনেক সংশোধনযোগ্য বিষয় আমার নজরে পড়েছে। আমি সেগুলো সব লিখে তাঁর সমীপে পেশ করলে তিনি পড়ে দেখার পর বললেন যে, আমি যেন আপনার (মোহাম্মদ মন্‌জুর নোমানী) নিকট সেগুলো প্রেরণ করি। এ পরিপ্রেক্ষিতেই আপনার নিকট এগুলো প্রেরণ করছি।

উক্ত পত্রে মাওলানা জামীল আহমদ সাহেব "সংবিধানে" অধিকাংশ সে সব অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন আর আশংকা ও খট্‌কা প্রকাশ করেছিলেন, যা পরবর্তী কালে নির্ভরযোগ্য আকাবের ওলামার পক্ষ থেকে করা হয়। কিন্তু, সে সময় এসব বিষয়কে আমি গুরুত্ব প্রদান করতাম না। কেবল বর্ণনা ও রচনাভঙ্গীর পার্থক্য বলে মনে করতাম। কিন্তু পরে জানতে পারলাম যে, তা কেবল বর্ণনার পার্থক্য ছিল না, চিন্তাধারা ও আকীদার পার্থক্য ছিল।

আমার ধারণা, মাওলানা মাওদুদী সাহেবের উক্ত বয়ানের লক্ষ্য তাঁর 'দাওয়াত' অগ্রাহ্যকারীদের কাফির সাব্যস্ত করা নয়। যা মির্জা গোলাম আহমদ-এর অনুসারীদের মধ্যে কাদিয়ানী গ্রুপের ভুমিকা। বরং সম্ভবত: তিনি তাদেরকে কাফির সাব্যস্ত না করেই ইহুদীদের মত আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রহমত থেকে বঞ্চিত ও 'মগযুব আলাইহিম' (অভিশপ্ত) সাব্যস্ত করেছেন। এটা সেই ভূমিকা ও ধ্যান-ধারণার কাছাকাছি, যা মির্জা গোলাম আহমদ এবং তার দাওয়াত অগ্রাহ্যকারী মুসলমানদের সম্পর্কে কাদিয়ানীদের লাহোরী গ্রুপের ভুমিকা ও ধ্যান-ধারণা। যার নেতা ছিলেন মওলবী মোহাম্মদ আলী (এম-এ) লাহোরী।

এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করা ভাল হবে মনে করি, যার সম্মুখীন হয়েছিলাম আমি নিজেই। ১৯৪৪-এর শেষের দিকে অথবা ১৯৪৫ সালের গোড়ার দিকে আমি এক তাবলীগি জামাতের সাথে দিল্লী থেকে পেশোয়ার, বরং কোহাট পর্যন্ত সফর করেছিলাম। উক্ত সফরে জালন্দর এবং তৎসংলগ্ন কয়েকটি বস্তিতে আমাদের অবস্থান হয়েছিল। আমার সঠিক স্মরণ নেই যে, একেবারে জালন্দর শহরে, না তার অন্তর্গত কোন বস্তিতে অবস্থান করার সময়ে একদিন জামায়াতে ইসলামীর কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। আমি তাঁদের সাথে পৃথকভাবে বৈঠক করি। (যেমন "ইতিবৃত্তের" মাধ্যমে হয়তো জানতে পেরেছেন যে, আমি ১৯৪২ ইং সালে 'জামায়াত'-এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলাম এবং উক্ত সময়ের মধ্যে এ বিষয়ে কারো সাথে আলোচনা করাকেও আমি এড়িয়ে চলতাম।) তাঁরা জামায়াতে ইসলামীর সাথে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার প্রসঙ্গ নিয়েই আমার সাথে আলোচনা করতে চাইলেন। আমি এ ব্যাপারে দূরে সরে থাকার নীতি গ্রহণ করলাম। তাঁরা পীড়াপীড়ি করলেন। কিন্তু, আমি আমার নীতির উপর অটল থাকলাম। অবশেষে তাঁদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি অত্যন্ত ক্রোধ ও রাগান্বিত হয়ে বললেন, "আমি পরিষ্কার ভাষায় বলে দিচ্ছি, আপনি মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেছেন। আমি আহবান করছি, তওবা করে পুনরায় আপনি ইসলামে প্রত্যাবর্তন করুন।"

আমার উপর মহান আল্লাহর বড় অনুগ্রহ ছিল যে, তখন আমার মোটেও রাগ আসেনি। তখন আমি তাঁদেরকে কি বলেছিলাম, তা এখন আমার মনে নেই। আমি অনুভব করেছিলাম, তিনি ব্যতীত অন্য ৩/৪ ব্যক্তি যারা তাঁর সাথে ছিলেন, তারা তাঁদের সাথীর উক্ত কথায় দুঃখিত ও লজ্জিত হয়েছিলেন। তাঁরা আমার কাছে কিছু অপরাগতাও প্রকাশ করে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন। তখন আমি এটা মনে করেছিলাম যে, সে বেচারা যা কিছু আমাকে বলেছে, (মাওলানা মাওদুদী সাহেবের ভাষায়) "এটা ছিল তাঁর মুসলিম সুলভ আবেগ। তার সাথে অজ্ঞতা ও কথা বলার আদবের স্বল্পতারই ফল।" কিন্তু উপরোক্ত বয়ান আমার সম্মুখে আসার পর সন্দেহ হয় যে সে ব্যক্তি মাওলানা মাওদুদী সাহেবের উক্ত বয়ান থেকেই হয়তো এটা বুঝেছিল যে, যে ব্যক্তি জামায়াতে

ইসলামীতে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার পর সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, সে ইসলাম থেকেই বাহির হয়ে গেছে এবং ইহুদী ও মুরতাদ হয়ে গেছে। তাই সে 'বীর পুরুষের' ন্যায় স্পষ্টবাদিতার আশ্রয় নিয়েছে।

এভাবেই উপদল বা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় :

মাওলানা মাওদুদী সাহেব নিজের বিভিন্ন লেখায় বার বার এ দাবী করেছেন এবং পূর্ণ শক্তি দিয়ে নিজের অনুসারীদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত যে সব দ্বীনের খেদমতকারী আছেন, তাদের কাছে কেবল দ্বীনের কোন অংশ অথবা কিছু অংশ রয়েছে। তারা কেবল তা-ই নিয়ে বসে আছে। 'পূর্ণাঙ্গ দ্বীন' ও 'খাঁটি সত্যের' দাওয়াত নিয়ে কেবল তারাই ময়দানে নেমেছেন। অতঃপর ১৯৪৪ ইং সালের বয়ানে (যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে) তিনি আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে এ হুকুম সাথে জুড়ে দিলেন,- "আমার এ দাওয়াত পৃথিবীর যে অংশেই হোক না কেন, যে সব মুসলমানের নিকট পৌঁছে যাবে ও তারা তা গ্রহণ করবেনা, তাহলে তাদের 'পজিশন' তা-ই হবে, যা ইহুদী জাতির ছিল।"

এটাই সে বিষয় যা জামায়াতে ইসলামীকে প্রকৃতপক্ষে একটা সম্প্রদায় হিসেবে গড়ে তুলেছে। কোন সম্প্রদায় এ ঘোষণা দিয়ে সৃষ্টি হয় না যে, সে একটা সম্প্রদায় হিসেবে গড়ে উঠছে। বরং তাঁর নিজস্ব ধর্মীয় চিন্তাধারা, মতামত ও দাবীসমুহই তাকে উপদল বা সম্প্রদায় হিসেবে গড়ে তোলে। আপনি যখন একথা বলবেন যে, পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ও খাঁটি সত্য কেবল আপনার কাছেই রয়েছে এবং আপনিই তার দাওয়াত নিয়ে খাড়া হয়েছেন, আপনি ছাড়া অন্যান্য মুসলমান, ওলামায়ে কেরাম ও মশায়েখে এ'জামের নিকট যে দ্বীন আছে, তা-ও আংশিক অথবা বাতিল মিশ্রিত এবং আপনার দাওয়াত গ্রহণ করা তাঁদের জন্য আবশ্যক, যদি গ্রহণ না করে তা হলে তাদের 'পজিশন' ও মর্যাদা তাই হবে যা ইহুদী জাতির ছিল, তখন আপনিই তো আপনার এবং অন্যান্য মুসলমান জাতির মধ্যে পার্থক্য ও ভেদ-রেখা টেনে দিচ্ছেন এবং এভাবেই আপনা-আপনিই একটা স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের জন্ম হয়ে যায়। যদিও বা আপনি হাজার বার ঘোষণা করেন না কেন, "আমরা কোন সম্প্রদায় নই এবং আমরা সম্প্রদায় সৃষ্টির বিরোধী।"

কাদিয়ানীদের লাহোরী গ্রুপের বিখ্যাত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব খাজা কামালুদ্দিন সাহেব সম্ভবতঃ ইউরোপের কোন একটি দেশের এক সম্মেলনে একবার বক্তৃতা করেছিলেন অথবা প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। তার শিরোনাম ছিল "ইসলামে কোন সম্প্রদায় নেই।" তার উর্দু অনুবাদও পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। আজ থেকে প্রায় ৫০ বছর আগে আমি সেটা পড়েছিলাম। আমার ধারণা মতে, মাওলানা মাওদুদী সাহেব এবং জামায়াতে ইসলামীর অন্যান্য সচেতন পাঠকসমাজের নজরেও হয়তো সেটা পড়েছিল। তিনি

তা'তে স্বীয় সম্প্রদায় (কাদীয়ানীদের লাহোরী গ্রুপ) সম্পর্কে একথা বুঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, সেটা কোন 'সম্প্রদায়' নয়। কিন্তু উক্ত ঘোষণার ফলে কি তার সম্প্রদায় হওয়ার কারণসমূহও নিঃশেষ হয়ে গেছে?

আমার জানা আছে যে, স্বয়ং মাওলানা মাওদুদী সাহেব এবং জামায়াতের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ একথা বার বার লিখেছেন যে, "জামায়াতে ইসলামী কোন সম্প্রদায় নয়।" কিন্তু, উপরোল্লিখিত বিশেষ বিশেষ মতবাদ ও দাবীসমূহ-এর প্রবক্তা হওয়া সত্বেও একথা লেখা, খাজা কামালুদ্দীন সাহেবের ঘোষণা থেকে মোটেই ভিন্ন কিছু নয়।

জামায়াতে ইসলামীর কোন কোন মুখপত্র 'সম্প্রদায়' না হওয়ার দলিল হিসেবে একথাও বার বার লিখেছেন যে, আমরা তো জামায়াতে ইসলামীর সাথে সম্পর্ক রাখে না এমন সব 'মসলক' -এর অনুসারী সকল মুসলমানদের পেছনেও নামায পড়ি, তাহলে আমরা (আলাদা) 'সম্প্রদায়' কিভাবে হতে পারি? আমার বক্তব্য হলো এই যে, এ ধরনের কর্মনীতি যে, যে কোন ধরনের চিন্তাধারা ও মসলক এর অনুসারীদের পেছনে নামায আদায় করা যাবে, (যদিও জানা থাকে যে তার আক্কীদায়ে-তাওহীদ সঠিক নয়, কবর অথবা তাজিয়া-পুজারী, অথবা মাওদুদী সাহেব এবং জামায়াতে ইসলামীর পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ও খাঁটি সত্যের দাওয়াত পৌঁছে যাবার পরও তা গ্রহণ না করে বরং প্রত্যাখান করে, সেই 'পজিশন' ও মর্যাদা গ্রহণ করে নিয়েছে, যা ইহুদী জাতিরা গ্রহণ করেছিল) এটা 'সম্প্রদায়' না হওয়ার দলিল তো কোন যুক্তি মতেই হতে পারে না। হ্যাঁ, তবে একথার আলামত অবশ্যই হতে পারে যে, নামাযকেও রাজনীতিতে পরিণত করা হয়েছে। সে রকম নামায মাওদুদী সাহেবের পেছনেও পড়া যায় এবং মিষ্টার জিন্নাহর মত কোন আগাখানী, কোন ইসমাঈলীর পেছনেও পড়া যায়। এভাবে কোন কবরপুজারী অথবা কোন তাযিয়া-পুজারীর পেছনেও পড়া যায়। একথা সুস্পষ্ট যে, এটা দ্বীনদারী নয়; দোকানদারী (ব্যবসা)। -(নাউযুবিল্লাহ মিন্ শুরুরে আন্ফুসিনা)।

সবশেষে, আমি পুরনো সম্পর্কের ভিত্তিতে মোহতরম মাওলানা মাওদুদী সাহেব ও তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু-বান্ধব এবং হিন্দুস্তান-পাকিস্তানের (বাংলাদেশসহ) দায়িত্বশীল ভাইদের নিকট আরয করছি যে, এ লেখায় আমি ধর্মের মৌলিক পরিভাষার আধুনিক রাজনৈতিক ব্যাখ্যা, ধর্মীয় কাজে হিকমতে আমলীর দর্শন, গিলাফে কাবার ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী এবং সবশেষে ১৯৪৪ ইং সালের উপরোল্লিখিত বয়ান সম্পর্কে যা কিছু আরয করেছি, তার উপর গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করুন। নিজের মৃত্যুর দৃঢ় বিশ্বাস ও পরকালের হিসাবের কথা সামনে রেখে একবার ভেবে দেখুন।

এরপর আপনার যদি উপলব্ধি হয় যে, উপরে যা কিছু লেখা হয়েছে তা কেবল শত্রুতামূলক অপবাদ রটানো অথবা কেবল ভুল বুঝা-বুঝিই নয়, বরং বাস্তব ও ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ফিৎনা ও ভ্রান্তির যে সব আশংকাকে চিহ্নিত করা হয়েছে, তা

কেবল ভিত্তিহীন কল্পনা ও ধ্যান-ধারণাই নয়; বরং এসব ভুলের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক ফলাফল রয়েছে, তাহলে এর থেকে প্রত্যাবর্তন করে সংস্কার ও সংশোধনের মাধ্যমে ফিৎনা ও ভ্রান্তি থেকে বিশেষ করে নিজেদের অনুসারীদের রক্ষা করার দায়িত্ব আদায় করুন এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও ভালবাসা অর্জন করুন।-(নিশ্চয় আল্লাহ তওবাকারীদের পছন্দ করেন।)

সম্ভবতঃ মাওলানা মাওদুদী সাহেব এবং তাঁর বহু সংখ্যক বন্ধু-বান্ধবদের নিকটও এ প্রসিদ্ধ ঘটনাটি জানা থাকবে যে, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রাঃ)-এর নিজে নিজে অথবা কোন সমালোচক অথবা অভিযোগকারীর অভিযোগের কারণে যখন একথা অনুভূত হয় যে, আল্লাহর রহমতে তিনি অনেক কিতাব লিখেছেন, সেগুলোতে তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়তো হয়েছে, তখন তিনি একজন সচেতন ব্যক্তি ও সুদক্ষ আলেমকে (মাওলানা হাবীব আহমদ কিরানবীকে) যিনি স্বভাবগতভাবেই সমালোচনা ও ত্রুটি- বিচ্যুতির পর্যালোচক ছিলেন, নিজের পক্ষ থেকে বেতন দিয়ে এই কাজের জন্য নিয়োগ করেন, যাতে তিনি তাঁর রচিত কিতাবসমূহ সমালোচকের দৃষ্টিতে পাঠ করেন এবং কোন ভুল-ত্রুটি লক্ষ্য করলে তা চিহ্নিত করেন। অনেক দিন পর্যন্ত এ কাজ জারী থাকে। এর ফলে গবেষণা ও মতবিনিময়ের পর হযরত থানভী (রাঃ) অনেক মাসয়ালায় নিজের পূর্ববর্তী মত ও গবেষণা প্রত্যাহার করে নেন এবং নিজের কিতাব ও ফতওয়ার মধ্যে অনেক স্থানে পরিবর্তন অথবা সংশোধন করেন এবং একথা ঘোষণা করে দেওয়া জরুরী মনে করেন। অতঃপর এগুলোকে একটি বৃহৎ কিতাবাকারে "তরজিহুর রাজেহ" নাম দিয়ে প্রকাশ করেছেন। নিশ্চয় সত্য-পূজা ও খোদাভীতির পথ এটাই। ("আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই পথ অবলম্বনের তাওফীক দান করুন"।

পরিশিষ্ট

মাওলানা মাওদুদী সাহেব ও জামায়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত ভাইদের সমীপে

আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন যে, জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা ও রূপরেখা প্রণয়ন এবং এর প্রাথমিক প্রচারণা ও গঠনমূলক কর্মতৎপরতায় মাওলানা মাওদুদী সাহেব -এর সাথে আমিও একজন প্রথম কাতারের অংশীদার ও সহযোগী ছিলাম। এমনকি, মাওলানা মাওদুদী সাহেব -এর পরে একাজে সর্বাধিক ভূমিকা আমারই ছিল বললে মোটেই অত্যুক্তি হয় না। এ সম্পর্কে মোটামুটি কিছু আলোচনা "আমার সাহচর্যের ইতিবৃত্তে"র পর্যায়ে আগেই হয়ে গেছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মাওলানা মাওদুদী সাহেব ও জামায়াতে ইসলামীর সাথে আমার সম্পর্ক স্থাপনের উক্ত সিদ্ধান্ত এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ নিঃস্বার্থপরতার ভিত্তিতেই হয়েছিল। কোন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ও জাগতিক স্বার্থের কল্পনাও তখন হতে পারতোনা। শুধু দ্বীনের খেদমত ও আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজের পরকাল সাজানোর নিয়্যতই সক্রিয় ছিল।

সে যা-ই হোক, আমার নিজের সম্পর্কে যেমন আমার এ দৃঢ় বিশ্বাস, তদ্রুপ, আপনাদের সম্পর্কেও আমার এ সু-ধারণা রয়েছে। এরই ভিত্তিতে আপনাদেরকে এবং মাওলানা মাওদুদী সাহেব -কে সামনে রেখেই পুর্ববর্তী আলোচনাসমূহ পেশ করা হয়েছিল এবং কোন কোন বিষয় বিশেষভাবে তাঁকেই সম্বোধন করে নিবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ও তক্‌দীরের ফয়সালায় গ্রন্থটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হবার আগেই তিনি পরকালে পাড়ি দিয়েছেন এবং আমাদের জগত থেকে বিদায় নিয়ে মালেকে-হাকীকির দরবারে পৌঁছে গেছেন- যেখানে আমাদের সবাইকে উপস্থিত হতে হবে। এখন আমাদের উপর তাঁর পাওনা হচ্ছে, আমরা যেন তাঁর জন্য এবং আমাদের নিজেদের জন্যও সর্ব প্রকার ভুল-ত্রুটির মার্জনা, মাগফিরাত ও করুণার প্রার্থনা করি বিশ্ব প্রভুর দরবারে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এ দায়িত্ব পুরোপুরি পালনের তাওফীক দান করুন।

এখানে মাওলানা মাওদুদী সাহেব -এর পরিবর্তে সেসব বিশেষ আবেদন-নিবেদন জামায়াতে ইসলামীর সেই সব রুকন ও নীতি-নির্ধারকগণকেই সম্বোধন করে লিখিত বলে ধরে নিতে হবে, যাদের হাতেই জামায়াতে ইসলামীর দায়িত্ব অর্পিত। বলা-

বাহুল্য যে, নিঃসন্দেহে এটা এক বিরাট দায়িত্ব। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে তাওফীক দান করুন, যাতে এ কর্তব্য ও দায়িত্বের গুরুত্ব ও কাঠিন্য তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন।

আমি একথা জানি এবং গোটা জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যে, কোন বিশেষ দাওয়াত ও মসলককে গ্রহণ করা এবং কোন বিশেষ ব্যক্তিত্ব বা সমষ্টিক সংস্থা কিংবা কোন দল বা গ্রুপের সাথে নিয়মতান্ত্রিকভাবে জড়িত হওয়ার পর তার ভুল-ক্রটি কিংবা তার সম্পর্কে নিজের রায়ের ভুল উপলব্ধি করা আর সে উপলব্ধি মোতাবেক সিদ্ধান্ত ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা নেহায়েত কঠিন কাজ হয়ে পড়ে এবং অসাধারণ সংকল্পের প্রয়োজন হয়। আর তখনই আল্লাহ-প্রেম ও নিঃস্বার্থপরতার কঠিন পরীক্ষার সময় উপস্থিত হয়।

নিকট অতীতে, বরং বলা উচিৎ-যে, আমাদেরই যুগের এ ধরনের দু'টি উদাহরণ আমাদের সবার সম্মুখে রয়েছে।

প্রথম উদাহরণ :

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ইসলামের তাবলীগ ও প্রচার-প্রসারে এবং অন্যান্য ধর্ম, বিশেষ করে খৃষ্টানধর্ম ও হিন্দুধর্মের মোকাবেলায় তার সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা এবং সমগ্র বিশ্বে ইসলামের ঝান্ডা বুলন্দ করার নামে বিশেষ এক মিশনারী পদ্ধতিতে কাজ শুরু করে দেয়ার পর এর জন্যে শুরুতেই একটি দল গঠন করে। তখনও মির্জা সাহেবের পক্ষ থেকে এমন বিষয়াবলীর প্রকাশ পায়নি, যেগুলো মুসলমানদের জন্য ভীতি ও আশংকার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং যদ্বারা জানা যায় যে, এ ব্যক্তি ধর্মীয় ব্যাপারে অনির্ভরযোগ্য। এই কারণে তখন অনেক বড় বড় জ্ঞানী-গুণী ও বুদ্ধিজীবি তার দাওয়াতে সাড়া দিয়ে তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং তার দলের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। তাঁরা মির্জা সাহেবকে সব ধরনের সহযোগিতা করেন এবং এ কাজে অনেক কোরবানী স্বীকার করেন। অতঃপর এমন এক সময় আসে, যখন মির্জা সাহেব নিজের সম্পর্কে নতুন নতুন দাবী প্রচার করতে শুরু করে। যার কারণে ওলামায়ে কেরাম তার বিরুদ্ধে ভিন্নমত প্রকাশ করতে বাধ্য হন এবং সাধারণ মুসলমানদের মধ্যেও তার বিরুদ্ধে আশংকা ও ঘৃণার সৃষ্টি হয়। কিন্তু তার হাতে যারা নিঃস্বার্থভাবে বাইয়াত হয়েছিলেন, তারা ঐসব দাবীকে ধীরে ধীরে হজম করতে থাকেন। বরং বলা উচিত যে, সে সবের উপর ঈমান আনতে থাকেন। কিন্তু, এরপর এমন এক সময় আসে, যখন আল্লাহ্ তাআলা মির্জা সাহেবের মাধ্যমে এমন কিছু নিকৃষ্ট মানের ও বোকামীপূর্ণ ভুল সংঘটিত করান, যার কারণে দু'য়ে দু'য়ে চার ও দিবালোকের ন্যায় জনসমক্ষে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এ ব্যক্তি সত্যবাদী নয়। আল্লাহ্ তাআলার উপর মিথ্যা

অপবাদ রটানোতেও সে দুঃসাহস ও দৌরাত্ম্য প্রদর্শন করে। যার সবচেয়ে উজ্জ্বল, দ্ব্যর্থহীন ও অকাট্য উদাহরণ আহমদী বেগমের লজ্জাজনক কাহিনী এবং এ প্রসঙ্গে মির্জা সাহেবের লাগাতর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ, যা সে আল্লাহর ইলহামের উদ্ধৃতি দিয়ে করে যাচ্ছিল। অতঃপর আল্লাহ তাআলা উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহকে ভুল প্রমাণিত করে চক্ষুষ্মানদেরকে দেখিয়ে দেন যে, ইলহামের ব্যাপারে এ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী। এ ধরনের আরো একাধিক উদাহরণ রয়েছে।

কিন্তু, রাব্বুল-আলামীনের মহিমা বুঝা বড় দায়। মির্জা সাহেবের "নিঃস্বার্থপর মুরীদগণ"-এর মধ্য থেকে মওলবী মোহাম্মদ আলী লাহোরী (এম-এ) ও খাজা কামালুদ্দীন-এর মত জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবির নিকট উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ মিথ্যা ও আল্লাহর উপর অপবাদ প্রমাণিত হওয়ার পরও শপথভঙ্গ করে মির্জা সাহেব ও তার দল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার তাওফীক্ হয়নি। অথচ, যারা উক্ত ব্যক্তিদ্বয় সম্পর্কে অবগত আছে তারা জানে যে, মির্জা সাহেবের সাথে জড়িত থাকার মধ্যে তাদের কোন জাগতিক লাভ তো ছিল না; বরং লোকসান ও ক্ষতির পরিমাণই বেশী ছিল। আসল কথা হলো, কোন বিশেষ মসলক ও গ্রুপের সাথে জড়িত হয়ে যাবার পর তার ভুল-ক্রটি অথবা তার সম্পর্কে নিজের রায়ের ভুল উপলব্ধি করে সে মোতাবেক সিদ্ধান্ত ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বিরাট সাধনা ও অসাধারণ সংকল্পের প্রয়োজন পড়ে। এ ধরনের সংকল্প গ্রহণের সৌভাগ্য আল্লাহর সেই বান্দাগণই লাভ করতে পারেন, যাদের উপর আল্লাহ তাআলা বিশেষ অনুগ্রহ করেন।

দ্বিতীয় উদাহরণ :

দ্বিতীয় উদাহরণ হলো, 'খাক্সার আন্দোলন'। এ আন্দোলন আজ থেকে মাত্র ৪৫/৫০ বছর আগে আমাদেরই দেশ পাঞ্জাব থেকেই গড়ে উঠেছিল। এ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও অন্যতম নেতা ছিলেন আল্লামা এনায়েতুল্লাহ মাশরেকী সাহেব। তার আন্দোলনের মূল দাবী ও শ্লোগান ছিল এই যে, আজ পর্যন্ত সমস্ত ওলামায়ে কেরাম ও মওলবীরা 'ইসলাম', 'ঈমান' ও 'আমলে-সালেহ' এর কোরআনী দাওয়াতের যে মর্মার্থ বুঝে আসছেন ও প্রচার করেছেন, তা সব ভুল, সম্পূর্ণ ভুল। সঠিক মর্মার্থ হচ্ছে, যা তিনি নিজে বুঝেছেন এবং 'তাযকিরাহ' ইত্যাদির মত নিজের রচনাসমুহে পেশ করেছেন। যার সারকথা হচ্ছে, "সব কিছু বাদ দিয়ে বৈষয়িকভাবে শক্তিশালী হয়ে যাও। বিশেষ করে সামরিক জীবন গ্রহণ করে জাগতিক প্রতিপত্তি অর্জনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও। যেমন, আজকের ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের অবস্থা। এটাই হলো, 'ইসলাম', 'ঈমান' ও "আমলে সালেহ সম্পন্ন জিন্দেগী"।

আল্লামা এনায়েতুল্লাহ মাশরেকী সাহেব প্রকাশ্যে লিখতেন ও বলতেন যে, "আমাদের যুগে সত্যিকার 'সালেহ মুমিন' হচ্ছেন ইংরেজ প্রমুখ ইউরোপীয়

সম্প্রদায়সমূহ, যারা নিজস্ব শক্তি ও ক্ষমতা বলে বিশ্বের বিরাট অংশের উপর কর্তৃত্ব করছেন।"

তিনি মুসলমানদের বিশেষ করে তরুণদেরকে জোর দিয়ে বলতেন, "সৈনিকদের মত খাকী রঙের পোষাক পরিধান করো, বেলচা হাতে রেখো এবং সমষ্টিগতভাবে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করো।"

বড় বড় শহরে খাকসারীদের শিবির স্থাপন করা হতো এবং সামরিক মহড়া ও কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করা হতো। এমন কি, অত্যন্ত অপরিণামদর্শীভাবে মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধংদেহী মনোভাব সৃষ্টি করা হচ্ছিলো। সরলমনা সাধারণ মুসলমানরা এসব প্রদর্শনী দেখে মুগ্ধ হতো এবং মনে করতো যে, আল্লামা মাশরেকী সাহেবের 'খাকসার বাহিনী' ভারতে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করে ছাড়বে।

আল্লামা মাশরেকী সাহেবের এ আন্দোলন কোরআন-সুন্নাহর আলোকে যতদুর ভুল ও অবাস্তব এবং জ্ঞান-বুদ্ধির দিক দিয়ে যে পরিমাণ ভিত্তিহীন ও বোকামীপূর্ণ ছিল, অজ্ঞশ্রেণীর মুসলিম জনসাধারণের, বিশেষ করে তরুণদের জন্য (যাদের মধ্যে আবেগ প্রবণতার মাত্রাধিক্য ছিল) এতে ঠিক সে পরিমাণ অসাধারণ আকর্ষণ ছিল। এ আন্দোলন তখনকার ইসলামী ভারতে প্রচন্ড ঝড়ের গতিতে বিস্তার লাভ করেছিল।

পরিবেশ এমন সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল যে, আল্লামা মাশরেকী সাহেব অথবা "খাকসার আন্দোলন"-এর বিরুদ্ধে কিছু বলা অথবা লেখা মানেই ছিল নিজকে বিপাকে ফেলা। এতে তৎকালীন বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতির কিছুটা প্রভাব ছিল।

উক্ত আন্দোলনের চরম উন্নতির সেই যুগে "ধর্ম ও রাজনীতির আলোকে খাকসার আন্দোলন" শিরোনামে আমি প্রায় একশত পঁচিশ পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধ লিখে 'আলফুরকান' -এর এক সংখ্যাতেই প্রকাশ করেছিলাম। অতঃপর প্রবন্ধটি একই নামে পুস্তকাকারেও প্রকাশ করা হয়েছিল। বন্ধুবর মোহতারম মাওলানা আলী মিয়া সাহেব পুস্তকটির জন্য অত্যন্ত পান্ডিত্যপূর্ণ ও জোরালো ভুমিকা লিখেছিলেন। "খাকসার আন্দোলন" ও আল্লামা মাশরেকী প্রসঙ্গে লিখিত মাওলানা মাওদুদী (মরহুম) সাহেবের একটি নিবন্ধ পুস্তকটির শেষভাগে সংযুক্ত করা হয়েছিল। উক্ত লেখাটি ছিল স্ব-বিষয়ে মাওলানা মাওদুদী সাহেবের শ্রেষ্ঠ রচনা। (উল্লেখ থাকে যে, এসব কাজ সংঘটিত হয়েছিল জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠার প্রায় দু'বছর আগে।)

উক্ত পুস্তকটি পড়ার পর একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, আল্লামা মাশরেকী সাহেব যে সবকিছু ইসলামের নামে ব্যক্ত করে চলছে, তা রসূল (সঃ)-এর আনীত ও কোরআন- নির্দেশিত ইসলাম নয়; বরং, জার্মানীর হিটলার ও ইতালীর মুসোলিনীর 'ধর্ম' এবং তার আন্দোলন রাজনৈতিক দিক দিয়েও ভারতীয় মুসলমানদের জন্য ধ্বংসাত্মক। আল্লাহ না করুন, এর ফলে ভারতের ইসলামপন্থীরা কোন খারাপ পরিস্থিতির শিকার হয়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে পারে।

আমার মনে আছে যে, (আল্লাহর রহমতে) আমার উক্ত লেখাটি শক্তিশালী দলীল প্রমাণ, সুস্পষ্ট বক্তব্য ও জোরালো উপস্থাপনার দিক দিয়ে আমার যাবতীয় রচনার মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। সাথে সাথে মাওলানা আলী মিয়া ও মাওলানা মাওদুদী সাহেবের লেখা দু'টির অন্তর্ভূক্তির ফলে পুস্তকটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। একাধিক অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব পুস্তকটি পাঠ করে এই মতামত ব্যক্ত করেন, যে 'খাকসারী' এ পুস্তকটি পাঠ করবে, তার মধ্যে স্বল্প পরিমাণও বিবেক-বুদ্ধি থাকেল, সে আল্লামা মাশরেকী ও তার আন্দোলনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হবে। কিন্তু, আমার যতদুর স্মরণ আছে, তখন দু'চারজন ব্যক্তিও পুস্তকটি পড়ে এ ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন বলে জানা নেই।

সে যা-ই হোক, কাদিয়ানী মতবাদের মত খাকসার আন্দোলনের ও একই অবস্থা। যে কেউ এর সাথে নিয়মতান্ত্রিকভাবে জড়িত হয়ে যায় খাকী রঙের পোশাক পরে নেয় এবং বেলচা হাতে নিয়ে নেয়, তখন নিজের ভুল উপলদ্ধি করার এবং ফেরৎ আসার তাওফীক খুব কমই লাভ হয়। অবশেষে, আল্লাহ তাআলা এমন কান্ড ঘটান যে, উক্ত আন্দোলন যেন আত্মহত্যা করে নিজে নিজেই নিঃশেষ ও দাফন হয়ে যায়। -৩৪

উল্লেখ থাকে যে, এখানে 'কাদিয়ানী মতবাদ' ও 'খাকসার আন্দোলন' প্রসঙ্গ আলোচিত হওয়ায় কারো মনে কখনো যেন এ সংশয় না জাগে যে, লেখকের দৃষ্টিতে 'জামায়াতে ইসলামী' ও তার 'আন্দোলন' 'কাদিয়ানী মতবাদ' ও 'খাকসার আন্দোলন' এর সমপর্যায়ের গোমরাহী ও বিভ্রান্তিকর। এ ধরনের অতিরঞ্জিত করা থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করছি।

---

৩৪. উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উক্ত আন্দোলন প্রচন্ড ঝড়ের গতিতে বিস্তার লাভ করেছিল। যার ফলে ওলামায়ে কেরামের ফতোয়া, বক্তাগণের বক্তৃতা, তরজুমানুল কোরআন ও আল-ফুরকান-এর মত ধর্মীয় পত্রিকাদ্বয়ের প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং এ ধরনের সমস্ত গঠনমূলক ও সংশোধনমূলক কর্মতৎপরতা মুসলিম জনসাধারণের বিশেষ করে তরুণদের উক্ত বাতিল আন্দোলন থেকে দূরে রাখতে তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এ ঘটনার প্রকাশ ঘটে যে,-স্বয়ং আল্লামা মাশরেকী সাহেবের অপরিণামদর্শী কার্যকলাপ তার অগ্রসরমান জাহাজকে মাঝ দরিয়ায় নিমজ্জিত করে দেয়।

তখন সবেমাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। পাঞ্জাবে তখন স্যার ইস্কান্দর হায়াত খানের মন্ত্রীত্ব চলছিল। এক পর্যায়ে আল্লামা মাশরেকী এবং তাঁর খাকসার বাহিনী সরকারের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এক সময় তারা বেলচা নিয়ে পুলিশের লোকদের উপর আক্রমণ করে বসে। স্যার ইস্কান্দার হায়াত খান সর্বশক্তি প্রয়োগ করার জন্য পুলিশের প্রতি আদেশ জারী করেন। তখন পুলিশ বাহিনী নির্মমভাবে খাকসার বাহিনীকে বন্দুকের খোরাকে পরিণত করে। ব্যাস, লাহোরের উক্ত সংঘর্ষ ও দমন কার্যের ফলে, দৃশ্যতঃ যে আন্দোলন গোটা দেশ ছেয়ে ফেলেছিল, তা পানির বুদ্‌বুদের ন্যায় অদৃশ্য হয়ে যায়। এমনকি অল্পদিনের মধ্যে মানুষ তাকে ভুলে ফেলে।

কেননা, উপরের আলোচনায় যেমন একথা পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, উক্ত দু'টি দল এবং আন্দোলনের উল্লেখ এখানে উক্ত ঘটনা ও অভিজ্ঞতার চাক্ষুষ প্রমাণ ও সাক্ষ্য হিসেবে করা হয়েছে যে–

যখন কোন বিশেষ দাওয়াত ও মসলক এবং কোন বিশেষ দলীয় শৃংখলার সাথে নিয়মতান্ত্রিকভাবে জড়িত হওয়ার পর (এবং মাওলানা মাওদুদী -এর ভাষায়, নিজের গলায় তার রশি পরার পর) তার ভুল উপলব্ধি করা এবং সে মোতাবেক সিদ্ধান্ত ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা কঠোর সাধনা ও বিরাট কঠিন কাজ এবং সীমাহীন আল্লাহ-প্রেম ও অসাধারণ সংকল্পের প্রয়োজন হয়। এ সম্পর্কে আমার নিজেরও অভিজ্ঞতা রয়েছে।

আল্লামা জিগর মুরাদাবাদী (রাঃ)-এর ভাষায়–

"আল্লাহ যদি তাওফীক না দেন, তা হলে মানুষের সাধ্যের কাজ নয়।"

আল্লাহর রহমতে জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস এ হিসেবে ততটুকু অন্ধকার ও নৈরাশ্যজনক নয়; বরং উজ্জ্বল ভবিষ্যত ও আশার আলোর বিরাট ব্যবস্থা এতে রয়েছে। কাদিয়ানী মতবাদ ও খাকস্যার আন্দোলন-এর বিপরীত জামায়াতে ইসলামীতে রয়েছে জ্ঞানী-গুণীদের একটি বড় দল, যারা মাওলানা মাওদুদী সাহেবের আহ্বানে নিঃস্বার্থভাবে সাড়া দিয়ে জামায়াতের সাথে জড়িত হয়ে এর প্রতিষ্ঠা ও গঠনে পূর্ণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। এমন কি, তাঁরা নিজ নিজ শিক্ষা ও কর্মদক্ষতা এবং সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা ও ত্যাগ-তীতিক্ষা স্বীকারের দিক দিয়ে জামায়াতের প্রথম সারির লোকদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন এমনও আছেন, যাদেরকে বিভিন্ন সময়ে মাওলানা মাওদুদী সাহেব নিজের অবর্তমানে নিজের স্থলে জামায়াতের 'আমীর' হিসেবে নাম প্রস্তাব করেছিলেন।-৩৫

কিন্তু, এ পর্যায়ে যখন তাদের নিকট একথা পরিষ্কার ও নিশ্চিত হয়ে যায় যে, মাওলানা মাওদুদী সাহেব এখন ভুল পথে অগ্রসর হচ্ছেন এবং তাঁর সাথে জামায়াতে ইসলামীও সে পথে অগ্রসর হচ্ছে এবং তিনি সংশোধন হয়ে সঠিক রাস্তায় ফিরে আসতে প্রস্তুত নন, তখন তাঁরা মাওলানা মাওদুদী সাহেব ও জামায়াতে ইসলামীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা (শাহাদতে হক বা) সত্যের সাক্ষ্য ও ধর্মীয় দায়িত্ব বলে মনে করেন। অথচ, আল্লাহর অনুগ্রহে এটা ছিল অপ্রিয় হলেও সত্য গ্রহণ। উদাহরণস্বরূপ, জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, মাওলানা হাকীম

৩৫. মাওলানা মাওদুদী সাহেব মাওলানা আমীন আহ্সান ইসলাহী, মাওলানা আবদুল গফ্ফার হাসান ও গাজী আবদুল জব্বার সাহেবকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নিজের পরিবর্তে আমীর মনোনীত করেছিলেন।

আবদুর রহীম আশরাফ, মাওলানা আবদুল গফ্ফার হাসান, গাজী আবদুল জব্বার ও ডক্টর এসরার আহমদ সাহেব প্রমুখদের ন্যায় ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ করা যায়। অপরদিকে, জামায়াতে ইসলামী ভারতের বিশিষ্ট রুকনদের মধ্যে মাওলানা ওহীদুজ্জামান খান, মাওলানা হাকীম আবুল হাসান, ওবায়দুল্লাহ খান রহমানী সাহেব প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। আর এরা হচ্ছেন সেই সব সম্মানিত ব্যক্তি, যারা অনেক দিন পর্যন্ত জামায়াতের রুকন এবং সাংগঠনিকভাবে সক্রিয় কর্মী, বরং নেতা ও পথপ্রদর্শক ছিলেন।

উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও স্বয়ং আমার এ সংক্রান্ত 'ইতিবৃত্তি ' এ গ্রন্থের শুরুতেই আপনারা পড়েছেন। তন্মধ্যে, প্রসঙ্গক্রমে মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ জাফর নদভী ফুলওয়ারী সাহেবের জামায়াতে ইসলামীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন অতঃপর সম্পর্কচ্ছেদের আলোচনাও এসে গেছে। তিনিও জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণকারী এবং প্রথম সারির ব্যক্তি ছিলেন। এক সময় তাঁকে দেশের পুরো অঞ্চলের জন্য 'নায়েবে আমীর' হিসেবেও নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল। সাথে সাথে মাওলানা কমরুদ্দীন খান সাহেবের (এম-এ আলীগড়) জামায়াতে ইসলামীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও সম্পর্কচ্ছেদের আলোচনাও 'ইতিবৃত্তের' মধ্যে এসে গেছে। তিনিও জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণকারী একজন সংগ্রামী রুকন এবং পদমর্যাদার দিক দিয়ে জামায়াতে ইসলামীর প্রথম নাজেম বা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

বন্ধুবর, মোহতারম মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী ও সৈয়দ সিবগতুল্লাহ বখতিয়ারী সাহেবও জামায়াতে ইসলামীর শুধু রুকন ছিলেন তা নয়, বরং অন্যতম মুরব্বী ও পথপ্রদর্শক ছিলেন। "আমার সাহচর্যের ইতিবৃত্তের" পর্যায়ে মাওলানা বখতিয়ারী সাহেব সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমগ্র দক্ষিণ ভারতের জন্য তাঁকে জামায়াতে ইসলামীর 'আমীর' মনোনীত করা হয়েছিল। এ দু'জনের ইতিবৃত্ত হলো, তাঁরা অনেকদিন পর যখন এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, মাওলানা মাওদুদী সাহেব -এবং জামায়াতে ইসলামীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা ভুল হয়েছে এবং এতে দ্বীনি লাভ নেই ক্ষতি ছাড়া, তখন তারা সম্পর্ক ছিন্ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যা তাদের জন্য বিরাট সমস্যার ব্যাপার ছিল। এছাড়া আরও অনেক সম্মানিত ব্যক্তি আছেন, যারা অনেকদিন পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীর সাথে জড়িত ছিলেন এবং পরে গিয়ে দ্বীনের স্বার্থে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।-৩৬

৩৬. "ইতিবৃত্তের" পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে সময় জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান–এর আকাবের ও নীতি নির্ধারকগণের মধ্য থেকে মাওলানা এসলাহী ও মাওলানা হাকীম আবদুর রহীম আশরাফ প্রমুখ সম্পর্কচ্ছেদ করেন, তখন প্রায়৭০ জন রুকন ইস্তেফা দিয়েছিলেন।

কিন্তু এখানে আমি শুধু তাঁদের কথা-ই উল্লেখ করা ভাল মনে করেছি, যারা জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে নেতা ও পথ-প্রদর্শক হিসেবে গণ্য হতেন। বরং ওয়াকিফ-হাল মহল অবগত আছেন যে, জামায়াতে ইসলামীতে মাওলানা মাওদুদী সাহেব ব্যতীত তাঁদের অধিকাংশেরই সমতুল্য পাক-ভারতে আর কাউকে গণ্য করা হতোনা।

এ প্রসংঙ্গে স্বয়ং মাওলানা মাওদুদী সাহেব -এরই একটি সাক্ষ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া ভাল মনে করি।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জামায়াতে ইসলামীর একেবারে প্রাথমিক যুগে যেসব জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির পক্ষ থেকে কঠোর মতবিরোধিতার কথা ব্যক্ত করা হতো, তাদের মধ্যে মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রাঃ)-ও ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর এবং অপর কয়েকজন আকাবের ওলামার রচনাগুলো পাঠকদের মধ্যে এ বিশ্বাস সৃষ্টি করতো যে, মাওলানা মাওদুদী সাহেব যে পথে অগ্রসর হচ্ছেন তা হঠধর্মী, ভ্রান্তি ও ফিৎনার রাস্তা। তখন এ পরিপ্রেক্ষিতে মাওলানা মাওদুদী সাহেব স্বীয় জামায়াতের সহযোগীদের মধ্য থেকে এই লেখক, মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী, মাওলানা সৈয়দ সিবগতুল্লাহ বখতিয়ারী, মাওলানা সৈয়দ জাফর সাহেব ফুলওয়ারী প্রমুখদের পৃথক পৃথক নাম উল্লেখ করে (মনে হয়) নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে গিয়ে লিখেছিলেন–

"এদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কে আছেন, যার সম্পর্কে কোন আল্লাহর বান্দা আল্লাহকে হাজের -নাজের বিশ্বাস করে একথা বলতে পারে যে, এ সব লোক এক সময় ভ্রান্ত ও হঠধর্মীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন অথবা ফিৎনার দিকে কখনো তাদের ঝোঁক ছিল, কিংবা শিক্ষা ও কর্মগত দিক দিয়ে এরা খারাপ ও মন্দ পথের পথিক ছিলেন? ভারতের উত্তম ব্যক্তিদের প্রথম শ্রেণীতে না হলেও অন্ততঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে হয়তো এদেরকে গণ্য করা যেতে পারে।" -(তরজুমানুল কোরআন : জানুয়ারী/ফেব্রুয়ারী-১৯৪১ ইং ১৩নং পৃষ্ঠা।)

কিন্তু "স্রষ্টার লীলা বুঝা বড় দায়।" কেননা, আপনারা আগেই জানতে পেরেছেন যে, উপরোল্লিখিত ব্যক্তিগণ সবাই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দ্বীনের স্বার্থেই জামায়াতে ইসলামীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং একজনও মাওলানা মাওদুদী সাহেব -এর সাথে থেকে যাননি। বলা বাহুল্য যে, এ বিষয়টি জামায়াতে ইসলামীর মুখলিস ভাইদের জন্য গভীরভাবে ভেবে দেখার বিষয়। সারকথা, জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস শুধু কাদিয়ানী ফিৎনা ও খাকসার আন্দোলনের মোকাবেলায় নয়, বরং আমার জানা মতে ১৩/১৪ শত বছরের সুদীর্ঘ সময়ে মুসলিম জাতির মধ্যে জেগে ওঠা সকল আন্দোলন ও দলের মোকাবেলায় (জামায়াতে ইসলামী এদিক দিয়ে) একক ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী

যে সব ব্যক্তি এর প্রতিষ্ঠা ও গঠন-কার্যে পূর্ণ তৎপরতার সাথে শরীক ছিলেন এবং এ পথে যাদের কোরবানী ও ত্যাগ তিতিক্ষা কারো চেয়ে কম ছিল না, যাঁরা জামায়াতের প্রথম পর্যায়ের রুকন ও নীতি-নির্ধারকগণের মধ্যে গণ্য ছিলেন, যাদের ধর্মীয় দুরদৃষ্টি, সত্যবাদিতা ও খোদাভীরুতা জামায়াতের ভিতর ও বাহির উভয়ক্ষেত্রে স্বতঃসিদ্ধ ও খ্যাত ছিল, যাদেরকে জামায়াতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া জামায়াত যে সত্যপন্থী তার আলামত ও প্রমাণ মনে করা হতো এবং প্রচার করা হতো, তাঁরা সবাই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে জামায়াতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। নিজেদেরকে জামায়াতের সাথে জড়িত রাখার বৈধতা কোরআন-সুন্নাহর আলোকে বুঝতে পারেননি। কেননা, তাঁরা মাওলানা মাওদুদী সাহেব এবং তাঁর প্রভাবাধীন জামায়াতে ইসলামীর ধ্যান-ধারণায় ধর্মীয় দৃষ্টিতে হঠধর্মীতা ও বিচ্যুতি উপলব্ধি করেন। তাঁদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি সংশোধনের যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালানোর পর এবং "ইতমামে হুজ্জত" (দলীল সম্পূর্ণ) করে নিরাশ হওয়ার পরেই সম্পর্ক ছিন্ন করার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।-৩৭

---

৩৭. মাওলানা হাকীম আবদুর রহীম আশরফ সাহেব (যিনি জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের মজলিসে শুরার অন্যতম প্রভাবশালী রুকন ও বিশিষ্ট নেতা ছিলেন তাঁর সাপ্তাহিক 'আল-মুনীর লায়েলপুর' বহু বছর পর্যন্ত জামায়াতের প্রচারপত্র ছিল বলা যায়, জামায়াতে ইসলামী থেকে বিচ্ছিন্ন হবার আগে এবং পরে (৫৭/৫৮সালে) মাওলানা মাওদুদী ও জামায়াতের ভুল পদ্ধতি ও বিচ্যুতি প্রসঙ্গে যে লেখাগুলো "আল্-মুনীর" পত্রিকায় লিখেন, তা পাঠ করলে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়। এ ছাড়া মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী সাহেবের একটি দীর্ঘ লেখা '৫৮ সালের মে মাসে পাকিস্তানের কোন কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি বিস্তারিতভাবে লিখেন যে, তিনি সংশোধনের কি কি প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে কিরূপ নিরাশ হয়ে জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন। (তার এ লেখাটি পাকিস্তানী সংবাদপত্রের সৌজন্যে "অর্ধ-সাপ্তাহিক মদীনা বিজনুর" পত্রিকার ৫/৬/৫৮ইংরেজী সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল)।

ডঃ এসরার আহমদ সাহেবের রচিত "জামায়াতে ইসলামী আন্দোলন একটি গবেষণামূলক পর্যালোচনা" এ সম্পর্কিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। মাওলানা ওহীদুদ্দীন খান সাহেবের "ভুল ব্যাখ্যা" ও "ধর্মের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা" নামক গ্রন্থ দু'টি এ সম্পর্কে বিশেষভাবে অধ্যয়নযোগ্য।

মাওলানা হাকীম ওবায়দুল্লাহ খান সাহেব প্রায় ২০ বছর পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীর সক্রিয় সদস্য ছিলেন। পরবর্তীকালে যখন তিনি মাওলানা মাওদুদী সাহেব ও তাঁর নেতৃত্বাধীন জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে ভ্রান্তি, হঠধর্মী ও সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতি লক্ষ্য করেন, তখন সম্পর্কচ্ছেদ করে সত্যপ্রকাশ ও "ইতমামে হুজ্জত"-এর জন্য "ইসলামী রাজনীতি , না রাজনৈতিক ইসলাম" নামে তিনশত পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ রচনা করে প্রকাশ করেছিলেন।

বস্তুতঃ জামায়াতে ইসলামী ছাড়া কোন দল বা আন্দোলনের ইতিহাসে এর নজীর পাওয়া যাবেনা যে, তার প্রথম শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ এভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন।

জামায়াতে ইসলামীর সে ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যকে সামনে রেখেই আমি জামায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ভাইগণ; বিশেষ করে এর পরিচালক ও দায়িত্বশীলগণের খেদমতে আমার এই আবেদন-নিবেদনসমুহ পেশ করছি। সাথে সাথে এই আরজও করছি যে, এখানে প্রসঙ্গক্রমে মাওলানা মাওদুদী সাহেব -এর যে কয়েকটি মারাত্মক ভুল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, আল্লাহর ওয়াস্তে সেগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখবেন যে, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে এগুলো মারাত্মক ও ভয়াবহ ভুল হওয়ার মধ্যে কোন সন্দেহ আছে কি না।

যারা জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানা মাওদুদীর সাথে আমার সম্পর্ক স্থাপনের ইতিহাস জানেন, তারা হয়তো অবগত আছেন যে, জামায়াতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর দীর্ঘদিন যাবৎ আমার অবস্থা এরকম ছিল যে, মাওলানা মাওদুদী সাহেবের উপর যে সব অভিযোগ উত্থাপিত হতো, যেহেতু আমি সেগুলোকে ভুল বুঝা-বুঝিরই ফল বলে মনে করতাম, তাই তাঁর পক্ষ থেকে আমি নিজেই এসবের জবাব দিতাম। জামায়াতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রায় আট/ দশ বছর পর '৫১ ইং -এর ঘটনা। তখন জনা-কয়েক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির পক্ষ থেকে মাওলানা মাওদুদীর উপর অভিযোগ করে কিছু লেখা প্রকাশিত হলে আমি তাঁর পক্ষ থেকে আল-ফুরকান-এর (জিল্‌কদ ৭০হিঃ) মাধ্যমে সেগুলোর জবাব দিয়েছিলাম।

উল্লেখ্য যে, আমি কিন্তু এখানে তাঁর যে কয়েকটি ভুল সম্পর্কে আলোচনা করেছি, অনেক চিন্তা-ভাবনা করার পরও সেগুলোর কোন সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারিনি। আমি আল্লাহকে সামনে রেখেই আরজ করতে পারি যে, আমি কোরআন-সুন্নাহর আলোকেই সে সব ভূলকে ধর্মের মধ্যে ভ্রান্তি, হঠধর্মী ও ফিৎনা বলেই বুঝেছি। এজন্যই তা স্পষ্ট করে আপনাদের সামনে তুলে ধরাকে আমার দায়িত্ব বলে মনে করেছি।

জামায়াতে ইসলামীর ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অবগতির উপর ভিত্তি করে বলা যায়, একথা প্রায় নিশ্চিত যে, জামায়াতের কলম সৈনিকগণের পক্ষ থেকে আমার বক্তব্যের একাধিক জওয়াব দেয়া হবে। কিন্তু, আমি অগ্রীম নিবেদন করবো, আমি যা কিছু লিখেছি তা জওয়াব পাওয়ার জন্য লিখিনি; বরং, নিজের জীবন-সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে মনে করে, সত্যের সাক্ষ্য, দায়মুক্তি ও সংশোধনের সম্ভাব্য প্রচেষ্টার দায়িত্ব পালনের নিয়্যতেই লিখেছি। তার পরবর্তী কাজ আল্লাহর হাতেই সোপর্দ করলাম।

সমাপ্ত